



আব্দুল হামীদ মাদানী

## ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء

والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

আকীদা ও আহকাম নিয়ে অনেক কিছু লেখা হয়েছে। এবারে ইচ্ছা হল মন নিয়ে কিছু লেখা। আসলে আমরা আমাদের দেহাঙ্গের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার দিকে অনেক খেয়াল রাখি, কিন্তু হৃদয়ের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার দিকে খেয়াল রাখে আমাদের মধ্যে অনেক কম লোকে। অথচ হৃদয় হল দেহের রাজা। রাজার গুরুত্ব নিশ্চয়ই প্রজা অপেক্ষা অনেক বেশি।

মানুষের মন বড় আজব। মন যেহেতু আমলের কনভার্টার যন্ত্র, তাই আমলের আগে মন-যন্ত্রকে সচল রাখতে হবে। বিকল হয়ে থাকলে তার মেরামত করতে হবে।

মনে আনে সাফল্য, মনে আনে আমলের সংশোধন ও মাহাত্ম্য। তাই মনকে পরিপাটি করতে হয়।

আশা করি সেই প্রয়াসে আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সফল হবে এবং উপকৃত হবে বাংলাভাষী পাঠক-পাঠিকা।

এই পুস্তক সংকলণে যাদের লেখনী থেকে আমি উপকৃত হয়েছি এবং যে কোনও ভাবে যাদের নিকট থেকে আমি সাহায্য পেয়েছি, মহান আল্লাহ তাঁদেরকে এবং আমাকে উত্তম প্রতিদান দিন। আমীন।

বিনীত---

আব্দুল হামীদ মাদানী

সউদী আরব

৫ শা'বান ১৪৩৬হিঃ

## সূচীপত্র

মানুষের আত্মা ও মন	১
হৃদয়ের কাজ কী?	৪
হৃদয় কেমন?	২১
মনের প্রকারভেদ	২৯
মন ঠিক হলে সব ঠিক	৩৫
মন দিয়ে মন জয়	৬১
হৃদয়ের মালিক আল্লাহ	৬৩
মনের ভুল ও বিস্মৃতি ধর্তব্য নয়	৭০
মনের বিরতি	৮১
মানুষের মন ও স্বপ্ন	৮৫
স্বাধীন হৃদয় বা মুক্তমন	৮৮
মনের কর্ম ও ইবাদত	৯১
আন্তরিকতা ও ইখলাসের গুরুত্ব	৯২
ইখলাসের পরিণাম ও সুফল	১০০
ইহসান	১০১
তাক্বওয়া	১০১
যুহুদ বা বিষয়-বিতৃষ্ণা	১০২
হৃদয়ের আমল ও অন্যান্য দেহাঙ্গের আমলের মাঝে পার্থক্য	১০৪
সুস্থ মন	১০৭
প্রবৃত্তি-পূজা	১১১
হৃদয়ের রোগসমূহ	১৩১
সৌজন্যবোধ ও ভব্যতা	১৫২
হৃদয় কঠিন হওয়ার কারণসমূহ	১৮৬
হৃদয় নরম করার উপায়	১৯৪
হৃদরোগের চিকিৎসা	২০৪
হৃদয়-বিনাশী কর্মাবলী	২০৭
হৃদয়ের মৃত্যু	২০৯
আত্মবিচার, আত্মসমীক্ষা	২১৫
আত্মসমালোচনা	২২৫
আত্মশুদ্ধি-আত্মশুদ্ধি	২২৮

## মানুষের আত্মা ও মন

আরবী ভাষায় ‘নাফস’ শব্দের অর্থে আত্মা তথা ‘রুহ’ এবং মন ও চৈতন্য অর্থে ব্যবহার হয়। যা অস্থি-মাংস-রক্তের দেহে অবস্থান করে।

রুহ, আত্মা বা প্রাণ সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا}

“তোমাকে তারা আত্মা সম্পর্কে প্রশ্ন করে। তুমি বল, ‘আত্মা আমার প্রতিপালকের আদেশ বিশেষ; আর তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে।” (বানী ইস্রাঈলঃ ৮৫)

রুহ বা আত্মা এমন অশরীরী বস্তু যা কারো দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু প্রত্যেক প্রাণীর শক্তি ও সামর্থ্য এই রুহের মধ্যেই লুক্কায়িত। এর প্রকৃত স্বরূপ কী, তা কেউ জানে না। তার জ্ঞান আল্লাহ তাঁর আশ্বিয়া সহ অন্য কাউকেও দেননি। মহান আল্লাহ শেষনবী ﷺ-কে বলেন, কেবল এতটুকু জেনে নাও যে, এটা তোমার প্রতিপালকের নির্দেশ মাত্র। অথবা এটা তোমার প্রতিপালকেরই খাস ব্যাপার; যার প্রকৃতত্ব কেবল তিনিই জানেন। (আহসানুল বায়ান)

প্রত্যেক জীবের ভিতরে জীবন আছে এবং প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে প্রাণ আছে। তবে সকল জীব বা প্রাণীর মন নেই। এই মন ও বিবেক-বুদ্ধি দিয়েই মানুষকে সারা সৃষ্টির ওপর প্রাধান্য ও মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

মাতৃগর্ভে শুক্রকীটের প্রাণ থাকে। কিন্তু তাতে ‘রুহ’ স্থাপন করা হয় ৪র্থ মাসে। যে রুহ তার পূর্বে থাকে রুহ জগতে। আবার দেহের মৃত্যুর সময় ফিরে যায় ইল্লীয়ীন বা সিঙ্জীনে মধ্য জগতের বারযাখী জীবনে। অতঃপর কিয়ামতের সময়ে তার ভিন্ন দেহ পুনরায় সৃষ্টি করা হবে এবং জান্নাত অথবা জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে।

নাফস বলা হয় আত্মাকে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ} (৫৭) سورة العنكبوت

“প্রত্যেক আত্মাই মরণের স্বাদ গ্রহণ করবে; অতঃপর তোমরা আমারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।” (আনকাবুতঃ ৫৭)

আবার মন অর্থে ব্যবহার হয়েছে অন্য আয়াতসমূহে, তিনি বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ \* ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً \* فَادْخُلِي فِي} (১)

عِبَادِي \* وَادْخُلِي جَنَّاتِي (الفجر: ২৭ - ৩০)

“হে উদ্বেগশূন্য চিত্ত! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে এস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। সুতরাং তুমি আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও। এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।” (ফাজরঃ ২৭-৩০)

{وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (৭) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (৮) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (৯) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (১০) سورة الشمس}

“শপথ আআর এবং তার সুঠাম গঠনের। অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সংকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। সে সফলকাম হবে, যে তাকে পরিশুদ্ধ করবে এবং সে ব্যর্থ হবে, যে তাকে কলুষিত করবে। (শামসঃ ৭-১০)

{وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ}

“(স্মরণ কর) যখন আল্লাহ বলবেন, ‘হে মারিয়াম-তনয় ঈসা! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আমাকে ও আমার জননীকে উপাস্যরূপে গ্রহণ কর?’ সে বলবে, ‘তুমিই মহিমান্বিত! যা বলার অধিকার আমার নেই তা বলা আমার জন্য আদৌ শোভনীয় নয়। যদি আমি বলে থাকি, তাহলে তা তো তুমি অবশ্যই জানো। আমার মনে কি আছে তা তুমি অবগত আছ, কিন্তু তোমার মনে যা আছে, তা আমি অবগত নই, নিশ্চয় তুমি অদৃশ্য সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত।” (মায়িদাহঃ ১১৬)

রুহ থাকে সারা দেহে। মন ও চৈতন্য থাকে হৃদয়ে, যার কেন্দ্র হল মস্তিষ্ক।

আমরা একটা আধুনিক যন্ত্রের উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে বুঝতে পারি। কম্পিউটার যন্ত্রটি হল দেহ **HardWare**। নাফস হল **SoftWare**। আর সংযুক্ত বিদ্যুত বা কারেন্ট হল তার রুহ বা প্রাণ।

রুহ ও নাফসের আরেকটি পার্থক্য স্পষ্ট হয় ঘুমের সময়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَاجِبِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ}

(২২) سورة الزمر

“মৃত্যুর সময় আল্লাহ প্রাণ হরণ করেন এবং যারা জীবিত তাদেরও চেতনা হরণ করেন ওরা যখন নিদ্রিত থাকে। অতঃপর যার জন্য মৃত্যু

অবধারিত করেছেন, তিনি তার প্রাণ রেখে দেন এবং অপরকে এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চেতনা ফিরিয়ে দেন। এতে অবশ্যই চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।” (যুমারঃ ৪২)

উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁর এমন এক পরিপূর্ণ কুদরতের এবং বিস্ময়কর কর্মের কথা উল্লেখ করছেন, যা মানুষ প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করে। আর তা হল, যখন সে ঘুমিয়ে যায়, তখন তার আত্মা আল্লাহর নিদর্শে তার (দেহ) থেকে যেন বেরিয়েই যায়। কেননা, তখন তার অনুভূতি ও বোধশক্তি বিলুপ্ত হয়ে যায়। আর যখন সে জেগে ওঠে, তখন আত্মাকে ঠিক যেন তার মধ্যে পুনরায় প্রেরণ করা হয়। ফলে তার অনুভূতি পূর্বের ন্যায় ফিরে আসে। অবশ্য যার জীবনের মেয়াদ পূর্ণ হয়ে যায়, তার আত্মা আর ফিরে আসে না এবং সে মৃত্যুর হাতে ধরা খায়। এটাকেই মুফাসসিরগণ ‘অফাতে কুবরা’ (বড় মৃত্যু) এবং ‘অফাতে সুগরা’ (ছোট মৃত্যু) বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই বিষয়টাই সূরা আনআমের ৬০-৬১নং আয়াতেও আলোচিত হয়েছে। (আহসানুল বায়ান)

এই অর্থেই মহানবী ﷺ বলেছেন,

(( إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِذَاخِلَةِ إِزَارِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلْفَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ : بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكَتْ نَفْسِي فَأَرْحَمَهَا، وَإِنْ أُرْسَلْتُهَا، فَأَحْفَظَهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ )).

“যখন তোমাদের কেউ শয্যা গ্রহণ করবে, তখন সে যেন নিজ লুপ্পীর একাংশ দ্বারা তার বিছানাটা ঝেড়ে নেয়। কারণ, সে জানে না যে, তার অনুপস্থিতিতে কি কি জিনিস সেখানে এসেছে। তারপর এই দুআ পড়বে,

‘বিসমিকা রাব্বি অয়া’তু যামবী অবিকা আরফাউহু ফাইন আম্সাকতা নাফসী ফারহামহা আইন আরসালতাহা ফাহফাযহা বিমা তাহফাযু বিহী ইবা-দাকাস স্মা-লিহীন।’

অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমারই নামে আমার পার্শ্ব রাখলাম এবং তোমারই নামে তা উঠাব। অতএব যদি তুমি আমার আত্মাকে আবদ্ধ ক’রে নাও, তাহলে তার প্রতি করুণা করো। আর যদি তা ছেড়ে দাও, তাহলে তাকে ঐ জিনিস দ্বারা হিফাযত কর, যার দ্বারা তুমি তোমার নেক বান্দাদের ক’রে থাক।” (বুখারী ৬৩২০, মুসলিম ৭০৬৭নং)

মানুষের আত্মা ও মন খোদ মানুষই। সেই হল ভারপ্রাপ্ত, সেই পাবে প্রতিদান ও শাস্তি। মানুষের ব্যক্তিত্ব ও সত্তাই হল মানুষের নাফস। নাফসকেই সম্বোধন করেন মহান আল্লাহ। তিনিই কিয়ামতে বলবেন,

{الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ}

“আজ প্রত্যেক (নাফস)কে তার কৃতকর্মের ফল দেওয়া হবে; আজ কারও প্রতি যুলুম করা হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর।”  
(মু’মিনঃ ১৭)

## হৃদয়ের কাজ কী?

মহান স্রষ্টার সৃষ্টি-বৈচিত্রে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এক-একটা আশ্চর্যময় ভূমিকা ও কর্তব্য পালন করে। চোখ দেখে, কান শোনে, রসনা কথা বলে, বিভিন্ন অঙ্গ বিভিন্ন কর্তব্য পালন করে; কিন্তু হৃদয় বা হাটের কর্তব্য কী?

হাট বা হৃৎপিণ্ডের কথাই ধরা যাক। যা আকারে দেখতে প্রায় পেয়ারার মত। আয়তনে হাতের মুঠিতে এসে যায়। ওজনে ২২৫ থেকে ৩৪০ গ্রাম ভারী। যা মানুষের বুকে প্রতিনিয়ত স্পন্দশীল। এক মিনিটে ৭০ বার স্পন্দিত হয় এটি। প্রতি ঘণ্টায় ৪২০০ বার, প্রত্যহ ১০০৮০০ বার, বছরে ৩৬৭৯২০০০ বার। সুতরাং কোন মাঝারি বয়সী ৬০ বছরের মানুষের বুকে এই বিস্ময়কর হাট নিরবচ্ছিন্নভাবে ২২০৭০০০০০০ (দুইশত কুড়ি কোটি ৭০ লাখ) বার কম্পিত হয়!

আবার এই হাটই প্রত্যহ ২২০০০ গ্যালন রক্ত সারা দেহে সঞ্চালন করে, এক বছরে করে ৮০৩০০০০ গ্যালন, অর্থাৎ মাঝারি বয়সী ৬০ বছর আয়ুপ্রাপ্ত লোকের হাট ৪৮-১৮০০০০০ গ্যালন রক্ত সঞ্চালিত করে থাকে; যে রক্ত-সমষ্টির ওজন হয় প্রায় ৩৪৫০০০ টন।

কিন্তু হাটের কাজ কি শুধু এটাই? নাকি সৃষ্টিকর্তা তাকে আরো অন্য কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন?

আমরা মুসলিমরা ঈমান রখি, মহান স্রষ্টা হৃদয়কে আরো অন্য কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং আমরা মন দিয়ে পড়ি, হৃদয় দিয়ে বুঝি, অন্তর দিয়ে ভালোবাসি, মনে ভয় হয়, হৃদয় আবেগপ্লুত হয়, চিন্তে দুঃখ-বেদনা অনুভূত হয়, অন্তরে বিশ্বাস-অবিশ্বাস থাকে, মু’মিনদের হৃদয় ঈমান দ্বারা সৌন্দর্যমন্ডিত। মস্তিষ্কের জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি ইত্যাদির বহিঃপ্রকাশ ঘটে হৃদয়ের মাধ্যমে।

সেই হৃদয়ের নানা কাজের কথাই মহান আল্লাহ বলেছেন কুরআন মাজীদের বিভিন্ন জায়গায়,

হৃদয় দিয়ে বুঝা যায়, অনুভব ও উপলব্ধি করা যায়, সেই হৃদয় যা আছে বুকের মাঝে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ} (سورة الأعراف ١٧٩)

“আমি তো বহু জ্বিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি; তাদের হৃদয় আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চক্ষু আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা দর্শন করে না এবং তাদের কণ্ঠ আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা শ্রবণ করে না। এরা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়; বরং তা অপেক্ষাও অধিক বিভ্রান্ত! তারাই হল উদাসীনা।” (আ’রাফ : ১৭৯)

{أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ} (الحج ٤٦)

“তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতি-শক্তি-সম্পন্ন কণ্ঠের অধিকারী হতে পারত। বস্তুতঃ চক্ষু তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়।” (হাজ্জ : ৪৬)

{إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ} (৩৭)

“এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য, যার আছে হৃদয় অথবা যে উপস্থিত থেকে নিবিষ্ট-চিত্তে শ্রবণ করে।” (ক্বাফ : ৩৭)

এ হৃদয় দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তাতে তালা মেরে দেওয়া হলে সে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন,

{أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا} (سورة محمد ٢٤)

“তবে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা-ভাবনা করে না? নাকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?” (মুহাম্মাদ : ২৪)

এ হৃদয়ে মোহর মারা হয়। আর তখন মানুষ ভালো ও মন্দের মাঝে তমীয় করতে পারে না, হক ও বাতিলের মাঝে তফাৎ করতে পারে না, সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য করতে পারে না। ভালো জিনিস দেখে না, ভালো জিনিস শোনে না, সৎপথ গ্রহণ করে না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ

عَظِيمٌ} (سورة البقرة ٧)

“আল্লাহ তাদের হৃদয় ও কানে মোহর মেরে দিয়েছেন, তাদের চোখের উপর আবরণ রয়েছে এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।” (বাক্বারাহ : ৭)



{قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِهِ} (৬১) سورة الأنعام

“বল, ‘তোমরা আমাকে বল, আল্লাহ যদি তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেন এবং তোমাদের হৃদয় মোহর করে দেন, তাহলে আল্লাহ ব্যতীত কোন্ উপাস্য আছে, যে তোমাদের ঐ গুলি ফিরিয়ে দেবে?” (আনআম : ৪৬)

{أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَّوْ نَشَاءُ أَصْبَأْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ} (১০০) سورة الأعراف

“কোন দেশের অধিবাসীর ধ্বংসের পর যারা ওর উত্তরাধিকারী হয়েছে, তাদের নিকট এটা কি প্রতীয়মান হয়নি যে, আমি ইচ্ছা করলে তাদের পাপের দরুন তাদেরকে শাস্তি দিতে পারি এবং তাদের হৃদয় মোহর ক’রে দিতে পারি; ফলে তারা শুনবে না।” (আ’রাফ : ১০০)

{ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ} (৩)

“এটা এ জন্য যে, তারা বিশ্বাস করার পর অবিশ্বাস করেছে, ফলে তাদের হৃদয় মোহর ক’রে দেওয়া হয়েছে, সুতরাং তারা বুঝবে না।” (মুনাফিকুন : ৩)

{رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ} (৮৭)

“তারা অন্তঃপুরবাসিনী নারীদের সাথে থাকতে পছন্দ করল এবং তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেওয়া হল। সুতরাং তারা বুঝতে অক্ষম।” (তাওবাহ : ৮৭)

{إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} (৭৩) سورة التوبة

“অভিযোগ তো শুধুমাত্র ঐ লোকদের বিরুদ্ধেই যারা ধনবান হওয়া সত্ত্বেও (যুদ্ধে গমন না করার) অনুমতি চায়। তারা অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদের সাথে থাকতে পছন্দ করল। আর আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর মেলে দিলেন, সুতরাং তারা জ্ঞানলাভে অক্ষম।” (তাওবাহ : ৯৩)

{أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ}

“ওরাই তারা; আল্লাহ যাদের অন্তর, কর্ণ ও চক্ষু মোহর ক’রে দিয়েছেন এবং তারাই উদাসীন।” (নাহল : ১০৮)

{فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكَفَرِهِمْ بآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا} (১০০) النساء

“(তারা অভিশপ্ত হয়েছিল) কারণ, তারা তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছিল, আল্লাহর আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করেছিল, নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিল এবং বলেছিল, ‘আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত।’ বরং তাদের অবিশ্বাসের জন্য আল্লাহই তাদের (হৃদয়ে) মোহর মেরে দিয়েছেন, ফলে তাদের অল্প সংখ্যকই বিশ্বাস করে।” (নিসা : ১৫৫)

{أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} (২৪) سورة الشورى

“ওরা কি বলতে চায় যে, ‘সে (মুহাম্মাদ) আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে’? (যদি তাই হত) তাহলে (হে মুহাম্মাদ!) আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমার হৃদয়ে মোহর ক’রে দিতেন। আল্লাহ মিথ্যাকে মুছে দেন এবং নিজ বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অন্তরে যা আছে, সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহে সবিশেষ অবহিত।” (শূরা : ২৪)

{أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ} (২৩) الجاثية

“তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে তার খেয়াল-খুশীকে নিজের উপাস্য ক’রে নিয়েছে? আল্লাহ জেনেগুনেই ওকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং ওর কর্ণ ও হৃদয়ে মোহর ক’রে দিয়েছেন এবং ওর চোখের ওপর রেখেছেন পর্দা। অতএব, আল্লাহ মানুষকে বিভ্রান্ত করার পর কে তাকে পথনির্দেশ করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?” (জাযিয়াহ : ২৩)

{وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ} (২০) سورة الأنعام

“তাদের মধ্যে কিছু লোক তোমার দিকে কান পেতে রাখে, কিন্তু আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি, যেন তারা তা উপলব্ধি করতে না পারে এবং তাদেরকে বধির করেছি। সমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করলেও তারা তাতে বিশ্বাস করবে না। এমন কি তারা যখন তোমার নিকট উপস্থিত হয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তখন অবিশ্বাসিগণ বলে, ‘এ তো সে কালের উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নয়।’ (আনআম : ২৫)

{وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذُكِرْتَ رَبُّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا } (৬৬) سورة الإسراء

“আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি, যেন তারা উপলব্ধি করতে না পারে এবং তাদের কানে বধিরতা দিয়েছি। আর যখন তুমি তোমার প্রতিপালকের একত্বের কথা কুরআনে উল্লেখ কর, তখন তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে সরে পড়ে।” (বানী ইস্রাঈল : ৪৬)

{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاؤُهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا } (৫৭) سورة الكهف

“কোন ব্যক্তিকে তার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী স্মরণ করিয়ে দেয়ার পর সে যদি তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার কৃতকর্মসমূহ ভুলে যায়, তবে তার অপেক্ষা অধিক সীমালংঘনকারী আর কে? আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি, যেন তারা কুরআন বুঝতে না পারে এবং তাদের কানে বধিরতা সৃষ্টি করেছি। তুমি তাদেরকে সৎপথে আহ্বান করলেও তারা কখনো সৎপথ পাবে না।” (কাহফ : ৫৭)

{وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ فَاغْمَلْ إِنَّا نَحْمِلُونَ } (৫) سورة فصلت

“ওরা বলে, ‘তুমি যার প্রতি আমাদেরকে আহ্বান করছ, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণে আচ্ছাদিত, আমাদের কর্ণে আছে বধিরতা এবং তোমার ও আমাদের মধ্যে আছে অন্তরাল। সুতরাং তুমি তোমার কাজ কর এবং আমরা আমাদের কাজ করে যাই।’” (হা-মীম সাজদাহ : ৫)

হৃদয়ই পাথর হয়ে যায়, ফলে সে হৃদয়ে কোন উপদেশ কাজ করে না। নিজের দুঃখ ভেবে বা কারো দুঃখ দেখে কাঁদে না। নিষ্ঠুর হয়, ক্রুর হয়, নির্দয় হয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ } (৭৬) سورة البقرة

“এর পরও তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেল; তা পাষাণ কিংবা তার থেকেও কঠিনতর, কিছু পাথর এমন আছে যে, তা থেকে নদী-নালা প্রবাহিত

হয় এবং কিছু পাথর এমন আছে যে, বিদীর্ণ হওয়ার পর তা থেকে পানি নির্গত হয়। আবার কিছু পাথর এমন আছে, যা আল্লাহর ভয়ে ধসে পড়ে। বস্তুতঃ তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে আল্লাহ উদাসীন নন।” (বাক্বারাহঃ ৭৪)

{فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا}

يَعْمَلُونَ { (৫৩) سورة الأنعام

“সুতরাং আমার শাস্তি যখন তাদের উপর আপতিত হল, তখন তারা বিনীত হল না কেন? অধিকন্তু তাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেল এবং তারা যা করছিল, শয়তান তা তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করল।” (আনআমঃ ৪৩)

{أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ

فَاسِقُونَ { (১৬) سورة الحديد

“যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদের সময় কি আসেনি যে, আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তাদের হৃদয় ভক্তি-বিগলিত হবে? এবং পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের মত তারা হবে না? বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের অন্তর কঠিন হয়ে পড়েছিল। আর তাদের অধিকাংশই সত্যাত্যাগী।” (হাদীদঃ ১৬)

{فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ { (১৩) سورة المائدة

“তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের দরুন আমি তাদেরকে অভিসম্পাত করেছি ও তাদের হৃদয় কঠোর ক’রে দিয়েছি, তারা (তাওরাতের) বাক্যাবলীর পরিবর্তন সাধন ক’রে থাকে এবং তারা যা উপদেষ্টা হয়েছিল তার একাংশ ভুলে গেছে। তুমি সর্বদা ওদের অল্পসংখ্যক ব্যতীত সকলেরই তরফ হতে বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ পেতে থাকবে। সুতরাং তুমি ওদেরকে ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর। নিশ্চয় আল্লাহ সংকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন।” (মায়িদাহঃ ১৩)

{لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ

الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ { (৫৩) سورة الحج

“এটা এ জন্য যে, শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে তিনি তা পরীক্ষা স্বরূপ

করেন তাদের জন্য যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে এবং যারা পাষণ-হৃদয়। নিশ্চয় অত্যাচারীরা চরম বিরোধিতায় রয়েছে।” (হাজ্জ : ৫৩)

{أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ} (২২) سورة الزمر

“আল্লাহ ইসলামের জন্য যার বক্ষ উন্মুক্ত ক’রে দিয়েছেন ফলে সে তার প্রতিপালক হতে (আগত) আলোর মধ্যে আছে, সে কি তার সমান-- যে এরূপ নয়? দুর্ভোগ তাদের জন্য, যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে কঠিন, ওরাই স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।” (যুমার : ২২)

এ হৃদয়কে বন্ধ করা হয়, মনকে টেরা করে দেওয়া হয়। তখন মানুষ বন্ধপথ অবলম্বন করে, টেরামি ক’রে টেরা পথ ধরে। মহান আল্লাহ বলেন,

{فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} (৫) سورة الصف

“অতঃপর তারা যখন বন্ধপথ অবলম্বন করল, তখন আল্লাহ তাদের হৃদয়কে বন্ধ ক’রে দিলেন। আর আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।” (স্বাফ : ৫)

মহান আল্লাহ মহানবী ﷺ-এর দুই স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন,

{إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} (৬) سورة التحريم

“যদি তোমরা উভয়ে (অনুতপ্ত হয়ে) আল্লাহর নিকট তওবা কর, তাহলে (আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন), নিশ্চয় তোমাদের হৃদয় ঝুঁকে পড়েছে।” (তাহরীম : ৪)

এ হৃদয় যেমন ব্যাধিগ্রস্ত হয়, তেমনি হয় পবিত্র ও সুস্থ। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (৮৮) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} (৮৯) الشعراء

“যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না; সেদিন উপকৃত হবে কেবল সেই; যে আল্লাহর নিকট সুস্থ অন্তঃকরণ নিয়ে উপস্থিত হবে।” (শুআ’রা : ৮৮-৮৯)

এই হৃদয় হয় আল্লাহ-অভিমুখী। তিনি বলেছেন,

{وَأَرْزَلْتِ الْجَنَّةَ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (৩১) هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ}

{مَنْ حَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ} (৩২) سورة ق

“জান্নাতকে নিকটস্থ করা হবে সাবধানীদের জন্য; কোন দূরত্ব থাকবে না। এরই প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল; প্রত্যেক আল্লাহ

অভিমুখী, (তাঁর হুকুমের) হিফায়তকারীর জন্য। যারা না দেখে পরম দয়াময়কে ভয় করে এবং (আল্লাহ)-অভিমুখী চিত্তে উপস্থিত হয়।” (ক্বাফ ৪৩১-৩৩)

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের জায়গা হল অন্তর। আন্তরিকতা না থাকলে কোন কর্ম গ্রহণযোগ্য নয়। অন্তরে বিশ্বাস না থাকলে কেউ বিশ্বাসী নয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَبٌ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ} (৷) سورة الحجرات

“তোমরা জেনে রেখো যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রসূল রয়েছেন; তিনি বহু বিষয়ে তোমাদের কথা শুনলে তোমরাই কষ্ট পাবে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের নিকট ঈমান (বিশ্বাস)কে প্রিয় করেছেন এবং ওকে তোমাদের হৃদয়ে সুশোভিত করেছেন। আর কুফরী (অবিশ্বাস), পাপাচার ও অবাধ্যতাকে তোমাদের নিকট অপ্রিয় করেছেন। ওরাই সৎপথ অবলম্বনকারী।” (হুজুরাত ৪৭)

{لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (৷৷)

“তুমি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায় পাবে না, যারা ভালবাসে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচারীদেরকে; হোক না এই বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা তাদের জাতি-গোত্র। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর পক্ষ হতে রূহ (জ্যোতি ও বিজয়) দ্বারা। তিনি তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে; যার নিম্নদেশে নদীমালা প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রেখো যে, আল্লাহর দলই সফলকাম।” (মুজাদালাহ ৪২২)

{سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ

بِأَسْنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ} (৷৷) سورة الفتح

“(যুদ্ধ থেকে) পশ্চাতে থাকা মরুবাসীরা তোমাকে বলবে, ‘আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন আমাদেরকে ব্যস্ত রেখেছিল, অতএব আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা’ তারা মুখে তা বলে, যা তাদের অন্তরে নেই।” (ফাতহঃ ১১)

{إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ}

(২২) سورة النحل

“তোমাদের উপাস্য একক উপাস্য; সুতরাং যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর সত্য-বিমুখ এবং তারা অহংকারী।” (নাহলঃ ২২)

{قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}

(১৬) سورة الحجرات

“মরুবাসী (বেদুঈন)গণ বলে, ‘আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি।’ তুমি বল, ‘তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করনি, বরং তোমরা বল, আমরা আত্মসমর্পণ করেছি; কারণ বিশ্বাস এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশই করেনি। যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য কর, তবে তোমাদের কর্মফল সামান্য পরিমাণও লাঘব করা হবে না। আর নিশ্চয় আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’ (হুজুরাতঃ ১৪)

এ হৃদয় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়, শক্তিত-আতঙ্কিত হয়। ভয়ে বুক দুরুদুর করে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا

قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ } (২৩) سورة سبأ

“যাকে অনুমতি দেওয়া হবে সে ব্যতীত আল্লাহর নিকট কারও সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না। এমনকি যখন ওদের অন্তর হতে ভয় বিদূরিত হয়, তখন ওরা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করে, ‘তোমাদের প্রতিপালক কী হুকুম করেছেন?’ উত্তরে তারা বলে, ‘যা সত্য তিনি তাই বলেছেন। তিনি সুউচ্চ, সুমহান।’ (সাবাঃ ২৩)

{لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ} (১৩)

“প্রকৃতপক্ষে তাদের অন্তরে আল্লাহ অপেক্ষা তোমরাই অধিকতর ভয়ংকর; এটা এই জন্য যে, তারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়।” (হাশরঃ ১৩)

{سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا}

وَمَا وَاهُمْ النَّارُ وَبُئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ { (১০১) سورة آل عمران

“যারা অবিশ্বাস করে তাদের হৃদয়ে আমি ভীতির সঞ্চার করব, যেহেতু তারা আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন করেছে; যার সপক্ষে আল্লাহ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। জাহান্নাম হবে তাদের নিবাস। আর অনাচারীদের আবাসস্থল অতি নিকৃষ্ট!” (আলে ইমরান : ১৫১)

{وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا} { (২৬) سورة الأحزاب

“গ্রন্থধারীদের মধ্যে যারা ওদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল, তাদেরকে তিনি দুর্গ হতে অবতরণে বাধ্য করলেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করলেন; এখন তোমরা ওদের এক দলকে হত্যা করছ এবং এক দলকে বন্দী করছ।” (আহযাব : ২৬)

{إِذْ جَاؤُكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا} { (১০) سورة الأحزاب

“যখন ওরা তোমাদের বিরুদ্ধে উচ্চ অঞ্চল ও নিম্ন অঞ্চল হতে সমাগত হয়েছিল, যখন (তোমাদের) চক্ষু স্থির হয়ে গিয়েছিল, (তোমাদের প্রাণ) হৃদয় হয়ে পড়েছিল কণ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ করেছিলে।” (আহযাব : ১০)

{قُلُوبٌ يُّوَمِّزُ وَاجِفَةٌ} { (৮) سورة النازعات

“কত হৃদয় সে (কিয়ামতের) দিন ভীত-সম্ভ্রান্ত হবে।” (না-যিআত : ৮)

{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} { (২) سورة الأنفال

“বিশ্বাসী (মু’মিন) তো তারাই, যাদের হৃদয় আল্লাহকে স্মরণ করার সময় কম্পিত হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের বিশ্বাস (ঈমান) বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই ভরসা রাখে।” (আনফাল : ২)

{الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمُ الْمُلْهَمُ وَالْمُتَّقِينَ} { (৩০) سورة الحج

“যাদের হৃদয় ভয়ে কম্পিত হয় আল্লাহর নাম স্মরণ করা হলে, যারা তাদের বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করে, নামায কায়ম করে এবং আমি



তাদেরকে যে রুযী দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে।” (হাজ্জ : ৩৫)

এ অন্তর সুদৃঢ় হয়, অবিচলিত হয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ} (سورة الكهف (১৬))

“আমি তাদের অন্তরকে সুদৃঢ় করেছিলাম।” (কাহফ : ১৪)

{وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنِ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا}

{لَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (سورة القصص (১০))

“মূসা-জননীর হৃদয় অস্থির হয়ে পড়েছিল। যাতে সে আত্মশীল হয় সেজন্য তার হৃদয়কে আমি সুদৃঢ় ক’রে না দিলে সে তার পরিচয় তো প্রকাশ করেই দিত।” (ক্বাস্বাস্ব : ১০)

এ হৃদয় হয় ভয়শূন্য, প্রশান্ত ও নিরুদ্ভিগ্ন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ}

“যারা বিশ্বাস করেছে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের হৃদয় প্রশান্ত হয়। জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণেই হৃদয় প্রশান্ত হয়।” (রা’দ : ২৮)

অন্তরের উদ্দেশ্য বিচার করেই পাপ-পুণ্য ও ভালো-মন্দ বিচার করা হয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا}

{رَحِيمًا} (سورة الأحزاب (৫))

“যে বিষয়ে তোমরা ভুল কর সে বিষয়ে তোমাদের কোন অপরাধ নেই, কিন্তু তোমাদের আন্তরিক ইচ্ছা থাকলে (তাতে অপরাধ আছে)। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (আহযাব : ৫)

এই হৃদয় হয় পাপময়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} (২৮৩)

“তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না, বস্তুতঃ যে তা গোপন করে, নিশ্চয় তার অন্তর পাপময়। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত।” (বাক্বারাহ : ২৮৩)

এ হৃদয়কে পরীক্ষা করা হয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ الَّذِينَ يَغْضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ}

{لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَّغْفَرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ} (سورة الحجرات (৩))

“যারা আল্লাহর রসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে আল্লাহ-ভীরুতার জন্য পরীক্ষা করেছেন। তাদের জন্য

রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।” (হুজুরাত : ৩)

এই হৃদয়ে লুক্কায়িত থাকে কত গোপন কথা। আর সে মনের কথা আল্লাহ জানেন, তিনিই অন্তর্যামী। তিনি বলেছেন,

{ هَآأَنْتُمْ أَوْلَآءُ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَابِلَ مِنَ الْغِيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغِيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ } (১১৭) سورة آل عمران

“ভেবে দেখ! তোমরা (বন্ধু ভেবে) তাদেরকে ভালবাস; কিন্তু তারা তোমাদেরকে ভালবাসে না। আর তোমরা সমস্ত কিতাবে বিশ্বাস কর, (কিন্তু তারা তোমাদের কিতাবে বিশ্বাস করে না) এবং যখন তারা তোমাদের সাক্ষাতে আসে তখন তারা বলে, ‘আমরা বিশ্বাস করি।’ কিন্তু যখন তারা একা হয়, তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে তারা নিজেদের আঙ্গুল দাঁতে কাটে। বল, আক্রোশেই মর তোমরা। নিশ্চয় আল্লাহ বক্ষস্থলে (অন্তরে) যা রয়েছে, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।” (আলে ইমরান : ১১৯)

{ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ } (১৩) سورة الملك

“তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বল অথবা প্রকাশ্যে, নিশ্চয় তিনি অন্তর্যামী।” (মুল্ক : ১৩)

{ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ } (১৭) سورة غافر

“চক্ষুর চোরা চাহনি ও অন্তরে যা গোপন আছে, সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত।” (মু’মিন : ১৯)

{ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ } (৭৪) سورة النمل

“ওদের অন্তর যা গোপন করে এবং ওরা যা প্রকাশ করে, তা তোমার প্রতিপালক অবশ্যই জানেন।” (নাম্ল : ৭৪)

এ হৃদয় প্রশস্ত হয়, সংকীর্ণ ও সংকুচিত হয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ }

(২) سورة الأعراف

“তোমার নিকট কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে; সুতরাং তোমার মনে যেন এর সম্পর্কে কোন প্রকার সংকীর্ণতা না থাকে। যাতে তুমি এর দ্বারা সতর্ক কর এবং বিশ্বাসীদের জন্য এটি উপদেশ।” (আ’রাফ : ২)

{ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ }

كَنَزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ { (১২)

“তোমার নিকট যা অহী (প্রত্যাদেশ) করা হয়, সম্ভবতঃ তুমি হয়তো তার কিছু অংশ বর্জন করবে এবং ‘তার প্রতি কোন ধনভান্ডার অবতীর্ণ করা হয়নি কেন? অথবা তার সাথে কোন ফিরিশ্তা আসেনি কেন?’ তাদের এই কথায় তোমার মন সঙ্কুচিত হবে। (কিন্তু হে নবী!) তুমি তো শুধুমাত্র একজন সতর্ককারী। আর আল্লাহই হচ্ছেন প্রত্যেক বস্তুর উপর দায়িত্বশীল।” (হূদঃ ১২)

{وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ} سورة الحجر (৭৭)

“আমি তো অবশ্যই জানি যে, তারা যা বলে তাতে তোমার হৃদয় সংকুচিত হয়।” (হিজরঃ ৯৭)

{فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرُّجُسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ} سورة الأنعام (১২০)

“আল্লাহ কাউকে সৎপথে পরিচালিত করার ইচ্ছা করলে, তিনি তার হৃদয়কে ইসলামের জন্য প্রশস্ত ক’রে দেন এবং কাউকে বিপথগামী করার ইচ্ছা করলে, তিনি তাঁর হৃদয়কে অতিশয় সংকীর্ণ ক’রে দেন; তার কাছে ইসলাম অনুসরণ আকাশে আরোহণের মতই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। যারা বিশ্বাস করে না, আল্লাহ তাদের উপর এরূপে অপবিত্রতা (শয়তান অথবা আযাব) নির্ধারিত করেন।” (আনআমঃ ১২৫)

হাদীসে মহানবী ﷺ হৃদয়ের বিভিন্ন ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন।

এ হৃদয়ই হল সারা দেহের রাজা। এ ভালো হলে, সারা দেহ ভালো। এ খারাপ হলে সারা দেহ খারাপ।

(( أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى ، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ )) متفقٌ عَلَيْهِ

“শোন! দেহের মধ্যে একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে; যখন তা সুস্থ থাকে, তখন গোটা দেহটাই সুস্থ হয়ে থাকে। আর যখন তা খারাপ হয়ে যায়, তখন গোটা দেহটাই খারাপ হয়ে যায়। শোন! তা হল হৃৎপিণ্ড (অন্তর)।” (বুখারী ৫২, ২০৫১, মুসলিম ৪১৭৮নং)

এ হৃদয়ই হল পরিবর্তনশীল। আদম সন্তানের হৃদয় আছে মহান স্রষ্টার

দুই আঙ্গুলের মাঝে। তিনিই ঘুরান-ফিরান, উলট-পালট করেন, তার পরিবর্তন ঘটান।

আনাস রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বেশি বেশি বলতেন,

((يَا مُقَلَّبَ الْقُلُوبِ ، ثُبَّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ)).

“হে হৃদয়সমূহকে বিবর্তনকারী! তুমি আমার হৃদয়কে তোমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখো।” আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমরা আপনার প্রতি এবং আপনি যা আনয়ন করেছেন তার প্রতি ঈমান এনেছি, আপনি কি আমাদের ব্যাপারে ভয় করেন?’ তিনি বললেন, “হ্যাঁ, হৃদয়সমূহ আল্লাহর আঙ্গুলসমূহের মধ্যে দু’টি আঙ্গুলের মাঝে আছে। তিনি তা ইচ্ছামত বিবর্তন ক’রে থাকেন।” (তিরমিযী ২১৪০, ইবনে মাজাহ ৩৮৩৪, মিশকাত ১০২নং)

এ হৃদয়েই জং পড়ে, দাগ পড়ে। অতঃপর ক্ষমাপ্রার্থনার ফলে পরিষ্কার হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন,

((إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُّكْتُتَ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءٌ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سَقَلَ قَلْبُهُ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُو قَلْبُهُ وَهُوَ الرَّأْنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ : كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ)).

“মু’মিন যখন কোন পাপ করে, তখন তার হৃদয়ে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। অতঃপর সে যদি তওবা করে, পাপ থেকে বিরত হয় এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে তার হৃদয় পরিষ্কার হয়ে যায়। আর যদি আরো বেশি পাপ করে, তাহলে সেই দাগ তার হৃদয়কে গ্রাস ক’রে নেয়। এই হল সেই জং, যার কথা আল্লাহ তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন : ‘না এটা সত্য নয়; বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের হৃদয়ে জং ধরিয়ে দিয়েছে।’ (মুত্ওয়াফ্‌ফিফীন ৪ : ১৪) (আহমাদ ৭৮-৯২, তিরমিযী ৩৩৩৪, সহীহ ইবনে মাজাহ ৩৪২২নং)

এ হৃদয়েই থাকে শয়তানী অংশ। জিবরীল রাঃ শিশু নবীর হাট বের ক’রে সোনার পাত্রে রেখে যমযমের পানি দ্বারা শয়তানী অংশটুকু ধুয়ে পরিষ্কার ক’রে দিয়েছিলেন। (মুসলিম ৪৩১নং)

এ হৃদয়ে থাকে অহংকার। মহানবী সঃ বলেছেন,

(( لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ )) فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا ، وَعَعْلُهُ حَسَنَةً ، فَقَالَ : (( إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ ، الْكِبَرُ : بَطَرُ الْحَقِّ ، وَغَمَطُ النَّاسِ )) . رواه مسلم

“যার অন্তরে অণু পরিমাণও অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ

করবে না।” (এ কথা শুনে) এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, ‘মানুষ তো পছন্দ করে যে, তার কাপড়-চোপড় সুন্দর হোক, তার জুতা সুন্দর হোক, (তাহলে সেটাও কি অহংকারের মধ্যে গণ্য হবে?)’ তিনি বললেন, “নিশ্চয় আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য ভালবাসেন। অহংকার হচ্ছে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা ও মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা।” (মুসলিম ২৭৫নং)

আর মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} (৫৬) سورة غافر

“যারা নিজেদের নিকট আগত কোন দলীল ছাড়াই আল্লাহর নিদর্শনাবলী সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, ওদের অন্তরে আছে কেবল অহংকার, যা সফল হওয়ার নয়। অতএব তুমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর; নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।” (মু’মিন : ৫৬)

এ বক্ষস্থিত অন্তরেই থাকে ঈমান, তাক্বওয়া, পরহেযগারী ও আন্তরিকতা। মহানবী ﷺ নিজ বক্ষস্থলের প্রতি ইঙ্গিত ক’রে বলেছেন,

(( التَّقْوَى هَاهُنَا التَّقْوَى هَاهُنَا ))

“আল্লাহভীতি এখানে রয়েছে। আল্লাহভীতি এখানে রয়েছে।” (মুসলিম ৬৭০৬নং)

তিনি আরো বলেছেন,

((أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً)).

“(পরকালে) আল্লাহ বলবেন, সেই ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে বের কর, যে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলেছে এবং তার হৃদয়ে যবের দানা পরিমাণ মঙ্গল (ঈমান) আছে। সেই ব্যক্তিকেও জাহান্নাম থেকে বের কর, যে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলেছে এবং তার হৃদয়ে অণু (বা ভুট্টা) পরিমাণ মঙ্গল (ঈমান) আছে। আর সেই ব্যক্তিকেও জাহান্নাম থেকে বের কর, যে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলেছে এবং তার হৃদয়ে গমের দানা পরিমাণ মঙ্গল (ঈমান) আছে।” (আহমাদ ৩/২৭৬, তিরমিযী ২৫৯৩নং, এ হাদীসের মূল রয়েছে সহীহায়নে)

বলা বাহুল্য, কুরআন ও হাদীসের স্পষ্টার্থ থেকে পরিষ্কার হয় যে, হৃদয়

মানবদেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। তার বাহ্যিক কর্ম রক্ত সঞ্চালন ছাড়াও রয়েছে মানব চরিত্রের নানা ভূমিকা। জ্ঞানের উৎস হল হৃদয়। আর তা আছে বক্ষস্থলে।

কিন্তু বিজ্ঞানী ও দার্শনিকগণ বলেন, জ্ঞানের উৎস ও বুদ্ধিমত্তা আছে মস্তিষ্কে, হৃদয়ে নয়। অবশ্য অন্য এক শ্রেণীর দার্শনিক ধারণা করেন, জ্ঞান-বুদ্ধি মানবদেহের কোন নির্দিষ্ট অঙ্গে সীমাবদ্ধ নেই। সম্ভবতঃ তাঁরা তাকে প্রাণের মতোই ধারণা ক’রে থাকেন।

বিজ্ঞানীরা বলেন, মস্তিষ্কই হল দেহের রাজা, ব্রেইনই হল মেইন। সেটা বিকল হলে সব বিকল। মস্তিষ্ক বিকল হলে হৃৎপিণ্ডও বিকল।

কোন মানুষের হাট পরিবর্তন করা হলে তার স্মৃতি, জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে না। বুদ্ধিমানের হাট পরিবর্তন ক’রে পাগলের হাট প্রতিস্থাপন করলে বুদ্ধির কোন পরিবর্তন ঘটে না।

যেমন কর্মের জন্য দায়ী হল মাথা ও ব্রেন। তার ইঙ্গিত কুরআনেও রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{كَأَلَّا لَيْنٌ لَّمْ يَنْتَهُ لِنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ (١٥) نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ} (١٦) العلق

“সাবধান! সে যদি নিবৃত্ত না হয়, তাহলে আমি তাকে অবশ্যই হেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাব, মাথার অগ্রভাগ ধরে। মিথ্যাবাদী, পাপিষ্ঠের মাথার অগ্রভাগ। (আল/ক্বঃ ১৫- ১৬)

তাহলে হৃদয়ের ভূমিকা নিয়ে কুরআন-হাদীসে যা বলা হয়েছে, তা কি ভুল?

অনেকে তাই মনে করেন অথবা মনে করেন, তা অনুবাদের ভুল। তাই তাঁরা শব্দের মূখ্যার্থ গ্রহণ না ক’রে গৌণার্থ গ্রহণ করেন। তাঁরা বলেন, ‘কলব’ শব্দের দুটি অর্থ আছে : একটা হল হৃদয়, আরেকটা হল বুদ্ধিমত্তা।

আর ‘স্বাদর’ শব্দেরও দুটি অর্থ আছে : একটা হল বক্ষ বা বুক, আরেকটা হল কেন্দ্র।

তাঁরা মহান আল্লাহর

{فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارَ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ}

এই বাণীর অনুবাদ করেন, “বস্তুতঃ চক্ষু তো অন্ধ নয়; বরং তাহাদের বুদ্ধিমত্তা, যাহা রহিয়াছে কেন্দ্রে তাহাই অন্ধ।”

অনেকে একই কারণে সহীহ হাদীসকে অমান্য ক’রে মহানবী ﷺ-এর বক্ষবিদারণ ও হৃদয় ধৌতকরণের ঘটনাকে অস্বীকার করেন।

কিন্তু একজন কুরআন-হাদীসে বিশ্বাসী মু'মিন এতগুলি স্পষ্ট উক্তিকে ছাই উড়ানোর মতো উড়িয়ে দিতে পারে না। সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর বাণী। আর তিনি যা জানেন, মানুষ কি তা জানতে পারে?

{أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} (১৪) سورة الملك

“যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত।” (মূলকঃ ১৪)

মু'মিন বিশ্বাস করে, বুদ্ধিমত্তা, আবেগ, অনুভূতি ইত্যাদি আছে হৃদয়ে। তবে তার প্রধান সম্পর্ক আছে ব্রেনের সাথে। যেমন প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সম্পর্ক আছে ব্রেনের সাথে।

দুঃখ-দুশ্চিন্তার ফলে হার্টের রোগ হয়। তাহলে হার্ট নিশ্চয়ই প্রতিফলনের স্থান। হৃদয় অনুভব করে। অতঃপর সে তা প্রেরণ করে মস্তিষ্কে। অতঃপর উভয়ের কাজ হয় ম্যানেজার ও সেক্রেটারির মতো অথবা স্টুডিও ও রিসিভারের মতো। একজন সেন্ট করে এবং অপরজন করে রিসিভ। হৃদয় দেহের রাজা হলেও কুরআন-হাদীস মস্তিষ্কের কথাকে অস্বীকার করেনি।

অবশ্য আধুনিক গবেষণায় জানা গেছে যে, হার্ট এক প্রকার হরমোন উৎপাদন করে, যার দ্বারা বুদ্ধিমত্তার পুষ্টিসাধন হয়। এ কথা প্রমাণিত হলে আমরা বুঝতে পারব যে, আমরা হৃদয় দিয়ে বুঝি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, হার্ট দেহের একটি অঙ্গ, মস্তিষ্কের সাথে তার যোগাযোগ থাকে, যেমন অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের থাকে। হার্ট পরিবর্তন করে অন্য হার্ট প্রতিস্থাপনের ফলে মানুষ খুব একটা স্বাভাবিক হয় না এবং বেশি দিন বাঁচেও না। হার্ট ঈমান ও কুফরের অবস্থান ক্ষেত্র হলে, তার পরিবর্তনে কি মানুষের পরিবর্তন ঘটবে? তার মানে যদি কোন মু'মিনের হার্টের জায়গায় যদি কোন কাফেরের হার্ট প্রতিস্থাপন করা হয়, তাতে কি মু'মিন কাফের হয়ে যাবে? অনুরূপ যদি কোন কাফেরের হার্টের জায়গায় যদি কোন মু'মিনের হার্ট প্রতিস্থাপন করা হয়, তাতে কি কাফের মু'মিন হয়ে যাবে?

তা হয়তো হবে না। তবে তার ফলে প্রভাব পড়বে অনেক। খাদ্য, পরিবেশ, বন্ধুত্ব, দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি যেমন মানুষের প্রকৃতিতে প্রভাব ফেলে, তেমনি হার্ট পরিবর্তনের ফলেও তার প্রকৃতিতে কিছু না কিছু প্রভাব পড়বে। ফলে তার ঈমান নবায়নের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।

মোটকথা, হৃদয় দিয়ে মানুষের বুদ্ধিমত্তা সজাগ থাকে, নিশ্চয়ই মস্তিষ্কের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ক'রে। হৃদয়ের আধ্যাত্মিক আলো আছে, যেমন চক্ষুর আছে দৃষ্টিশক্তির আলো।

## হৃদয় কেমন?

### হৃদয় পরিবর্তনশীল

আরবী ভাষায় হৃদয়কে ‘ক্বাল্ব’ বলা হয়। এর অর্থ উলট-পালট, পালটানো, পরিবর্তন ইত্যাদি।

যেহেতু মানুষের মন ক্ষণে ক্ষণে পাল্টে যায়, কারণে-অকারণে বিশ্বাসে পরিবর্তন ঘটে, ভাবনা, কল্পনা ও চিন্তা-চেতনায় বদল ঘটে, মনের ইচ্ছা, নিয়ত, সংকল্প নিমেষে বদলে যায়, পথপ্রাপ্তি ও পথভ্রষ্টতা, ঈমান, কুফরী ও মুনাফিকীর মাঝে মনের অবস্থান্তর ঘটে, সেহেতু মনকে ‘ক্বাল্ব’ বলা হয়। মহান সৃষ্টিকর্তা এই মনের পরিবর্তন ঘটান। এই জন্যই মহানবী ﷺ বেশি বেশি দুআ করতেন,

((يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ))

“হে হৃদয়সমূহকে বিবর্তনকারী! তুমি আমার হৃদয়কে তোমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখো।” (তিরমিযী ২১৪০, ইবনে মাজাহ ৩৮-৩৪, মিশকাত ১০২নং)

মানুষের বুকে ঈমান খুবই সূক্ষ্ম ও গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। কিন্তু তা হৃদয়ে থাকে কচুর পাতার ওপর পানি থাকার মতো। সামান্য হাওয়াতে সরাং ক’রে গড়িয়ে পড়ে যায়।

মানুষের মন শূন্যে ভাসমান মেঘের মতো অথবা ফাঁকা মাঠে পড়ে থাকা তুলোর মতো, যেদিক থেকে হাওয়া আসে, তার বিপরীত দিকে সরে যেতে থাকে।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إِنَّمَا سُمِّيَ الْقَلْبُ مِنْ تَقَلُّبِهِ إِنَّمَا مَثَلُ الْقَلْبِ كَمَثَلِ رِيْشَةٍ مُّعَلَّقَةٍ فِي أَصْلِ شَجَرَةٍ

يُقَلِّبُهَا الرِّيحُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ))

“আসলে ‘ক্বাল্ব’ নামকরণ হয়েছে তার পরিবর্তনের জন্য। আসলে হৃদয়ের উপমা গাছের গোড়ায় আটকে যাওয়া একটি পালকের মতো, যাকে বাতাস পিঠের দিকটা পেটের দিক ক’রে ওলট-পালট করে।” (আহমাদ ১৯৬৬১, বাইহাকীর শুআবুল ঈমান ৭৫২, সঃ জামে’ ২৩৬৮নং)

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “হৃদয়ের উপমা হল ফাঁকা ময়দানে পড়ে থাকা পালকের মতো, যাকে হাওয়া ওলট-পালট ক’রে থাকে।” (ইবনে মাজাহ ৮৮নং)

হ্যাঁ, ক্ষণিকের মধ্যে সামান্য কারণে ভালোবাসা ঘৃণায় পরিণত হয়, যেমন রাগ অনুরাগে পরিবর্তিত হয়। মহানবী ﷺ বলেছেন,



((أَحِبُّ حَبِيبِكَ هَوْنًا مَّا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَّا وَأَبْغِضُ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَّا عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَّا)).

“তোমার বন্ধুকে মধ্যমভাবে ভালোবাস (অর্থাৎ, তার ভালোবাসাতে তুমি অতিরঞ্জন করো না)। কারণ, একদিন সে তোমার শত্রুতে পরিণত হতে পারে। আর তোমার শত্রুকে তুমি মধ্যমভাবে শত্রু ভেবো। (অর্থাৎ, তাকে শত্রু ভাবাতে বাড়াবাড়ি করো না)। কারণ, একদিন সে তোমার বন্ধুতে পরিণত হতে পারে।” (সুতরাং তখন তোমাকে লজ্জায় পড়তে হবে।) (তিরমিযী ১৯৯৭, সহীহুল জামে’ ১৭৮ নং)

সামান্য কথা উচ্চারণ করার ফলে মানুষ কাফের হয়ে যেতে পারে। বিশেষ বিশ্বাস মনে জায়গা দেওয়ার ফলেও মানুষ কাফের হতে পারে।

যায়েদ ইবনে খালেদ রাঃ বলেন, একদা হুদাইবিয়াতে রাতে বৃষ্টি হলে আমাদেরকে ফজরের নামায পড়ানোর পর নবী সঃ সকলের দিকে মুখ ক’রে বসে বললেন, “তোমরা জান কি, তোমাদের প্রতিপালক কী বলেন?” সকলে বলল, ‘আল্লাহ ও তদীয় রসূল ভাল জানেন।’ তিনি বললেন,

(( قَالَ : أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنُوءٍ كَذَا وَكَذَا ، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ )) .

“আল্লাহ বলেন, আমার বান্দাদের মধ্যে কিছু বান্দা মু’মিন হয়ে ও কিছু কাফের হয়ে প্রভাত করেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি বলেছে যে, ‘আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়ায় আমাদের উপর বৃষ্টি হল’, সে তো আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী (মু’মিন)ও নক্ষত্রের প্রতি অবিশ্বাসী (কাফের)। আর যে ব্যক্তি বলেছে যে, ‘অমুক অমুক নক্ষত্রের ফলে আমাদের উপর বৃষ্টি হল’, সে তো আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসী (কাফের) এবং নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসী (মু’মিন)।” (বুখারী ৮-৪৬, ১০৩৮, মুসলিম ২৪০নং)

মানুষের মনের পরিবর্তন ঘটে, পছন্দে ভিন্নতা আসে, ইচ্ছায় বৈপরীত্য দেখা দেয়, ফলে মত বদল হয়, পথ বদল হয়, দল বদল হয়, জীবনের পালা বদল হয়। সিদ্ধান্ত পালে যায়, কখনো বা নিজের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়।

আর মেয়েদের ব্যাপারে তো জ্ঞানিগণ বলেছেন, ‘মহিলার হৃদয় হল মরুভূমির বালির মত। গতকাল যা লিখেছে আজ তার কোন চিহ্ন দেখতে

পায় না।’

‘পৃথিবীতে যত কিছু আশ্চর্য জিনিস আছে তার মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্য মেয়ে মানুষের মন। তারা কী চায়, আর কী না চায় অতি বড় পন্ডিতরাও বলতে পারে না।’

কেউ লিখেছেন,

‘বুঝতে নারি নারী কী চায়---  
মাঝখানে ছেদ কইতে কথা,  
চাইতে চাইতে মুদে পাতা  
হাসতে হাসতে কেঁদে ফেলে  
আসতে কাছে ফিরে যায়।  
বুঝতে নারি নারী কী চায়।’

কেউ বলেছেন,

‘আমি আকাশ ছুঁয়েছি, চন্দ্র ছুঁয়েছি, ছুঁয়েছি গ্রহতারা,  
শুধু তোমার হৃদয় ছুঁয়ে আমি হয়েছি দিশেহারা।’

কেউ বলেছেন,

‘তুমি মোরে ভুলিয়াছ, তাই সত্য হোক,  
নিশি শেষে নিভে গেছে দীপালী আলোক!  
সুন্দর কঠিন তুমি পরশ পাথর,  
তোমার পরশ লভি হইনু সুন্দর---  
----সত্য হোক প্রিয়া

দীপালী জ্বলিয়াছিল---গিয়াছে নিভিয়া!’

পাল্টানোর ক্ষেত্রে মনের গতি অতি তীব্র। সকল প্রকার ভাঙ্গা-গড়ার আগে মানুষের মন ভাঙ্গে।

‘তীর তারা উল্কা বায়ু শীঘ্রগামী যেবা,  
মনের অগ্রেতে বল যেতে পারে কেবা?’

### মন ভঙ্গুর

ঠুনকো কাঁচের মতো মানুষের মন। সামান্য আঘাতে ভেঙ্গে যায়। আর একবার ভাঙলে তা আর জোড়া লাগে না। প্রলেপ দিয়ে হয়তো তার ফাটল ঢাকা যায়, কিন্তু জোড়া দেওয়া যায় না। ছেঁড়া চুল আর খোঁপায় ফেরে না। দোহানো দুধ আর গোস্তুনে ফেরে না। বৃত্ত থেকে খসে পড়া ফুল বা ফল আর গাছে ফেরে না। বহু মূল্য প্রদান করলেও না।

‘দিলে বহু রত্নরাজি কিবা ফল তায়,

ভেঙ্গেছ হৃদয় কিংবা ভেঙ্গেছ মুক্তায়।’

অলংকারে জোড়া লাগে, মনে জোড়া লাগে না। হাড় ভাঙ্গলে জোড়া লাগে, মন ভাঙ্গলে জোড়া লাগে না।

‘হাড় ভাঙ্গলে জোড়া লাগে কলে আর বলে,

মন ভাঙ্গলে জোড়া লাগে না ইহ-পরকালে।’

গায়ের কালি ধুলে যায়, মনের কালি ম’লে যায়। জীবন থাকতে সে দাগ মেটে না, ওঠে না। এ যে মানুষের মন। বড় স্পর্শকাতর, বড় ঠুনকো।

### হৃদয়-প্রদীপ

হৃদয়কে আরবী ভাষায় ‘ফুআদ’ও বলা হয়। এর মূল শব্দের আভিধানিক অর্থ হল জ্বলা, প্রজ্জ্বলিত হওয়া। যেহেতু হৃদয় নানা কল্পনা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও চিন্তা-ভাবনার মধ্যে বিরামহীন জ্বলতে থাকে।

মানুষ তার কান বন্ধ রাখতে পারে এবং ইচ্ছা করলে কিছু না শুনতে পারে, চোখ বন্ধ রাখতে পারে এবং ইচ্ছা হলে কিছু না দেখতে পারে। কিন্তু সে ইচ্ছা করলেও তার হৃদয়ের ক্রিয়াকে বন্ধ রাখতে পারে না। ইচ্ছা করলেও সে খেয়াল, কল্পনা, চিন্তা-ভাবনা ইত্যাদিকে বন্ধ রাখতে পারে না।

### হৃদয়-শশী

স্মৃতিশক্তি থাকে হৃদয়ে। অবশ্য ব্রেন তার স্টোররুম। মানুষের মন অনেক কিছু স্মরণ রাখে, অনেক কিছু ভুলে যায়। বিস্মৃত জিনিস পরক্ষণে স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে। যেন হৃদয় একটি দীপ্তিমান চন্দ্র। সেই চন্দ্রাকাশে মেঘ আসে। ফলে পৃথিবীর বুকে তার জ্যোৎস্নালোক বিলীন হয়ে যায়। মেঘ সরে গেলে আবার আলোময় হয়ে ওঠে পৃথিবী।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر بينما القمر يضيء إذ علقته

سحابة فأظلم، إذ تجلت عنه أضواء)).

“এমন কোন হৃদয় নেই, যার চাঁদের মতো মেঘ নেই। চাঁদ আলো দান করে, এমন সময় মেঘ ছেয়ে অন্ধকার আনয়ন করে। অতঃপর যখন মেঘ সরে যায়, আবার চাঁদ আলো দেয়।” (তাবারানীর আওসাত্ব ৫২২০, সং জামে’ ৫৬৮-২নং)

### দেহের রাজা হৃদয়

হৃদয় হল দেহের রাজা। হৃদয় ঠিক হলে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠিক। হৃদয় ভালো হলে, সারা দেহ ভালো, হৃদয় খারাপ হলে সারা দেহ খারাপ।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ )) متفقٌ عَلَيْهِ

“শোন! দেহের মধ্যে একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে; যখন তা সুস্থ থাকে, তখন গোটা দেহটাই সুস্থ হয়ে থাকে। আর যখন তা খারাপ হয়ে যায়, তখন গোটা দেহটাই খারাপ হয়ে যায়। শোন! তা হল হৃৎপিণ্ড (অন্তর)।” (বুখারী ৫২, ২০৫১, মুসলিম ৪১৭৮-৮৭)

মন হল রাজা। অসুখের ক্ষেত্রেও মনের রোগ আগে চিকিৎসাযোগ্য। মনের রোগ সারতে না পারলে শরীরের রোগ সারা সুকঠিন। জ্ঞানিগণ বলেন, ‘চিকিৎসকরা যে ভুল করেন তা হল, তাঁরা মনের চিকিৎসা না ক’রে শরীর সারাতে চান, যদিও মন আর শরীর অবিচ্ছেদ্য। তাই আলাদা করে চিকিৎসা উচিত নয়।’

### হৃদয় রহস্য-নিলয়

হৃদয় হল মানুষের রহস্যালয়। হৃদয় হল একটি ঘরের মতো, সে ঘরের থাকে নানা রহস্য, নানা ভেদ।

উমার বিন আব্দুল আযীয বলেন, ‘হৃদয় রহস্যের সিঁদুক, ওষ্ঠাধর তার তালা এবং রসনা তার চাবি। অতএব প্রত্যেকের উচিত, নিজের গুপ্ত রহস্যের চাবি হেফাযতে রাখা।’

স্বাধীন মানুষদের হৃদয় হল, ভেদরাজির কবর। সে ভেদ কাউকে প্রকাশ করে না। যেহেতু প্রকাশ করলে তাদের ক্ষতি হতে পারে, সম্মান যেতে পারে।

মনে থাকে কত কথা গোপন। মনে জানে পাপ, মায়ে জানে বাপ। মানুষ ভাবে-ভঙ্গিতে, লিখে বা মুখে যা-ই প্রকাশ করুক না কেন, তা মিথ্যা ও অবাস্তব হতে পারে, কৃত্রিম বা অভিনয় হতে পারে। আসল তথ্য ও সত্য লুক্কায়িত থাকে মনের সিঁদুকে। যেমন মায়ের বিবাহিত পুরুষকে সবাই ‘বাপ’ বলেই জানে, কিন্তু জন্মদাতা ‘আসল বাপ’ কে, তা কেবল মা-ই বলতে পারে।

কবি বলেছেন,

‘এ যে, সখী সমস্ত হৃদয়।  
কোথা জল কোথা কূল, দিক হয়ে যায় ভুল,  
অন্তহীন রহস্যনিলয়।  
এ রাজ্যের আদি অন্ত নাহি জান রানী,  
এ তবু তোমার রাজধানী।।’

### হৃদয়ের ছয় অবস্থা

হৃদয়ের ৬টি অবস্থা; জীবিত-মৃত, সুস্থ-অসুস্থ, জাগ্রত ও নিদ্রিত। তার জীবন হল হিদায়াত এবং মরণ হল ভ্রষ্টতা। সুস্থতা হল আল্লাহ ছাড়া অন্যের প্রতি আসক্তিহীনতা ও তাঁর জন্য অনাবিলতা এবং অসুস্থতা হল গায়রুল্লাহর প্রতি আসক্তি ও প্রেম। জাগরণ হল যিকর এবং নিদ্রা হল গাফলতি ও তাঁর যিকরে ঔদাস্য।

### মন বড় গভীর

সমুদ্রের গভীরতার চেয়ে হৃদয়ের গভীরতা অনেক বেশী। উপকূল থেকে সমুদ্রের গভীরতা যেমন অনুমান করা যায় না, তেমনি বাইরে থেকে কারো হৃদয়ের গভীরতা আন্দাজ হয় না।

### মন একটি পুকুর

মানুষের মন একটি অতল দীঘির মতো। কখনো তাতে মানুষ ডুবে যায়, আবার কখনো তাতে পদ্ম ফোটে। কখনো তাতে মাছ থাকে, আবার কখনো তাতে কুমীর থাকে।

### মন একটি বাগান

মানুষের মন বাগানের মত। ভালো গাছের বীজ লাগালে ভালো বাগান হবে। যদি কিছুই না লাগানো হয়, তাহলে আগাছা জন্মাবে। এমনকি ভালো বীজ লাগালেও আগাছা জন্মাবে, যদি আগাছা নিড়ানোর কাজ চালিয়ে না যাওয়া হয়। এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম। সবচেয়ে ভাল হৃদয় সেটা, যাতে ভাল স্থান পায়, যাতে ভালো ফুল ফোটে।

### মন লাগামহীন ঘোড়া

মন লাগামহীন ঘোড়ার মতো, মানুষ তার সওয়ারী। সেই ঘোড়ায় নিয়ন্ত্রণ রেখে চালাতে হলে ‘তাক্বওয়া’র লাগাম প্রয়োজন। তা না হলে সঠিক পথে সে ঘোড়া ছুটবে না এবং পূর্ণ স্বাধীনতায় সে যত্রতত্র যাতায়াত করবে।

### মন দুঃখপোষ্য শিশুর মতো

মন এমন একটি শিশুর মতো, যে মায়ের দুধ পান করে। আরবী কবি বৃস্বিরী বলেছেন,

النفس كالطفل إن تهمله شب على ... حب الرضاع وإن تطفمه ينفطم

অর্থাৎ, মন হল শিশুর মতো, যদি তুমি তাকে অবহেলা কর, তাহলে সে দুধ পান ভালোবেসেই বড় হবে। আর যদি দুধ ছাড়িয়ে দাও, তাহলে সে দুধ খাওয়া ছেড়ে দেবে।

দুনিয়ার বুকে কোন শিশুর কথা এমন শোনা যায়নি যে, সে স্বেচ্ছায় মায়ের দুধ ছেড়েছে। বরং অভ্যাসে পরিণত হয়ে সে বছরের পর বছর দুধ পান করতেই থাকে। পরিশেষে মা-কেই চেষ্টার সাথে দুধ ছাড়াতে হয়। প্রথম প্রথম দুই-চার দিন হয়তো কান্নাকাটি করে, তারপর সত্যিই সে দুধ ছেড়ে দেয়। মনও তদ্রূপ। মনকে যেভাবে অভ্যস্ত করা হবে, সেই ভাবেই সে চলতে থাকবে।

যারা বলে, ‘দিল হ্যায় কে মানতা নেহী।’ যারা বলে, ‘মন মানতে চায় না।’ যারা বলে, ‘বদ অভ্যাস ছাড়া যায় না।’ তাদের কথা সঠিক নয়। বরং সঠিক কথা এই যে, মনকে মানালে মেনে নেয়। শুরুতে কষ্ট হলেও পরিশেষে বাধ্য হয়ে যায়।

পানাহার, যৌনাচার বা অন্য যে কোন বিষয়ক বদ অভ্যাস মানুষ অবশ্যই ত্যাগ করতে পারবে, যদি সে সত্যিই দৃঢ় সংকল্প ক’রে আভ্যন্তরিক যুদ্ধে মনকে পরাভূত করে এবং সত্যিই সে আল্লাহভীতিতে ভীত-সংযত হয়।

‘পারব না’---মনের এ কথায় সায় দিলে সত্যিই পেরে ওঠা দায় হবে। কিন্তু সে কথা উড়িয়ে দিয়ে ‘পারব’ বলে বিশ্বাস ও আস্থা আনলে অবশ্যই পারা যাবে। কবি বলেছেন,

‘পারিব না এ কথাটি বলিও না আর,

কেন পারিবে না তাহা ভাব একবার।

পাঁচ জনে পারে যাহা

তুমিও পারিবে তাহা

পারিব না বলে মুখ করিয়ো না ভার।

একবারে না পারিলে দেখ শতবার।’

‘পার কি না পার কর পরখ তাহার,

একবার না পারিলে দেখ শতবার।’

‘পড়া মনে থাকে না।’ কেন থাকবে না? যথেষ্ট চেষ্টা থাকলে পাঁচজনে যা পারে, আপনিও তাই পারবেন।

‘হস্তমৈথুনে কু-অভ্যাস ছাড়া কঠিন।’ মোটেই না। চেষ্টা করলে দশজনে

যা পারে, আপনিও তাই পারবেন।

‘পান-বিড়ি-সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস ছাড়া যায় না।’ কে বলল সে কথা? ইচ্ছা পোক্ত হলে খুব সহজে তা ছাড়া যায়।

‘অত পারা যায় না’ বলে মেয়ে পর্দা করে না। আর পর্দা করতে পারে না বলে সতীত্বও তার কাছে গুরুত্বহীন হয়। শুরুতে ঢিল দিলে, সে ঢিলের আঘাত যে কত বড় হতে পারে, তা হয়তো অনুমান করতে পারে না মেয়ে ও তার অভিভাবক বা স্বামী।

‘ঘুমের অভ্যাস খারাপ হওয়ার জন্য নামায ছুটে যায়। কাজের চাপের জন্য দর্স ছুটে যায়। মুখের জড়তার জন্য কুরআন ভুল হয়।’ ভুল কথা। মনের দৃঢ়তাহীনতার জন্য সব কিছু হয়। মনকে মজবুত করলে কষ্টের কাজেও সাফল্য আসে।

কু-অভ্যাসের কারণে অনেকে রোযা ছেড়ে দেয়। আবার অনেকে ১২/ ১৪ ঘণ্টা সেই কু-অভ্যাস থেকে বিরত থেকে রোযা রাখে। ইচ্ছা করলে আরো ১০/ ১২ ঘণ্টা বিরত থাকতে পারে এবং চির দিনকার জন্য বর্জন করতে পারে।

এ দেখুন না, তারাবীহর নামাযের জন্য যে মানুষ এক ঘণ্টা মন দিতে পারে না, সে মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা কীভাবে টিভির সামনে বসে থাকে অথবা স্টেডিয়ামে বসে খেলা দেখে? সব কিছুই তো অভ্যাসের কারসাজি।

‘মানুষ অভ্যাসের দাস।’ কিন্তু সে অভ্যাস দূর করা যায়। ‘স্বভাব যায় না ম’লে, ইল্লত যায় না ধুলো।’ কিন্তু যত্ন নিলে তাও সম্ভব। মানুষ চেষ্টা করলে, তার সুফল পায়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} (৩৭) سورة النجم

“আর এই যে, মানুষ তাই পায়, যা সে চেষ্টা করে।” (নাজম : ৩৯)

{إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ} (১১) سورة الرعد

“নিশ্চয় আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না; যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে।” (রা’দ : ১১)

{ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ}

{وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (৫৩) سورة الأنفال

“এ এজন্য যে, আল্লাহ কোন সম্প্রদায়কে যে সম্পদ দান করেন, তিনি তা (ধ্বংস দিয়ে) পরিবর্তন করেন না; যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। আর নিশ্চিত আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।” (আনফাল : ৫৩)

## মনের প্রকারভেদ

মানুষের মন কত রকমের, তা বলা মুশকিল। আমার মনে হয়, যত মানুষ, তত প্রকারের মন। মনের সাথে আর এক মনের সর্ব বিষয়ে মিল পাওয়া যায় না। অবশ্য অধিকাংশ বিষয়ে বা কোন কোন বিষয়ে মিল থাকলে, ‘মনে মনে মিল, লেগে যায় খিল।’ হাদীসে আছে, মহানবী ﷺ বলেছেন,

(( النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقَّهُوا ، وَالْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اتَّخَفَ ، وَمَا تَنَافَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ )).

“সোনা-রূপার খনিরাজির মত মানব জাতিও নানা গোত্রের খনিরাজি। যারা জাহেলী যুগে উত্তম ছিল, তারা ইসলামী যুগেও উত্তম; যখন তারা দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে। আর আত্মসমূহ সমবেত সৈন্যদলের মত। সুতরাং আপোসে যে আত্মাদল পরিচিত ও অভিন্ন প্রকৃতির হয়, সে আত্মাদলের মাঝে মিলন ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়ে থাকে এবং যে আত্মাদল আপোসে অপরিচিত ও ভিন্ন প্রকৃতির হয়, সে আত্মাদলের মাঝে বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্য প্রকট হয়ে ওঠে।” (মুসলিম ৬৮-৭৭নং)

স্ত্রী বলুন, আর বন্ধুই বলুন, সব দিক দিয়ে নিজের মনের মতো পাওয়া সুকঠিন। মহান আল্লাহ যার প্রতি অনুগ্রহ করেন, তাকেই মনের মানুষ উপহার দেন। পক্ষান্তরে যাদের মনে-মনে মিল থাকে না অথচ এক বন্ধনে থাকতে বাধ্য হয়, তাদেরকে মিলটা খুঁজে নিয়ে বন্ধন বজায় রাখার চেষ্টা ক’রে যেতে হয়।

মন বড় আজীব। মন পরিবর্তনশীল। এই জন্য অন্য মনের নাগাল পাওয়াও বড় কঠিন। মনের বহুরূপী রূপ আছে। মনের নানা অবস্থা আছে, পারিপার্শ্বিক আকর্ষণ-বিকর্ষণ আছে। যার ফলে মনের এক-একটা নাম পড়ে গেছে।

কেউ বেশি ভুলে যায়, তাই তার ভোলা মন।

কেউ পাগলামি করলে বলে, পাগল মন।

কেউ সহজ-সরল হলে বলে, সরল মন।

এইভাবে হীন মন, নীচ মন, উচু মন, উদার মন, সংকীর্ণ মন, শক্ত মন, নরম মন ইত্যাদি নামকরণ করা হয়। মন একই, কিন্তু নানা গুণের কারণে



নানা নাম হয় তার।

আমরা কুরআন করীমে তিনটি মনের কথার উল্লেখ পাই।

এক ঃ নাফসে আন্মারাহ

‘আন-নাফসুল আন্মারাতু বিস্-সূ’ বা মন্দপ্রবণ মন। যে মন সর্বদা মন্দের দিকে ধাবিত হয়, খারাপ কাজের আদেশ দেয়, নোংরামিতে তুষ্ট থাকে, পাপকাজ পছন্দ করে। অবশ্য ‘কুল্লু মামনূইন মারগুব।’ অর্থাৎ, যেটাই শরীয়তে নিষিদ্ধ, সেটার দিকেই এ অবুঝ মন ছুটে চলে। মহান স্রষ্টার অবাধ্যাচরণ সে মনের বাঞ্ছিত বাসনা হয়। দ্বীনের ছায়া থেকে দূরে থেকে দ্বীনহীন রৌদ্র-তাপে দগ্ধ হতে ভালোবাসে। মহান আল্লাহ মানব-দানবকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য, কিন্তু এ মন তাঁর ইবাদতে ব্রতী হয় না, তাঁর ইবাদতে আলস্য প্রদর্শন করে, ইবাদতকে আযাব মনে করে।

এ মন মান্যবরকে মানতে চায় না, হকদারকে হক দিতে চায় না, সম্মানীকে সম্মান দেয় না। শিল্পীকে সম্মান দেয়, কিন্তু আলেমকে সম্মান দেয় না। নাস্তিক ও কাফেরকে সম্মান দেয়, কিন্তু মুসলিম ও পরহেযগার ব্যক্তিকে সম্মান দেয় না। দেবরকে মর্যাদা দেয়, কিন্তু স্বামীকে মর্যাদা দেয় না। নেত্রীকে মর্যাদা দেয়, কিন্তু মা-কে মর্যাদা দেয় না। নেতা বা পীরকে মর্যাদা দেয়, কিন্তু বাপকে মর্যাদার আসনে রাখে না। কুসঙ্গী বন্ধুকে সম্মান দেয়, কিন্তু ভাইকে অসম্মান করে।

এ মন খুন, রাহাজানি, লুঠতরাজ, সূদ, ঘুস, গান-বাজনা, মদপান ইত্যাদির অনুরক্ত থাকে।

এর বাড়িতে হাজার চ্যানেলের টিভি থাকলে বটন টিপে টিপে সেই চ্যানেল বের করে, যা দেখলে তার চোখের ব্যভিচার হয়।

এ মনের উপর শয়তানের আধিপত্য থাকে, এ মনে আল্লাহর যিকর থাকে না। এ মনে আল্লাহর ভয় থাকে না, এ মন-অশ্বের লাগাম থাকে আরোহী শয়তানের হাতে।

এ মনের ভিতরে লজ্জা-শরম থাকে না, এ মনে পবিত্রতা ও সচ্চরিত্রতা স্থান পায় না।

এ মন উপদেশ গ্রহণ করে না, উপদেশ দেওয়া হলে অহংকারের সাথে তা প্রত্যাখ্যান করে। এ মন পাপ করে এবং পরিবেশের দোহায় দেয়, সমাজ ও বাপ-দাদার হাওয়ালা দেয়। কখনো-বা ধর্মের দোহায় দেয়! মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ

بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} (২৮) سورة الأعراف

অর্থাৎ, যখন তারা কোন অশ্লীল আচরণ করে, তখন বলে, ‘আমরা আমাদের পূর্বপুরুষগণকে এটা করতে দেখেছি এবং আল্লাহও আমাদেরকে এর নির্দেশ দিয়েছেন।’ বল, ‘আল্লাহ অশ্লীল আচরণের নির্দেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলছ যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই?’ (আ’রাফঃ ২৮)

এ মন স্বাধীনতা চায়, মুক্ত হতে চায়, ধর্মের বাঁধন-হারা, চরিত্রের লাগাম-ছাড়া হতে চায়। মন-সুখ ও তৃপ্তি চায়।

এ মন প্রবৃত্তির পূজা করে, অবৈধভাবে যৌনস্বধা নিবারণ করতে চায়। অবৈধ নারীর দিকে সকামে দৃকপাত করে, ইভটিজিং করে, ধর্ষণ করে, অবৈধ প্রেমে ফাঁসে, ব্যভিচার করে, সমকামিতায় লিপ্ত হয়। স্ত্রী ছেড়ে পরস্ত্রীতে তৃপ্ত হয়, স্বামী ছেড়ে পর-পুরুষকে রসের নাগর বানায়। আর এ সুখ লুটতে সে মন মান-লজ্জা-ভয়ের মাথা খায়। এ মনের কথাই মিসরের রানী ইউসুফের প্রেমে ধরা খেয়ে যুলাইখা বলেছিল,

( وَمَا أُبْرِيءُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ) [يوسف: ৫৩].

“আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না, মানুষের মন অবশ্যই মন্দকর্ম-প্রবণ, কিন্তু সে নয় যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক অতি ক্ষমালীল, পরম দয়ালু।” (ইউসুফঃ ৫৩)

দুইঃ নাফসে লাওয়ামাহ

‘নাফসে লাওয়ামাহ’ বা তিরস্কারকারী মন। এ মন নিজেকে তিরস্কার করে, ভর্ৎসনা করে। ভালো কাজ করে, আবার খারাপ কাজও করে। কিন্তু খারাপ কাজ করার পর তার বিবেক কামড় দেয়, তাই আক্ষেপ করে। পাপ কাজ ক’রে অনুতপ্ত হয়। অনুভূতি বলে, সে যদি ঐ পাপ না করত!

এ মনের ভিতরে যুদ্ধ চলে, ভালো-মন্দের যুদ্ধ। পাপ-পুণ্যের লড়াই চলে তার নিভৃত কোণে।

এ মন আফসোস করে, যখন কোন ভালো কাজ সে করতে না পারে। ইবাদত কম হলে অথবা কোন সওয়াবের কাজ হাতছাড়া হলে সে আক্ষেপ করে। জামাআত-সহকারে নামায ছুটে গেলে নিজেকে ধিক্কার দেয়। আসরের নামায ছুটে গেলে মনে হয়, যেন তার পরিবার ও ধন-সম্পদ লুট হয়ে গেছে!

কারো প্রতি অন্যায় ক’রে আফসোস করে। পাপ ক’রে তওবা করে। কৃত অপরাধের জন্য লজ্জিত হয়, লাক্ষিত হয়, ভীত-সম্বস্ত হয়।

এ মন ঔদাস্যের শিকার হয়, তন্দ্রা ও নিদ্রা কবলিত হয়, কিন্তু পরক্ষণে সতর্ক ও জাগরিত হয়। ভুল করলে নিজের হিসাব নিজেই নেয়।

হাসান বাসরী বলেছেন, “আল্লাহর কসম! অবশ্যই মু’মিন নিজের মনকে ভর্তসনা করে। বলে, ‘কেন কথা বলতে গেলাম? কেন এটা খেললাম? কেন এটা মনে করলাম?’ আর পাপাচারী অগ্রসর হতেই থাকে, সে তার মনকে ধমক দেয় না।” (তাফসীর ইবনে কাযীর ৪/৫৩৯)

মহান আল্লাহ মহা প্রলয় দিবসের কসম খাওয়ার পর এই ভর্তসনাকারী মনের কসম খেয়েছেন। তিনি বলেছেন,

{ لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ \* وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ } [القيامة : ১ - ২]

“আমি শপথ করছি কিয়ামত দিবসের। আমি শপথ করছি তিরস্কারকারী আত্মার।” (কিয়ামাহ : ১-২)

যাতে নিদ্রাভিভূত মন সজাগ হয়ে উঠে এবং উদাসীন মন সতর্ক হয়।

তিন : নাফসে মুতুমায়িনাহ

যাকে প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা বিচলিত করে না, সন্দেহের বেড়া জাল জড়াতে পারে না। কুমন্ত্রণাদাতা ও প্ররোচকদের নানা কূট প্রশ্ন তার বিশ্বাসের অটল পাহাড় ভাঙতে পারে না।

এ মনের বিরুদ্ধে যখন শয়তানী কুমন্ত্রণা আসে, প্রবৃত্তির চাপ আসে, তখন সে প্রশান্ত থাকে।

এ মন আল্লাহর দেওয়া জীবন, রুযী ও তকদীরে রাযী থাকে, আল্লাহর ভাগ্য-বিচারে সন্তুষ্ট থাকে, আল্লাহর আনুগত্যে ধীরচিহ্ন থাকে। বিপদে-আপদে উদ্বেগহীন ও নিশ্চিত থাকে, যেহেতু সে জানে, মহান আল্লাহ যা করেন, তা বান্দার মঙ্গলের জন্যই করেন।

এ মন কাজে-কর্মে ধীরস্থির থাকে, পরিণামের ব্যাপারে দুশ্চিন্তাহীন থাকে।

এ মন আল্লাহর যিকর ও স্মরণে প্রশান্ত থাকে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ } (২৮)

“যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের হৃদয় প্রশান্ত হয়। জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণেই হৃদয় প্রশান্ত হয়। (রা’দ : ২৮)

দুনিয়ার সব পর হয়ে গেলে, সে নিজ পালনকর্তাকে নিয়ে প্রশান্ত থাকে। তাঁর কাছে প্রত্যাশী হয়ে সে সুখ পায়, শান্তি পায়। তাঁর দেওয়া আঘাতে সে

ধৈর্য ধরে।

নিজ দেহে কষ্ট পেলে ধৈর্য ধরে, কোন অভিযোগ করে না।

আত্মীয়-বিয়োগ ঘটলেও কোন ক্ষোভ প্রকাশ করে না।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে সম্পদ নষ্ট হয়ে গেলেও কোন কুমন্তব্য করে না।

ব্যবসায় বিশাল ক্ষতি হলেও আল্লাহর বিরুদ্ধে সে কোন কথা বলে না।

চাকরি চলে গেলেও সে থাকে নির্বিকার-চিন্তা।

গৃহহীন হলেও তার কোন অভিযোগ থাকে না।

কোনও অনিরাপত্তা বোধ করলে চিন্তাচঞ্চল্যে ভুগে না।

আল্লাহর রহমতের আশা রাখে, সে নিরাশ হয় না, অক্ষম হয়ে বসে পড়ে না। নিরুদ্যম ও নিরুৎসাহ হয় না। রিক্ত হৃদয়ে তিক্ত হয়ে ভগ্নোদ্যম হয় না, হতাশার অন্ধকারে সঠিক পথ হারায় না। সে বলে, ‘ক্বাদারাল্লাহ্ অমা শা-আ ফাআলা।’ অর্থাৎ, আল্লাহর তকদীর, তিনি যা চেয়েছেন, তাই করেছেন।

প্রশান্ত মন সুখের সময় শুক্র করে এবং দুঃখের সময় ধৈর্য ধরে, ফলে সর্বদা সে মঙ্গলে থাকে।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,

(( عَجَبًا لِّأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ : إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ )) .

“মুমিনের ব্যাপারটাই আশ্চর্যজনক। তার প্রতিটি কাজে তার জন্য মঙ্গল রয়েছে। এটা মু’মিন ব্যতীত অন্য কারো জন্য নয়। সুতরাং তার সুখ এলে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ফলে এটা তার জন্য মঙ্গলময় হয়। আর দুঃখ পৌঁছলে সে ধৈর্য ধারণ করে। ফলে এটাও তার জন্য মঙ্গলময় হয়।” (মুসলিম ৭৬৯২নং)

প্রশান্ত মন সর্বদা ভালোর কথা ভাবে, সদ্ভাবে থাকে, সৎ-কাজের চিন্তা করে, সৎকাজের আদেশ দেয়, মন্দ কাজে বাধা দেয়। এ মন সচ্ছরিত্রতার দিকে ধাবিত হয়। এ মনের মানুষ হয় আল্লাহর খাস বান্দা, অনুগত দাস, হুকুমের গোলাম। এ মনের মানুষ আল্লাহতে সন্তুষ্ট এবং আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট। তার জন্য রয়েছে বেহেশতের প্রবেশাধিকার। মহান আল্লাহ বলেছেন,

( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ \* ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً \* فَادْخُلِي فِي

عِبَادِي \* وَادْخُلِي جَنَّاتِي ) الفجر: ২৭ - ৩০

“হে উদ্বেগশূন্য চিন্তা! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে এস সন্তুষ্ট

ও সন্তোষভাজন হয়ে। সুতরাং তুমি আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও। এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।” (ফাজ্র : ২৭-৩০)

অর্থাৎ, তাঁর প্রতিদান, পুরস্কার ও ঐ সুখ-সামগ্রীর নিকট ফিরে এস; যা তিনি নিজ (নেক) বান্দার জন্য জান্নাতে প্রস্তুত রেখেছেন।

কেউ কেউ বলেন, কিয়ামতের দিন এ কথা বলা হবে। আবার কেউ বলেন যে, মৃত্যুর সময় ফিরিশ্বাগণ বান্দাকে এ কথা বলে সুসংবাদ দেন। তা হলেও এই প্রকার কথা কিয়ামতের দিনেও তাদেরকে বলা হবে, যা আয়াতে উল্লেখ হয়েছে।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তিন প্রকার মনের মধ্যে এই প্রকার প্রশান্ত মনই সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সময় বিশেষে একই মানুষ উক্ত তিন প্রকার মনেরই মালিক হতে পারে।

তিন প্রকার মনের উদাহরণ তিন প্রকার মাছির মতো।

এক প্রকার মাছি সর্বদা নোংরাতে বসে, পচা ও দুর্গন্ধময় জিনিস ছাড়া অন্য কিছু তার খাদ্য নয়। এ হল নাফসে আশ্রমার উদাহরণ, যে সর্বদা খারাপ কাজের দিকে ধাবিত হয়।

দ্বিতীয় প্রকার মাছি কখনো নোংরাতে বসে, কখনো পবিত্র জিনিসেও বসে, কখনো পায়খানাতে বসে, কখনো খাবারেও বসে। এ হল নাফসে লাওয়ামাহর উদাহরণ, যে কখনো খারাপ কাজ করে, কখনো ভালো কাজ করে, কখনো গান শোনে কখনো কুরআন শোনে, কখনো যাত্রা করায়, কখনো জলসা করায়। খারাপ কাজে তওবা করে, আবার করে।

আর তৃতীয় প্রকার মাছি, যে সব সময় ফুলে বসে। যার প্রতি মহান আল্লাহ প্রত্যাদেশ করেছেন যে, তুমি গৃহ নির্মাণ কর পাহাড়ে, বৃক্ষে এবং মানুষ যে গৃহ নির্মাণ করে তাতে। এরপর প্রত্যেক ফল হতে আহার কর, অতঃপর তোমার প্রতিপালকের সহজ পথ অনুসরণ কর; ওর উদর হতে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয়; যাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগমুক্তি। (নাহল : ৬৮-৬৯) এ হল নাফসে মুত্মায়িনাহর উদাহরণ।

ফিরিশ্বার জ্ঞান আছে, প্রবৃত্তি নেই। জন্তুর জ্ঞান নেই, প্রবৃত্তি আছে। মানুষের জ্ঞান আছে, প্রবৃত্তিও আছে। সুতরাং যার প্রবৃত্তি সংযত ও জ্ঞান আলোকিত, সে ফিরিশ্বার ন্যায়। পক্ষান্তরে যার জ্ঞান পরাভূত এবং প্রবৃত্তি উচ্ছৃঙ্খল, সে পশুর ন্যায়।

## মন ঠিক হলে সব ঠিক

আমরা জানি, ‘নিয়তের উপর প্রত্যেক কর্ম নির্ভরশীল।’ অর্থাৎ, সে কর্ম মহান আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে কি না, তা নিয়তের উপর নির্ভরশীল। যে কোনও কর্মে মন ঠিক থাকলে, কাজ ঠিক। নচেৎ নিয়তে খারাবি থাকলে, আমলও অগ্রাহ্য হবে।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(( أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ )) متفقٌ عَلَيْهِ

“শোন! দেহের মধ্যে একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে; যখন তা সুস্থ থাকে, তখন গোটা দেহটাই সুস্থ হয়ে থাকে। আর যখন তা খারাপ হয়ে যায়, তখন গোটা দেহটাই খারাপ হয়ে যায়। শোন! তা হল হৃৎপিণ্ড (অন্তর)।” (বুখারী ৫২, ২০৫১, মুসলিম ৪১৭৮-নং)

হৃদয় যখন ঈমান ও আল্লাহর মারিফাতে সঠিক থাকে, সারা দেহ তখন কর্মে সঠিক থাকে বা সঠিকভাবে কর্ম করে। হৃদয় ঈমান ও মহব্বতে পরিপূর্ণ থাকলে সারা দেহ ইবাদতে তৎপর হবে।

অনেক আবেদকেই দেখা যায়, সে ইবাদত করছে, কিন্তু দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখে মনে হয় তার মন বিক্ষিপ্ত। নামাযরত অবস্থায় দেহ চুলকাচ্ছে, রুমাল বা টুপি ঠিক করছে, ঘড়ি দেখছে ইত্যাদি। কারণ তার ভিতরে মন স্থির নেই, তাই বাইরে দেহাঙ্গও অস্থির। হৃদয় চাঞ্চল্যময় থাকলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চঞ্চল থাকে। আর হৃদয়কে যদি শান্ত ও স্থির রাখা যায়, তাহলে বাহিরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও সেই মহান বাদশার জন্য শান্ত ও স্থির থাকবে।

হৃদয় ভালো হলে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভালো কাজ করবে। যেহেতু সকল কাজ হবে সেই রাজার নির্দেশে। তারই ইঙ্গিতে মন্দ ও নোংরা কাজ থেকে বিরত থাকবে। হৃদয়ের বিচ্ছুরিত আলো দ্বারা সকল অঙ্গ হিদায়াতের পথ পাবে, আল্লাহর আনুগত্য করতে উদ্বুদ্ধ হবে।

পক্ষান্তরে বুকের ভিতরে ঐ মাংসপিণ্ড খারাপ হলে দেহের অবশিষ্ট সর্বাঙ্গ খারাপ হবে, খারাপ নির্দেশনা পাবে, খারাপ কাজে উৎসাহিত হবে। মন অন্ধকার হলে সারা দেহ অন্ধকারে হাবুডুবু খাবে। রাজা আলো না পেলে প্রজারা কোথেকে আলো পাবে?

প্রকাশ থাকে যে, রাজার কারণে প্রজা যেমন প্রভাবিত হয়, তেমনি

অনেক সময় প্রজার কারণে রাজাও প্রভাবিত হয়। দেহের দূরত্বের কারণে মনের দূরত্ব বৃদ্ধি পায়। দেহাঙ্গের কর্মের ফলে হৃদয় প্রভাবিত হয়। যেমন মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِّتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكَّةٌ سَوْدَاءُ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ صُقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُو قَلْبَهُ وَهُوَ الرَّأْيُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ)).

“মু’মিন যখন কোন পাপ করে, তখন তার হৃদয়ে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। অতঃপর সে যদি তওবা করে, পাপ থেকে বিরত হয় এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে তার হৃদয় পরিষ্কার হয়ে যায়। আর যদি আরো বেশি পাপ করে, তাহলে সেই দাগ তার হৃদয়কে গ্রাস ক’রে নেয়। এই হল সেই জং, যার কথা আল্লাহ তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন।” (আহমাদ ৭৮৯২, তিরমিযী ৩৩৩৪, সহীহ ইবনে মাজাহ ৩৪২২নং)

মন ঠিক হলে সব ঠিক-----এ কথা থেকে কেউ যেন এ ধারণা না করে যে, মন ঠিক থাকলে খারাপ কাজও ভাল হয়ে যাবে। যেমন অনেক মহিলার এ ধারণাও সঠিক নয় যে, মন ঠিক থাকলে পর্দা করার প্রয়োজন পড়ে না। যেহেতু কোনও মন্দ কাজ বা শরীয়ত-বিরোধী কাজ মন ঠিক রেখে করলে তা ঠিক হয়ে যায় না। পরন্তু ভালো-মন্দ তাই, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে ভালো-মন্দ। আর কোনও মন্দ কাজ ভালো নিয়তে করা যায় না। ভালো কাজে ব্যয় করার নিয়তে ডাকাতি করলে অথবা চাঁদাবাজি বা তোলাবাজি করলে তা ভালো হয়ে যায় না। আসলে সে নিয়তই ভালো নিয়ত নয়, যে নিয়তে কোন অপরাধ বা পাপ করা হয়। পায়খানা ধোয়ার নিয়ত ভালো হলেও পেসাব দিয়ে তা ধোয়া যায় না, পবিত্রতা আসে না। বরং উদ্দেশ্য হল, ভালো কাজটাই ভালো নিয়ত ছাড়া হয় না। ভালো কাজটাই ভালো নিয়ত ছাড়া পন্থ ও বেকার হয়ে যায়। ভালো মন না থাকলে কাজটা পরিপূর্ণতা পায় না। ভালো মন না থাকলে অন্তঃপুর বা বোরকার ভিতরেও মহিলার পর্দা হয় না।

জেনে রাখা দরকার যে, চেহারা হল মনের আয়না। জিভ হল হৃদয়ের মুখপাত্র। তাই তো প্রজারা প্রত্যহ সকালে রাজার মুখপাত্রকে উপদেশ দেয়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(( إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ ، فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تَكْفُرُ اللِّسَانُ ، تَقُولُ : اتَّقِ اللَّهَ فِينَا ، فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ ؛ فَإِنِ اسْتَقَمَّتْ اسْتَقَمَّتْ ، وَإِنِ اعْوَجَجَتْ اعْوَجَجْنَا )) .

“আদম সন্তান যখন সকালে উপনীত হয়, তখন তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জিভকে অত্যন্ত বিনীতভাবে নিবেদন করে যে, ‘তুমি আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। কারণ, আমাদের ব্যাপারসমূহ তোমার সাথেই সম্পৃক্ত। যদি তুমি সোজা সরল থাক, তাহলে আমরাও সোজা-সরল থাকব। আর যদি তুমি বক্রতা অবলম্বন কর, তাহলে আমরাও বেকে বসব।” (তিরমিযী ২৪০৭নং)

তিনি আরো বলেছেন,

((لَا يَسْتَقِيمُ إِيْمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ وَلَا يَدْخُلُ رَجُلٌ الْجَنَّةَ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ)).

“কোন বান্দার ঈমান দুরস্ত হয় না; যতক্ষণ পর্যন্ত না তার হৃদয় দুরস্ত হয় এবং তার হৃদয়ও দুরস্ত হয় না; যতক্ষণ পর্যন্ত না তার জিহ্বা দুরস্ত হয়। আর সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তা না পায়।” (আহমাদ ১৩০৪৮, ত্বাবারানী ১০৪০১নং)

মন সুস্থ হলে সে মন সফল হবে দুনিয়া ও আখেরাতে। কিয়ামতে আপনজন কাজে দেবে না, কাজে দেবে না দুনিয়ার কোন সম্পদ। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ} (৮৮) {إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} (৮৯)

“যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না; সেদিন উপকৃত হবে কেবল সেই; যে আল্লাহর নিকট সুস্থ অন্তঃকরণ নিয়ে উপস্থিত হবে।” (শুআ’রাঃ ৮৮-৮৯)

যে হৃদয় শির্ক ও বিদআতমুক্ত। যে হৃদয়ে নোংরামি নেই, অশ্লীলতা নেই, কোন প্রকারের রোগ-ব্যাধি নেই। যে হৃদয়ে আছে মহান আল্লাহর ভয়-ভরসা ও ভালোবাসা। সেই হৃদয়ের মালিক হবে সংযমী। তারই জন্য জান্নাত নিকটবর্তী করা হবে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَأَرْزَلْتِ الْجَنَّةَ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ} (৩১) {هَذَا مَا توعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ}

{مَنْ حَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ} (৩৩) سورة ق

“জান্নাতকে নিকটস্থ করা হবে সাবধানীদের জন্য; কোন দূরত্ব থাকবে না। এরই প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল; প্রত্যেক আল্লাহ অভিমুখী, (তাঁর হুকুমের) হিফায়তকারীর জন্য। যারা না দেখে পরম দয়াময়কে ভয় করে এবং (আল্লাহ)-অভিমুখী চিন্তে উপস্থিত হয়।” (ক্বাফঃ ৩১-৩৩)



কোন হৃদয়ের মালিক সফল হবে? মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (৭) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا} (১০) سورة الشمس

“সে সফলকাম হবে, যে আত্মকে পরিশুদ্ধ করবে এবং সে ব্যর্থ হবে, যে তাকে কলুষিত করবে। (শামসঃ ৯-১০)

পার্থিব কাজের সাফল্যেও মন ঠিক হলে সব ঠিক। মনটাকে মজবুত করতে পারলে, মনের লক্ষ্য স্থির করতে পারলে অতঃপর তার জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টা জারী রাখলে সফল হওয়া যায়।

আপনি পড়াশোনা করছেন? লক্ষ্য স্থির করুন, আপনি কী হতে চান? তারপর ধীরে ধীরে সেই পথে অগ্রসর হতে থাকুন। ইন শাআল্লাহ আপনি উদ্দেশ্যে সফল হবেন।

আপনি বড় ব্যবসায়ী হতে চান? মনছবি তৈরি করুন। তারপর সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। ইন শাআল্লাহ আপনি অভীষ্ট লাভ করবেন।

আপনি যাই হতে চান, তার জন্য মনকে আগে প্রস্তুত করুন। মনের হীনতা দূর করুন, অবহেলা ও আলস্য বিদূরীত করুন, লক্ষ্যের বদল ঘটাবেন না, একই লক্ষ্যের দিকে ধৈর্যের সাথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হন, দেখবেন এক সময় আপনি সমস্ত বাধা লংঘন ক’রে লক্ষ্যে পৌঁছে গেছেন।

‘এই সংসার সুখের কুটী,  
যার যেমন মন তেমনি ধন,  
মনকে কর পরিপাটি।’

পক্ষান্তরে মনের দিক দিয়ে যে দুর্বল, কর্মক্ষেত্রেও সে দুর্বল। আর পরিণামেও সে অসফল। জ্ঞানিগণ বলেন, ‘পরাজয়কে মেনে নিলে তুমি পরাজিত। মনে যদি তোমার সাহস না থাকে, তবে জেতার আশা করো না। যদি মনে দ্বিধা থাকে তুমি পারবে কি না, তাহলে মনে রেখো তুমি হেরেই গেছ। হারবে ভাবলে, হার তোমার হবেই। কারণ সাফল্য থাকে মনের ইচ্ছা শক্তিতে, মনের কাঠামোতে। যদি ভাব অন্যদের তুলনায় তোমার কাজের মান নিচু তাহলে তুমি নিচেই থাকবে। যদি তুমি ওপরে উঠতে চাও, তাহলে নিজের মনে সংশয় রেখো না। জীবনযুদ্ধে সব সময় বলবান ও দ্রুতগামীরা জেতে না, যে আত্মবিশ্বাসে অটল, সে আজ হোক, কাল হোক, জিতবেই।’

আমাদের সৃষ্টিকর্তা বলেছেন,

{وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي

الشَّاكِرِينَ} (১৬০) سورة آل عمران

“যে কেউ পার্থিব পুরস্কার চাইবে, আমি তাকে তা হতে (কিছু) প্রদান করব এবং যে কেউ পারলৌকিক পুরস্কার চাইবে, আমি তাকে তা হতে প্রদান করব। আর শীঘ্রই আমি কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করব।” (আলে ইমরানঃ ১৪৫)

{مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا (১৮) وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا} (১৯) سورة الإسراء

“কেউ পার্থিব সুখ-সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে যা ইচ্ছা সত্ত্বর দিয়ে থাকি, পরে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি; সেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত ও অনুগ্রহ হতে দূরীকৃত অবস্থায়। যারা বিশ্বাসী হয়ে পরলোক কামনা করে এবং তার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে, তাদেরই চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে।” (বানী ইস্রাঈলঃ ১৮- ১৯)

{وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ} (৩৯) سورة النجم

“আর এই যে, মানুষ তাই পায়, যা সে চেষ্টা করে।” (নাজমঃ ৩৯)

কেবল শক্তি থাকলে হয় না, সাহস লাগে। আবার তার সঙ্গে লাগে অন্তরের আন্তরিকতা, সবল মনের মানসিকতা। নচেৎ কোন মহৎ কাজই পরিপূর্ণতা লাভ করে না। সে ক্ষেত্রে মানুষের জাতী-ধর্ম-বর্ণ কোনটাই বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। বড় মন মানুষকে বড় হতে উৎসাহিত করে।

একজন লেখক লিখেছেন, ‘এক বেলুন-ওয়ালা বেলুন বিক্রি করতে গিয়ে শিশুদেরকে আকর্ষণ করার জন্য একটি বেলুনে গ্যাস ভরে আকাশে উড়িয়ে দিল। ভাগ্যক্রমে বেলুনটির রঙ ছিল কালো। একটি ছেলে বলল, আপনার কালো বেলুনই কি আকাশে ওড়ে? বেলুন-ওয়ালা বলল, না। কোন রঙ বেলুনকে আকাশে উড়ায় না। আসলে গ্যাসই যে কোন রঙের বেলুনকে আকাশে উড়াতে পারে। মানুষের জাত-বর্ণ যাই হোক না কেন, তার মানসিকতাই তাকে উপরে উঠতে সাহায্য করে।’

তবে হ্যাঁ, আমরা মুসলিমরা জানি, সেই মন যদি মহান স্রষ্টার সাথে যুক্ত থাকে, তাহলে তা মুসলিমকে আরো উপরে উঠতে অনুপ্রাণিত করে। যেহেতু তাঁর শক্তিতেই মানুষ শক্তি পায়। ‘লা হাউলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।’

মন না দিলে দেখা যায় না। চোখের সামনে দিয়ে কেউ পার হয়ে গেলে

এবং খেয়াল ক’রে না দেখলে, সেউ ব্যক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলে বলে, ‘কৈ দেখিনি তো।’ মন না দিলে শোনাও যায় না। আনমনা হলে কোন কিছু স্মৃতিস্থ হয় না। সেভ করার বটন না টিপলে যেমন কমপিউটারের ওয়ার্ড ফাইলের লেখা সেভ হয় না, তেমনি মন দিয়ে কোন কিছু ধারণ বা গ্রহণ না করলে তা মনে থাকে না। কত ওয়ায-উপদেশ শোনে, কাজ হয় না। শব্দ শোনে, কিন্তু মন না দেওয়ার কারণে আমল হয় না। কত কুরআন পড়ে, কিন্তু মন দিয়ে না পড়ার কারণে কোন উপকারে আসে না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ} (৩৭)

“এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য, যার আছে হৃদয় অথবা যে উপস্থিত থেকে নিবিষ্ট-চিত্তে শ্রবণ করে।” (ক্বাফ : ৩৭)

উড়তে গেলে দুটো ডানা লাগে, মনের ডানা না হলে কেবল দেহের ডানা দিয়ে উড়া যায় না।

লেখাপড়ার কাজেও মন চাই। মন না দিলে মস্তিষ্কে পড়াশোনা স্থান পায় না। মনের বটন না টিপলে পাঠ স্মৃতিস্থ হয় না। মুখে বারবার আওড়ালেও তা মুখস্থ হয় না। এই জন্যই বলে, ‘কলম-কালি-মন, লেখে তিন জন।’

‘বই পড়ে কিন্তু যে নাহি দেয় মন,

কেমনে সেজন বল, পারে জ্ঞান-ধন?

প্রদীপে না দিয়ে তেল বাতি যদি জ্বালো,

কখনো কি সে প্রদীপ দিয়ে থাকে আলো?’

যে প্রয়োজন আমাদের থাকে, তা যদি আন্তরিকতার সাথে চাওয়া না হয়, তাহলে কি তা পাওয়া যায়? আমরা অভ্যাসগতভাবে যা চাই অথবা আরবী ভাষায় অর্থ না জেনে যা চাই, তা কি আমরা পেতে পারি? আমরা কী চাই, তা আমরা নিজেই জানি না। তাহলে আমরা কী পাওয়ার আশা করতে পারি? মহান আল্লাহ অন্তর্যামী, কিন্তু আমাদের অন্তরে কোন চাহিদা না থাকলে অথবা মুখের সাথে অন্তরের সংযোগ না থাকলে অন্তর্যামী কী দান করবেন আমাদেরকে?

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((ادْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ ، وَعَلِّمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مَنْ

قَلْبٌ غَافِلٌ لَّاهٍ)).

“তোমরা আল্লাহর নিকট দুআ কর কবুল হবে এই দৃঢ় প্রত্যয় রেখে। আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ উদাসীন ও অন্যমনস্কের হৃদয় থেকে দুআ

মঞ্জুর করেন না।” (তিরমিযী ৩৪৭৯, হাকেম ১৮ ১৭, সহীহুল জামে’ ২৪৫নং)

তদনুরূপ যে কোন ইবাদত; একাগ্রতা ও আন্তরিকতার সাথে না করলে তা কবুল হয় না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ}

“হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা নেশার অবস্থায় নামাযের নিকটবর্তী হয়ে না, যতক্ষণ না তোমরা কী বলছ, তা বুঝতে পার।” (নিসাঃ ৪৩)

নামাযের মতো বড় ইবাদত; তাতে কী বললাম, তাই জানলাম না, অঙ্গুষ্ঠার নেশায় থেকে বুঝলাম না নামাযে কী বললাম, তাহলে সে নামাযের নিকটবর্তী হয়ে লাভ আছে কি?

কোন নামায আমাদের কাজে দেয়? যে নামাযে বাহ্যিক অঙ্গ হিলনের সাথে আভ্যন্তরিক অন্তরের সংযোগ থাকে। যে নামায আমরা মন দিয়ে পড়ি। যে নামাযে আমরা যা বলি, তা জানি ও বুঝি। যে নামাযে আমরা আমাদের মহান প্রভুর সাথে নিরালায় আলাপ করি।

((إِنَّ الْمُصَلِّيَّ يُنَاجِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ بَمَا يُنَاجِي رَبَّهُ)).

“অবশ্যই নামাযী তার প্রতিপালকের সাথে নিরালায় আলাপ করে। সুতরাং কি নিয়ে আলাপ করছে, তা যেন সে লক্ষ্য করে।” (আহমাদ ৫৩৪৯, ত্বাবারানী ১৩৩৯৬, সহীহুল জামে’ ১৯৫ ১নং)

কারো সাথে নিরালায় আলাপ কি কেবল ঠোট হিলিয়ে হয়? যে কথা বলি, তা নিজে বুঝি না, সঙ্গীকেও বুঝাতে পারি না, তাহলে সে আলাপে কি আন্তরিকতা ও তৃপ্তি থাকে? সে আলাপে কি উদ্দেশ্য সফল হয়? কক্ষনই না।

কোন নামায আমাদের পাপনাশ করে? কোন নামাযের নদীতে গোসল ক’রে আমরা আমাদের গোনাহ ধুয়ে ফেলতে পারি? মহানবী ﷺ বলেছেন,

« مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ لَا يَسْهُو فِيهِمَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ »

ذُنْبِهِ ».

“যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে ওযু করে, কোন ভুল না করে (একাগ্রচিত্তে) দুই রাকআত নামায পড়ে, সেই ব্যক্তির পূর্বকার সমুদয় গোনাহ মাফ হয়ে যায়।” (আবু দাউদ ৯০৫, সহীহ তারগীব ২২ ১নং)

কোন নামায আমাদেরকে দোযখ থেকে মুক্তি দেবে? কোন নামায আমাদেরকে বেহেশতে নিয়ে যাবে? আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

« مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا »

بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ».

“যে কোন ব্যক্তি যখনই সুন্দরভাবে ওয়ু করে সবিনয়ে একাগ্রতার সাথে (কায়মনোবাক্যে) দুই রাকআত নামায পড়ে, তখনই তার জন্য জাহ্নাত অবধার্য হয়ে যায়।” (মুসলিম ৫৭৬, আবু দাউদ ১৬৯নং)

এবারে বলুন, আমরা যে নামায পড়ি, তাতে কি আমাদের মনোযোগ থাকে? আমরা নামাযে যে সকল বাক্য প্রয়োগ করি, তাতে আমাদের একাগ্রতা ও আন্তরিকতা থাকে? নামাযের কর্মাবলীতে আমাদের অন্তর কি উপস্থিত থাকে? নাকি আমাদের দেহ থাকে নামাযে এবং আমাদের মন থাকে অন্য কোথাও? এ কি সেই নামায, যা আমাদের কাছে চাওয়া হয়েছে? আমাদের এ নামায পড়া হয় বটে, কিন্তু তা কায়েম হয় কি?

এইভাবে আপনি অন্যান্য ইবাদতের কথা ভেবে দেখুন, তাতে আমাদের অন্তরের খবর কী?

আমরা যখন কুরআন পড়ি বা শুনি, তখন কি তার সাথে মনের যোগ থাকে? যদি না থাকে, তাহলে তার মাধ্যমে আমরা করুণাময়ের করুণা লাভ করব কীভাবে? যদি তা মন দিয়ে না শুনি ও অনুধাবন করি, তাহলে তার মাধ্যমে উপদেশ লাভ হবে কীভাবে? মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (২০: ১)

“যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ কর এবং নিশ্চুপ হয়ে থাক; যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়।” (আ’রাফঃ ২০৪)

দ্বীন বা দুনিয়ার যে কোন কাজে মনোযোগ চাই। একই সময়ে দুটি বিষয়ে চিন্তা করা অথবা একই সময়ে দুটি কাজে মনোযোগ দেওয়া সম্ভব নয়। যেহেতু---

{مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ} (৪) سورة الأحزاب

“আল্লাহ কোন মানুষের অভ্যন্তরে দু’টি হৃদয় সৃষ্টি করেননি।”

(আহযাবঃ ৪)

তাহলে এটা সম্ভব নয় যে, আপনি অংক কষবেন এবং একই সাথে প্রেমিকার জন্য কবিতাও লিখবেন। নামায কায়েম করবেন এবং একই সময় বৈষয়িক কোন বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা বা পরিকল্পনাও করবেন। খোশ গল্প করবেন এবং সেই সাথে তসবীহর মালাও গুনবেন।

মানুষের অন্তরের আন্তরিকতা আছে বলেই সে মানুষ। পশুর অন্তর আছে, কিন্তু তাতে বোধশক্তি নেই, বোধশক্তি নেই, তাই সে পশু। মহান স্রষ্টা বলেছেন,

{وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ} (سورة الأعراف (۱۷۹))

“আমি তো বহু জ্বিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি; তাদের হৃদয় আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চক্ষু আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা দর্শন করে না এবং তাদের কর্ণ আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা শ্রবণ করে না। এরা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়; বরং তা অপেক্ষাও অধিক বিভ্রান্ত! তারা ই হল উদাসীনা।” (আ’রাফঃ ১৭৯)

মানুষ অন্তর দ্বারা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। তার অন্তরের বিবেক বড় অমূল্য জিনিস। অনেক সময় মানুষ হঠকারিতা করে, কিন্তু তার মন ও বিবেক বলে, তার বিরোধীই হল হকপন্থী। অনেক সময় সে কোন ও প্রভাব খাটিয়ে কোন জিনিস আত্মসাৎ করে, কিন্তু তার মন বলে, সে তার হকদার নয়। অনেক সময় মুফতীর কাছে ফতোয়া নিয়ে কোন কাজ করে, কিন্তু তার মন-মুফতী বলে, কাজটা ঠিক হচ্ছে না। যেখানে শরীয়তের স্পষ্ট প্রমাণ আছে, সেখানে মানুষ তার বিপরীত নিজ মনোমতো চললে মনপূজা হয়। কিন্তু যেখানে স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ কোন প্রমাণ নেই, সেখানে মানুষ মুফতীদের ফতোয়া গ্রহণ করে ফায়সালা নেয়। কিন্তু মুফতীরা ভুল ফতোয়া দিয়ে কোন কাজ করার অনুমতি দিলে তার মন বলে, তা না করাই উচিত এবং কোন কাজ করতে নিষেধ করলে তার মন বলে, তা করাই উচিত।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(( اسْتَفْتِ قَلْبَكَ ، الْبُرُّ : مَا اطْمَأْنَنْتَ إِلَيْهِ النَّفْسُ ، وَاطْمَأْنَانَ إِلَيْهِ الْقَلْبُ ،

وَالْإِثْمُ : مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ ، وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ )) .

“তুমি তোমার অন্তরকে (ফতোয়া) জিজ্ঞাসা কর। পুণ্য হল তা, যার প্রতি তোমার মন প্রশান্ত হয় এবং অন্তর পরিতৃপ্ত হয়। আর পাপ হল তা, যা মনে খটকা সৃষ্টি করে এবং অন্তর সন্দিহান হয় ; যদিও লোকেরা তোমাকে (তার বৈধ হওয়ার) ফতোয়া দিয়ে থাকে।” (আহমাদ ১৮০০১, ১৮০০৬, দারেমী ২৫৩৩নং)

তিনি আরো বলেছেন,

((استفتِ نفسك وإن أفتاك المفتون)).

“তুমি তোমার মনের কাছে ফতোয়া নাও, যদিও মুফতীরা তোমাকে ফতোয়া দিয়েছে।” (তারীখুল কাবীর বুখারী, আহমাদ ১৮০০১, দারেমী ২৫৩৩,

সহীহুল জামে' ৯৪৮ নং)

তিনি আরো বলেছেন,

((إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعُهُ))

“যখন তোমার মনে কিছু খটকা সৃষ্টি করবে, তা বর্জন কর।” (আহমাদ ২২ ১৬৬, ইবনে হিব্বান ১৭৬, হাকেম ৩৩নং)

হ্যাঁ, আপনার মনই বলে দেবে, পাপ কী, পুণ্য কী? যেমন আপনার মনই গড়ে দেবে সঠিক সুখের বাসা। আসলে ধন হলেই সুখ হয় না, মনের সুখ আসল। নারী-গাড়ি-বাড়ির সুখ থাকলেও মন যদি অসুখে ভোগে, তাহলে ফুলের বাগানে সংকীর্ণ জুতো পরে বিলাস-বিহারের মতোই হবে।

আসলেই ধনের ধনী ধনী নয়, মনের ধনীই ধনী। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إِنَّمَا الْغِنَى غِنَى الْقَلْبِ وَالْفَقْرُ فَقْرُ الْقَلْبِ))

“প্রকৃত ধনবত্তা হল অন্তরের ধনবত্তা। আর প্রকৃত দরিদ্রতা হল অন্তরে দরিদ্রতা।” (নাসাঈ, ইবনে হিব্বান ৬৮৫, হাকেম ৭৯২৯, সঃ তারগীব ৮২৭নং)

((الْغِنَى فِي الْقَلْبِ ، وَالْفَقْرُ فِي الْقَلْبِ ، مَنْ كَانَ الْغِنَى فِي قَلْبِهِ لَا يَضُرُّهُ ، مَا لَقِيَ مِنَ الدُّنْيَا ، وَمَنْ كَانَ الْفَقْرُ فِي قَلْبِهِ ، فَلَا يُغْنِيهِ مَا أَكْثَرَ لَهُ فِي الدُّنْيَا ، وَإِنَّمَا يَضُرُّ نَفْسَهُ شُحُّهَا))

“প্রকৃত ধনবত্তা হল হৃদয়ের ধনবত্তা এবং প্রকৃত দরিদ্রতা হল হৃদয়ের দরিদ্রতা। যার হৃদয়ে ধনবত্তা থাকে, দুনিয়ার কোন বঞ্চনা তার ক্ষতি করতে পারে না। আর যার হৃদয়ে দরিদ্রতা থাকে, দুনিয়ার ধনাধিক্য তাকে অভাবমুক্ত করতে পারে না। আসলে হৃদয়ের কার্পণ্যই তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।” (নাসাঈ, ত্বাবারানী ১৬১৯, ইবনে হিব্বান ৬৮৫, সহীহুল জামে' ৭৮-১৬নং)

((لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ)) . متفقٌ عَلَيْهِ

“বিষয় সম্পদের আধিক্য ধনবত্তা নয়, প্রকৃত ধনবত্তা হল অন্তরের ধনবত্তা।” (বুখারী ৬৪৪৬, মুসলিম ২৪৬৭নং)

ইমাম শাফেয়ী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

ولا حزن يدوم ولا سرور ..... ولا يؤس عليك ولا رخاء

إذا ما كنت ذا قلب قنوع ..... فأنت ومالك الدنيا سواء

অর্থাৎ, দুঃখ চিরদিন থাকে না, সুখও নয়। অভাব তোমার চিরসাথী নয়, সচ্ছলতাও নয়।

যদি তুমি অল্পে সন্তুষ্ট হৃদয়-ওয়ালা না হও, তাহলে তুমি ও দুনিয়ার

রাজা এক সমান।

ধনের মানুষ মানুষ নয়, মনের মানুষ আসল মানুষ। বহু মানুষ আছে, যারা বন্ধু খোঁজে, জীবন-সঙ্গী খোঁজে ধন দেখে, কিন্তু তারা ধন পায়, মন পায় না। তারা আসলে সঙ্গী পায়, কিন্তু মানুষ পায় না। তারা জানে না যে, অল্পে তুষ্ট হৃদয় দরিয়া থেকেও বিশাল, ধনীর থেকেও বড় ধনী। দিল দরিয়া হলে বর্ষার মতো সুখের জোয়ার আসে। সেই সুখ উপচে পড়ে আশেপাশের বহু জায়গাতে। উপকৃত হয় বহু মানুষ, বহু প্রাণী।

মানুষের সবচেয়ে বড় ধন ঈমান, তারও আসল স্থান হৃদয়ে। তাক্বওয়ার বাসস্থান হল মনের মণিকোঠা। দ্বীনদারির আসল জায়গা হল অন্তরের অন্তঃস্থল। তাছাড়া মুখে স্বীকার ও অঙ্গের আমল কোন কাজ দেয় না। অন্তরে তা না থাকলে মুনাফিকের আমল হয়। অন্তর দিয়ে কাজ না করলে ‘রিয়া’ বা লোকপ্রদর্শন হয়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَظْلِمُهُ ، وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ ، التَّقْوَى هَاهُنَا التَّقْوَى هَاهُنَا )) وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ.

“এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার প্রতি যুলুম করবে না, তাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবে না এবং তাকে তুচ্ছ ভাববে না। আল্লাহভীতি এখানে রয়েছে। আল্লাহভীতি এখানে রয়েছে।” (এই সাথে তিনি নিজ বুকের দিকে ইঙ্গিত করলেন।) (মুসলিম ৬৭০৬নং)

মনে তাক্বওয়া স্থান না পেলে, কোন মানুষ মানুষকে সম্মান দিতে পারে না, তার প্রতি অন্যায়চরণ থেকে বিরত হতে পারে না।

এমন বহু জিনিস আছে, যা মহান আল্লাহর প্রতীক, তাঁর এক একটা নিদর্শন, সেগুলির প্রতি কেবল সেই সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারে, যার হৃদয়ে আছে তাক্বওয়া। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ } (سورة الحج ৩২)

“এটাই (আল্লাহর) বিধান। আর কেউ আল্লাহর (দ্বীনের) প্রতীকসমূহের সম্মান করলে এটা তো তার হৃদয়ের সংযমশীলতারই বহিঃপ্রকাশ।” (হাঙ্কঃ ৩২)

কুরআন, মসজিদ, ক্বিবলা, আলেম, বয়স্ক ইত্যাদিকে সম্মান দেওয়া সেই হৃদয়স্থ তাক্বওয়ারই পরিচয়।

মানুষের রঙ, বর্ণ, দেশ, ভাষা যাই হোক না কেন, মানুষ ‘মানুষ’ হয় মনের তাক্বওয়ার মহিমায়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(( إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ ، وَلَا إِلَى صَوَرِكُمْ ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ ))



وَأَعْمَالُكُمْ)).

“নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের দেহ এবং তোমাদের আকৃতি দেখেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমল দেখেন।” (মুসলিম ৬৭০৭-৬৭০৮-নং)

আর মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (১৩) سورة الحجرات

“হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক আল্লাহ-ভীরু। আল্লাহ সবকিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন।” (হুজুরাতঃ ১৩)

মহান আল্লাহ তাক্বওয়ার নিজিতে মর্যাদাবান মানুষ নির্ধারিত করেন। শরীয়তের নানা বিধি-বিধান দিয়ে মানুষের মন ও তাক্বওয়া পরীক্ষা করেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে আদব বজায় রাখার মাধ্যমে অনেক মানুষকে মনের তাক্বওয়ার পরীক্ষা দিতে হয়েছে। তিনি বলেছেন,

{إِنَّ الَّذِينَ يَغْضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ} (৩) سورة الحجرات

“যারা আল্লাহর রসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে আল্লাহ-ভীরুতার জন্য পরীক্ষা করেছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।” (হুজুরাতঃ ৩)

কুরবানীর বিধান দিয়ে তিনি মুসলিমদের অন্তরের তাক্বওয়া পরীক্ষা করেন। তিনি বলেছেন,

{لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤَهَا وَلَكِنَّ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ}

অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে কখনোও ওগুলির মাংস পৌঁছে না এবং রক্তও না; বরং তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের তাক্বওয়া (সংযমশীলতা)। (হাঙ্ক ৩৭)

মনের তাক্বওয়ার ভিত্তিতেই মহান আল্লাহ কুরবানী কবুল ক’রে থাকেন। তিনি বলেছেন,

{وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ}

مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} (২৭) سورة المائدة

“আদমের দুই পুত্রের (হাবিল ও কাবিলের) বৃত্তান্ত তুমি তাদেরকে যথাযথভাবে শুনিবে দাও, যখন তারা উভয়ে কুরবানী করেছিল, তখন একজনের কুরবানী কবুল হল এবং অন্য জনের কুরবানী কবুল হল না। তাদের একজন বলল, আমি তোমাকে অবশ্যই হত্যা করব। অপরজন বলল, আল্লাহ তো সংযমীদের কুরবানীই কবুল করে থাকেন।” (মায়িদাহঃ ২৭)

তবে হৃদয়ে তাক্বওয়া থাকলে তার বহিঃপ্রকাশ হয় আমলে। যেহেতু মহান আল্লাহ অন্তর দেখার সাথে আমলও দেখেন। কেবল অন্তর ঠিক রাখাই যথেষ্ট নয়। অন্তরে ঈমান ও তাক্বওয়ার বীজ রোপিত হলে তা অঙ্কুরিত হয় এবং মু’মিন ও মুত্তাক্বীর দেহাঙ্গ, লেবাস ও আচরণের ভূমিতে বৃক্ষরূপে প্রকাশ লাভ ক’রে ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ}

نُصِرَفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُشْكُرُونَ} (সূরা الأعراف (৫৮))

“উৎকৃষ্ট ভূমি তার প্রতিপালকের নির্দেশে ফসল উৎপন্ন করে এবং যা নিকৃষ্ট তাতে কঠিন পরিশ্রম ব্যতীত কিছুই জন্মায় না। এভাবে কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য আমি নিদর্শনসমূহ বিভিন্নভাবে বিবৃত ক’রে থাকি।” (আ’রাফঃ ৫৮)

নিশ্চয় মন হল বিশ্বাস ও আমলের মূল ক্ষেত্র। মন বিচার করেই আমল নির্ধারণ হয়, তা ঠিক, নাকি ভুল? তা গ্রহণযোগ্য, নাকি প্রত্যাখ্যানযোগ্য? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِأَمْرِي مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ)).

“যাবতীয় কার্য নিয়ত বা সংকল্পের উপর নির্ভরশীল। আর মানুষের জন্য তাই প্রাপ্য হবে, যার সে নিয়ত করবে। অতএব যে ব্যক্তির হিজরত (স্বদেশত্যাগ) আল্লাহর (সন্তোষ লাভের) উদ্দেশ্যে ও তাঁর রসূলের জন্য হবে; তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্যই হবে। আর যে ব্যক্তির হিজরত পার্থিব সম্পদ অর্জন কিংবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যেই হবে, তার হিজরত যে সংকল্প নিয়ে করবে তারই জন্য হবে।” (বুখারী ১নং, মুসলিম ১৯০৭নং)

কর্মমান-নির্ণয়ে শরীয়তের নানা বিধান আছে। মানুষের মন, উদ্দেশ্য ও

সংকল্প হিসাবে তার কর্মের মান নির্ধারণ হয়ে থাকে। ধরুন আপনাদের কবরস্থান থেকে মসজিদ পর্যন্ত যাতায়াত একটি কর্ম, শরীয়তে এর মান কী?

দেখলেন, আকবর ভাই ফজরের পর মসজিদ থেকে কবরস্থান পর্যন্ত বারবার যাওয়া-আসা করছে।

কবীর ভাইকেও দেখলেন একই কাজ করতে।

আসগর ভাইও একদিন একইভাবে যাতায়াত করছে।

সাগীর ভাইকেও দেখলেন অনুরূপ আসা-যাওয়া করতে।

আফযল ভাইকে দেখলেন একই আচরণ করছে।

একদিন ফযল ভাইকেও তাই করতে দেখলেন।

দৃশ্যতঃ প্রত্যেকের কাজ এক, কিন্তু বাস্তবে প্রত্যেকের কাজের মান এক কি? মোটেই না।

তাদের মন ও নিয়ত তথা কার্যকারণ বিচার-বিশ্লেষণ করলে বুঝতে পারবেন, কার কাজের কী মান?

চলুন, আকবার ভাইকে জিজ্ঞাসা করুন, কেন সে এ কাজ করছে?

সে বলল, ভাইজান! আজ পাঁচ-সাত বছর বিয়ে করা হল, ছেলে হল না। এক ছ্যুর বললেন, ‘তোমাদের মসজিদ থেকে কবরস্থান পর্যন্ত প্রত্যেক দিন ৩ বার যাওয়া-আসা করবে, তাহলে তোমার সন্তান হবে।’ তাই আমি এইভাবে যাতায়াত করছি।

কবীর ভাইকে জিজ্ঞাসা করুন, কোন্ উদ্দেশ্যে সে এ কাজ করছে?

উত্তরে সে বলল, এক বুয়ুর্গ আমাকে বললেন, ‘তোমাদের মসজিদ থেকে কবরস্থান পর্যন্ত প্রত্যেক দিন ৭ বার যাওয়া-আসা করবে, তাহলে সাফা-মারওয়া সাঈ করার সমান তোমার সওয়াব হবে।’ তাই সওয়াবের আশায় আমি এইভাবে যাতায়াত করছি।

আসগর ভাইকে জিজ্ঞাসা করুন, কোন্ নিয়তে সে এ কাজ করছে?

উত্তরে সে বলল, ‘ফজরের নামায পড়তে এসে পকেট থেকে ঘড়িটা পড়ে গেছে। তাই বারবার যাওয়া-আসা ক’রে খুঁজে দেখছি।’

সাগীর ভাইকে যাতায়াতের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে সে বলল, ‘শরীরে কেমন জড়তা অনুভব করছি। ডাক্তারে একটু ‘মর্নিং ওয়াক’ করতে বলেছেন, তাই ফজরের নামাযের পর একটু হাঁটাহাঁটি করছি।’

আফযল ভাইকে তার যাতায়াতের কারণ জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে সে বলল, ‘গত রাতে আমার পাহারা দেওয়ার ডিউটি ছিল। তাই যাওয়া-আসা ক’রে ডিউটি পালন করছিলাম।’

ফযল ভাই ফাযিল মানুষ। তাকে জিজ্ঞাসা ক’রে জানা গেল, সে তার প্রেমিকার সাক্ষাতের জন্য উদ্বিগ্ন ছিল। তাই সে যাতায়াত ক’রে তার দর্শন লাভ করার চেষ্টা করছিল, যাতে লোকে সন্দেহ না করে।

এবার বলুন, কার কাজকে আপনি কী বলবেন? সকলের কাজের মান কি অভিন্ন? নিশ্চয় না। তাদের মন ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী :-

আকবর ভাইয়ের কাজ ‘শির্কে আকবর’। কারণ, যে আচরণ বন্ধ্যত্ব দূরীকরণের চিকিৎসা নয়, অন্ধের মতো তাকেই সে অব্যর্থ চিকিৎসা মনে করেছে এবং মহান আল্লাহকে ছেড়ে অমূলক এক ধারণার উপর আস্থা রেখেছে। আর তা শির্ক।

কাবীর ভাইয়ের কাজকে নিশ্চয় ‘বিদআত’ বলবেন। কারণ, সে একটা কাজের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সওয়াবের আশা করেছে, যার কোন দলীল শরীয়তে নেই।

আসগর ভাইয়ের কাজকে নিশ্চয় ‘মুবাহ’ বলবেন। তার হারিয়ে যাওয়া জিনিস খোঁজা তার জন্য বৈধ।

সাগীর ভাইয়ের কাজকে নিশ্চয় ‘মুস্তাহাব’ বলবেন। কারণ, তার যাতায়াত শরীরের পক্ষে উপকারী।

আফযল ভাইয়ের কাজ ডিউটি, তাই তা ‘ওয়াজেব’।

আর ফাযিলের কাজ ‘হারাম’।

কে করল এই পার্থক্য? মানুষের মন। এ বড় আজব যন্ত্র।

এই যন্ত্রই একই কাজকে ফরয, সুন্নত, নফলের মান দেয়। মনই পার্থক্য করে কোনটা ফরয আদায় করলেন, কোনটা সুন্নত বা কোনটা নফল।

অন্তর্যামী মহান আল্লাহ মনের খবর জানেন। করুণাময় আল্লাহ মানুষের মন অনুযায়ী পাপ-পুণ্য লিপিবদ্ধ করেন। পাপ-পুণ্যের নিয়ত হওয়ার সময় দুইভাবে লিখে থাকেন। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(( إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عِنْدَهُ حَسَنَةٌ كَامِلَةٌ ، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِئَةٍ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ ، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ تَعَالَى عِنْدَهُ حَسَنَةٌ كَامِلَةٌ ، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً )) .

“নিশ্চয় আল্লাহ পুণ্যসমূহ ও পাপসমূহ লিখে দিয়েছেন। অতঃপর তিনি তার ব্যাখ্যাও করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি কোন নেকী করার সংকল্প করে; কিন্তু সে তা কর্মে বাস্তবায়িত করতে পারে না, আল্লাহ তাবারাকা অত্যালা তার জন্য (কেবল নিয়ত করার বিনিময়ে) একটি পূর্ণ নেকী লিখে দেন।

আর সে যদি সংকল্প করার পর কাজটি করে ফেলে, তাহলে আল্লাহ তার বিনিময়ে দশ থেকে সাতশ গুণ, বরং তার চেয়েও অনেক গুণ নেকী লিখে দেন। পক্ষান্তরে যদি সে একটি পাপ করার সংকল্প করে; কিন্তু সে তা কর্মে বাস্তবায়িত না করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাঁর নিকট একটি পূর্ণ নেকী হিসাবে লিখে দেন। আর সে যদি সংকল্প করার পর ঐ পাপ কাজ করে ফেলে, তাহলে আল্লাহ মাত্র একটি পাপ লিপিবদ্ধ করেন।” (বুখারী ৭৫০১, মুসলিম ১২৮নং)

((يَقُولُ اللَّهُ إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا فَإِنْ عَمِلَهَا فَكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلَهَا فَكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا فَكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ امْتِلَائِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ)).

“আল্লাহ (পাপ-পুণ্য লেখক ফিরিশ্তাকে) বলেন, ‘আমার বান্দা যখন কোন পাপ করার ইচ্ছা করে, তখন তা কাজে পরিণত না করা পর্যন্ত তার আমলনামায় পাপ লিপিবদ্ধ করো না। অতঃপর যদি তা কাজে পরিণত করে, তাহলে অনুরূপ (১টি) পাপ লিপিবদ্ধ কর। আর যদি তা আমার কারণে ত্যাগ করে (কাজে পরিণত না করে), তাহলে তার জন্য ১টি নেকী লিপিবদ্ধ কর। পক্ষান্তরে যখন সে কোন নেকীর কাজ করার ইচ্ছা করে এবং তা কাজে পরিণত না করতে পারে, তাহলে তার জন্য ১টি নেকী লিপিবদ্ধ কর। আর যদি তা কাজে পরিণত করে ফেলে, তাহলে তার জন্য ১০ থেকে ৭০০ গুণ নেকী লিপিবদ্ধ কর।” (বুখারী ৭৫০১নং)

স্বভাবতই প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে এ হাদীসের ব্যাখ্যা কী? মহানবী ﷺ বলেছেন,

(( إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيِّئَتَيْهِمَا فَاَلْقَا تِلْ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ )) قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ ؟ قَالَ : ((إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ)).

“যখন দু’জন মুসলমান তরবারি নিয়ে আপোসে লড়াই করে, তখন হত্যাকারী ও নিহত দু’জনই দোযখে যাবো।” আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! হত্যাকারীর দোযখে যাওয়া তো স্পষ্ট; কিন্তু নিহত ব্যক্তির ব্যাপার কী? তিনি বললেন, “সেও তার সঙ্গীকে হত্যা করার জন্য লালায়িত ছিল।” (বুখারী ৬৮-৭৫, মুসলিম ৭৪৩৪নং)

হ্যাঁ, কেবল মন্দ নিয়তের জন্যই সে দোযখে যাবে না, বরং তার মনের বাইরেও সে বাহ্যিক অঙ্গ দ্বারা তার বিপক্ষকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল।

শক্তিতে পেরে ওঠেনি বলেই সে পারেনি, পারলে সেও তার সঙ্গীকে হত্যা করত। তাই সে সাজাপ্রাপ্ত হবে।

মহান আল্লাহ করুণাময় ন্যায়পরায়ণ বাদশা। তিনি সৎলোককে প্রতিদান দেবেন পরকালে। কোন কোন সৎকার্যের বিনিময় কোন কোন লোককে ইহকালেও দিয়ে থাকেন। ব্যাপক আযাবের সময় সৎলোককে রক্ষা ক’রে থাকেন। কিন্তু তা না করলে পরকালে তাকে বিনিময় দান করেন। দুনিয়াতে আযাব দিলে আখেরাতে আর আযাব দেন না। এই জন্য নবী ﷺ বলেছেন, « أُمَّتِي هَذِهِ أُمَّةٌ مَّرْحُومَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُهَا فِي الدُّنْيَا الْفِتْنُ وَالزَّلَازِلُ وَالْقَتْلُ ».

“আমার এই উম্মত করুণাপ্রাপ্ত। আখেরাতে তার আযাব নেই। দুনিয়াতে তার আযাব ফিতনা, ভূমিকম্প ও হত্যা।” (আহমাদ ১৯৬৭৮, আবু দাউদ ৪২৮০, হাকেম ৭৬৪৯, সিঃ সহীহাহ ৯৫৯নং)

আম আযাবে ধ্বংসকৃতদের সাথে ধ্বংস হলেও নিজ নিয়ত ও আমল অনুযায়ী কিয়ামতে পুনরুত্থিত হবে। উম্মুল মু’মেনীন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “একটি বাহিনী কা’বা ঘরের উপর আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে বের হবে। অতঃপর যখন তারা সমতল মরুপ্রান্তরে (বাইদা) পৌঁছবে, তখন তাদের প্রথম ও শেষ ব্যক্তি সকলকেই যমীনে ধসিয়ে দেওয়া হবে। তিনি (আয়েশা) বলেন যে, আমি (এ কথা শুনে) বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! কেমন করে তাদের প্রথম ও শেষ সকলকে ধসিয়ে দেওয়া হবে? অথচ তাদের মধ্যে তাদের বাজারের ব্যবসায়ী এবং এমন লোক থাকবে, যারা তাদের (আক্রমণকারীদের) অন্তর্ভুক্ত নয়।’ তিনি বললেন,

((يُخَسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ)).

“তাদের প্রথম ও শেষ সকলকে ধসিয়ে দেওয়া হবে। তারপর তাদেরকে তাদের নিয়ত অনুযায়ী পুনরুত্থিত করা হবে।” (বুখারী ২১১৮, মুসলিম ৭৪২৬নং)

তিনি আরো বলেছেন,

(( إِذَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْمٍ عَذَابًا ، أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ، ثُمَّ يُعْثَوُا

عَلَى أَعْمَالِهِمْ )) . متفق عليه

“যখন কোন জাতির উপর মহান আল্লাহ আযাব অবতীর্ণ করেন, তখন তাদের মধ্যে বিদ্যমান সমস্ত লোককে তা গ্রাস ক’রে ফেলে। তারপর

(বিচারের দিনে) তাদেরকে স্ব-স্ব কৃতকর্মের ভিত্তিতে পুনরুত্থিত করা হবে।” (বুখারী ৭১০৮, মুসলিম ৭৪২৫নং)

যে কোনও কাজকে আপাতদৃষ্টিতে দেখে ‘ভালো কাজ’ বলে মনে হলেও মহান আল্লাহর নিকট তা ভালো নাও হতে পারে। যেহেতু শরীয়ত অনুসারে যে কাজ ভালো হয়, সেটাই আসলে ভালো কাজ। সে কাজ যে করবে, তাকে মু’মিন হতে হবে, সে কাজ হবে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে এবং তা হবে তাঁর নবীর সুন্নাহ অনুযায়ী।

অনুরূপ ভালো কাজের বিনিময় আল্লাহর কাছে পাওয়া যাবে, যদি তা তাঁর নিকট আশা করা হয় তবে। মু’মিন অবস্থায় ভালো কাজ করলেও যদি নির্দিষ্ট সওয়াবের আশা না করা হয়, তাহলে তা পাওয়া যায় না। এই জন্য মহানবী ﷺ বলেছেন,

(( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ )) متفقٌ عَلَيْهِ

“যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে নেকীর আশায় রমযানের রোযা পালন করবে, তার অতীতের গুনাহসমূহ ক্ষমা ক’রে দেওয়া হবে।” (বুখারী ৩৮, মুসলিম ১৮১৭নং)

(( مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ )) متفقٌ عَلَيْهِ

“যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও নেকীর আশায় রমযান মাসে কিয়াম করবে (তারাবীহ পড়বে), তার পূর্বকার পাপসমূহ মাফ ক’রে দেওয়া হবে।” (বুখারী ৩৭, ২০০৮-২০০৯, মুসলিম ১৮১৫নং, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ)

(( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ))

إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ )) متفقٌ عَلَيْهِ

“যে ব্যক্তি ঈমান ও বিশ্বাসের সাথে এবং সওয়াবের আশা রেখে রমযানের রোযা রাখবে, তার পূর্বকার পাপরাশি মাফ হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি শবেক্বদরে (ভাগ্যরজনী অথবা মহিযসী রজনীতে) ঈমানসহ নেকীর আশায় কিয়াম করবে (নামায পড়বে), তার অতীতের গোনাহ মাফ ক’রে দেওয়া হবে।” (বুখারী ৩৫, ১৯০১, ২০১৪, মুসলিম ১৮১৭নং)

(( مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحْدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ ))

“যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং নেকী লাভের আশায় জানাযার অনুগমন করবে, তার নামায ও দাফন হওয়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকবে, সে ব্যক্তি দুই

ক্বীরাত সওয়াব নিয়ে ফিরে আসবে। প্রত্যেক ক্বীরাত উহুদ পাহাড় সমতুল্য। আর যে ব্যক্তি তার নামায পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, সে ব্যক্তি এক ক্বীরাত সওয়াব নিয়ে ফিরে আসবে।” (বুখারী ৪৭নং)

সা’দ বিন আবী অক্বাস رضي الله عنه বলেন, যে দশজন সাহাবীকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল ইনি তাঁদের মধ্যে একজন। বিদায় হজ্জের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার রুগ্ন অবস্থায় আমাকে দেখা করতে এলেন। সে সময় আমার শরীরে চরম ব্যথা ছিল। আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমার (দৈহিক) জ্বালা-যন্ত্রণা কঠিন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে---যা আপনি স্বচক্ষে দেখছেন। আর আমি একজন ধনী মানুষ; কিন্তু আমার উত্তরাধিকারী বলতে আমার একমাত্র কন্যা। তাহলে আমি কি আমার মাল-সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ দান করে দেব?’ তিনি বললেন, “না।” আমি বললাম, ‘তাহলে অর্ধেক মাল হে আল্লাহর রসূল!’ তিনি বললেন, “না।” আমি বললাম, ‘তাহলে কি এক তৃতীয়াংশ দান করতে পারি?’ তিনি বললেন,

((الْثُلُثُ وَالْثُلُثُ كَثِيرٌ - أَوْ كَبِيرٌ - إِنَّكَ إِنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجَهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلَ فِي فِئِ امْرَأَتِكَ))

“এক তৃতীয়াংশ (দান করতে পার), তবে এক তৃতীয়াংশও অনেক। কারণ এই যে, তুমি যদি তোমার উত্তরাধিকারীদের ধনবান অবস্থায় ছেড়ে যাও, তাহলে তা এর থেকে ভাল যে, তুমি তাদেরকে কাঙ্গাল করে ছেড়ে যাবে এবং তারা লোকের কাছে হাত পাতবে। (মনে রাখ, ) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তুমি যা ব্যয় করবে তোমাকে তার বিনিময়ে দেওয়া হবে। এমনকি তুমি যে গ্রাস তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দাও তারও তুমি বিনিময় পাবে।”

আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমি কি আমার সঙ্গীদের ছেড়ে পিছনে (মক্কায়) থেকে যাব?’ তিনি বললেন,

(( إِنَّكَ لَنْ تُخْلَفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجَهَ اللَّهِ إِلَّا أَزْدَدَتْ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً ، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخْلَفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ . اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ ، لَكِنَّ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خُوَلَةَ )) .

“তুমি যদি তোমার সঙ্গীদের মরার পর জীবিত থাক এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কোন কাজ কর, তাহলে তার ফলে তোমার মর্যাদা ও সম্মান বর্ধন হবে। আর সম্ভবতঃ তুমি বেঁচে থাকবে। এমনকি তোমার দ্বারা



কিছু লোক (মু'মিনরা) উপকৃত হবে। আর কিছু লোক (কাফেররা) ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হে আল্লাহ! তুমি আমার সাহাবীদেরকে হিজরতে পরিপূর্ণতা দান কর এবং তাদেরকে (হিজরত থেকে) পিছনে ফিরিয়ে দিয়ে না। কিন্তু মিসকীন সা'দ ইবনে খাওলা।” তাঁর মৃত্যু মক্কায় হওয়ার জন্য নবী ﷺ দুঃখ ও শোক প্রকাশ করেন। (বুখারী ১২৯৫, ৩৯৩৬, মুসলিম ৪২৯৬নং)

আল্লাহ্ আকবার! প্রিয়জনকে এবং যাকে খাওয়ানো ওয়াজেব তাকে খাওয়ালেও সওয়াব, যদি তাতে সওয়াবের নিয়ত থাকে। না, কেবল পর বা পরিজনকে খাওয়ালেই সওয়াব নয়, সওয়াবের আশা করলে নিজের মুখে তুলে দেওয়া খাদ্য-গ্রাসেও সওয়াব আছে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((عَجِبْتُ لِلْمُسْلِمِ إِذَا أَصَابَهُ خَيْرٌ حَمِدَ اللَّهَ وَشَكَرَ، وَإِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ احْتَسَبَ وَصَبَرَ، الْمُسْلِمُ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي اللَّقْمَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى فِيهِ)).

“আমি মুসলিমের ব্যাপারে অবাক হয়েছি, যখন তার নিকট কোন মঙ্গল আসে, তখন সে আল্লাহর প্রশংসা করে ও শুকরিয়া আদায় করে। আর যখন তার কোন মসীবত আসে, তখন সে সওয়াব কামনা করে ও ধৈর্যধারণ করে। মুসলিম প্রত্যেক জিনিসে সওয়াবপ্রাপ্ত হয়, এমনকি সেই খাদ্য-গ্রাসেও, যা সে নিজের মুখে তুলে দেয়।” (আহমাদ ১৫৩১, বাইহাক্বীর শুআবুল ইমান ৯৯৫০নং)

সওয়াবের উদ্দেশ্য হলে, সওয়াবের কাজের উদ্দেশ্যে পথ চলাতেও সওয়াব আছে। উবাই ইবনে কা'ব ؓ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একটি লোক ছিল। আমি জানি না যে, অন্য কারো বাড়ি তার বাড়ির চেয়ে দূরে ছিল। তা সত্ত্বেও তার কোন নামায ছুটত না। অতঃপর তাকে বলা হল অথবা আমি (কা'ব) তাকে বললাম যে, ‘তুমি যদি একটি গাধা কিনে আঁধারে ও ভীষণ রোদে তার উপর সওয়ার হয়ে আসতে, (তাহলে তা তোমার পক্ষে ভালো হত?)’ সে বলল, ‘আমি এটা পছন্দ করি না যে, আমার বাড়ি মসজিদ সংলগ্নে হোক। কারণ আমি তো এই চাই যে, (দূর থেকে) আমার পায়ে হেঁটে মসজিদ যাওয়া এবং ওখান থেকেই পুনরায় বাড়ি ফেরা, সবকিছু যেন আমার নেকীর খাতায় লেখা যায়।’ রাসূলুল্লাহ ﷺ (তার কথা শুনে) বললেন,

(( قَدْ جَمَعَ اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ كُلُّهُ )) . وفي رواية : (( إِنَّ لَكَ مَا احْتَسَبْتَ )) .

“আল্লাহ তাআলা এ সমস্ত তোমার জন্য একত্র ক’রে দিয়েছেন।”

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “নিশ্চয় তোমার জন্য সেই সওয়াবই রয়েছে, যার তুমি আশা করেছ।” (মুসলিম ১৫৪৬-১৫৪৮নং)

পক্ষান্তরে বিপদ-আপদ বা কষ্টের ব্যাপার হলে তাতে আরো একটি শর্ত সংযোজন হয়; ধৈর্যধারণ করা। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(( يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : مَا لِعِبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبِضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ، ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلَّا الْجَنَّةَ )) . رواه البخاري

“মহান আল্লাহ বলেন, ‘যখন আমি আমার বান্দার পছন্দনীয় পার্থিব জিনিসকে কেড়ে নিই, অতঃপর সে (তাতে) সওয়াবের আশা রাখে, তখন তার জন্য আমার নিকট জান্নাত ছাড়া অন্য কোন বিনিময় নেই।” (বুখারী ৬৪২৪নং)

(( إِنَّ اللَّهَ - عز وجل - قَالَ : إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبْرٌ عَوَّضُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ )) يريد عينيهِ . رواه البخاري

“আল্লাহ আযযা অজাল্ল বলেন, যখন আমি আমার বান্দাকে তার প্রিয়তম জিনিস দ্বারা (অর্থাৎ চক্ষু থেকে বঞ্চিত করে) পরীক্ষা করি এবং সে সবর করে, তখন আমি তাকে এ দু’টির বিনিময়ে জান্নাত প্রদান করব।” (বুখারী ৫৬৫৩নং)

((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ السَّقْطَ لَيَجُرُّ أُمَّهُ بِسَرِّهِ إِلَى الْجَنَّةِ إِذَا احْتَسَبَتْهُ)).

“সেই সত্তার শপথ; যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! গর্ভচ্যুত (মৃত) শিশু তার নাভির নাড়ী ধরে নিজের মাতাকে বেহেশুর দিকে টেনে নিয়ে যাবে--- যদি ঐ মা (তার গর্ভপাত হওয়ার সময়) ঐ সওয়াবের আশা রাখে তবে।” (আহমাদ ২২০৯০, ইবনে মাজাহ ১৬০৯, ত্বাবারানী ১৬৭২ ১নং)

((مَنْ احْتَسَبَ ثَلَاثَةَ مِنْ صَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ)).

“যে ব্যক্তি নিজ ঔরসজাত তিনটি শিশুর ব্যাপারে সওয়াবের আশা করবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।”

এক মহিলা বলল, ‘আর দুটি হলে?’ তিনি বললেন, “আর দুটি হলেও।” (নাসাঈ ১৮-৭২, ইবনে হিষ্মান ২৯৪৩, সিঃ সহীহাহ ২৩০২নং)

একদা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আল্লাহর রসূল ﷺ-কে প্লেগ রোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তাঁকে বললেন যে,

((أَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مَنْ يَشَاءُ ، فَجَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ، فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ فِي الطَّاعُونَ فَيَمُوتُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ)).

“এটা আযাব; আল্লাহ তাআলা যার প্রতি ইচ্ছা করেন এটা প্রেরণ করেন।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা একে মু'মিনদের জন্য রহমত বানিয়ে দিলেন। ফলে (এখন) যে ব্যক্তি প্লেগ রোগে আক্রান্ত হবে এবং সে নিজ দেশে ধৈর্য সহকারে নেকীর নিয়তে অবস্থান করবে, সে জানবে যে, তাকে তাইই পৌঁছবে যা আল্লাহ তাআলা তার জন্য লিখে দিয়েছেন, তাহলে সে ব্যক্তির জন্য শহীদের মত পুরস্কার রয়েছে।” (বুখারী ৩৪৭৪, ৬৬১৯নং)

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মুসলিম কোন সওয়াবের নিয়ত করলেই তার আমলনামায় একটি সওয়াব লিপিবদ্ধ হয়। সওয়াবের নিয়ত রেখে কোন কাজ করার সংকল্প করার পর তা না করতে পারলেও সওয়াব বহাল থাকে। মনে করুন, জামাআতে নামায পড়ার নিয়তে মসজিদে গেলেন, গিয়ে দেখলেন, জামাআত শেষ। আপনি জামাআতের সওয়াব পেয়ে গেলেন। তাহাজ্জুদের নিয়তে শুলেন, কিন্তু ঘুমিয়ে ফজর হয়ে গেল, আপনি তাহাজ্জুদের সওয়াব পেয়ে গেলেন। মহানবী ﷺ বলেছেন, ((مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ يُصَلِّيَ مِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ حَتَّى يُصْبِحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى ، وَكَانَ ثَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ)).

“রাত্রে উঠে তাহাজ্জুদ পড়বে এই নিয়ত (সংকল্প) করে যে ব্যক্তি নিজ বিছানায় আশ্রয় নেয়, অতঃপর তার চক্ষুদ্বয় তাকে নিদ্রাভিত্ত করে ফেলে এবং যদি এই অবস্থাতেই তার ফজর হয়ে যায়, তবে তার আমলনামায় তাই লিপিবদ্ধ হয় যার সে নিয়ত (সংকল্প) করেছিল। আর তার ঐ নিদ্রা তার প্রতিপালকের তরফ হতে সদকাহ (দান) রূপে প্রদত্ত হয়।” (নাসাঈ ১৭৮৭, ইবনে মাজাহ ১৩৪৪, ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ তারগীব ৫৯৮নং)

বাড়িতে সুস্থ থাকা অবস্থায় যে ইবাদত হয়, তা মুসাফির ও অসুস্থ অবস্থায় হয় না। কিন্তু আপনার মনে থাকে পরিপূর্ণ ইবাদত করার আকাঙ্ক্ষা। তাই মহান আল্লাহ আপনাকে সেই পরিপূর্ণ ইবাদতের সওয়াব দান করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

(( إِذَا مَرَضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا ))

“যখন বান্দা অসুস্থ হয় অথবা সফরে থাকে, তখন তার জন্য ঐ আমলের মতই (সওয়াব) লেখা হয়, যা সে গৃহে থেকে সুস্থ শরীরে সম্পাদন করত।” (বুখারী ২৯৯৬নং)

আল-হামদু লিল্লাহ! মনের নিয়তেরও এত শক্তি যে, সংকল্পকৃত কাজ না করেও তার পূর্ণ সওয়াব পাওয়া যায়। আর তা হল মহান করুণাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে উপহার।

শহীদের মরণ সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মরণ। মনে-প্রাণে আপনি সেই মরণ কামনা

করেন। কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে গিয়েও আপনার মৃত্যু হল না অথবা জিহাদের শর্ত পূরণ না হওয়ার দরুন অথবা কোন বাধার কারণে আপনি তাতে শরীক না হতে পেরে বাড়িতেই মারা গেলেন, তবুও আপনি শহীদগণের মর্যাদা পাবেন। আল্লাহর নবী ﷺ বলেছেন,

(( مَنْ سَأَلَ اللَّهَ تَعَالَى الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ ، وَإِنْ مَاتَ

عَلَى فِرَاشِهِ )) . رواه مسلم

“যে ব্যক্তি সত্য নিয়তে আল্লাহর কাছে শাহাদত প্রার্থনা করবে, আল্লাহ তাকে শহীদদের মর্যাদায় পৌঁছিয়ে দেবেন; যদিও সে নিজ বিছানায় মৃত্যুবরণ করে।” (মুসলিম ৫০৩৯নং)

কোন এক সওয়াবের কাজের নিয়ত ছিল, কিন্তু আপনি কোন প্রতিবন্ধকতার ফলে তা করতে পারলেন না, তাতেও আপনি কাজের কাজীর মতো বসে-শুয়ে সওয়াব লাভ করবেন। জাবের বিন আব্দুল্লাহ আনসারী ﷺ বলেন, একদা আমরা নবী ﷺ-এর সাথে এক অভিযানে ছিলাম। তিনি বললেন,

(( إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا ، وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا ، إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ

حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ )) . وَفِي رَوَايَةٍ : (( إِلَّا شَرَكُوكُمْ فِي الْأَجْرِ )) .

“মদীনাতে কিছু লোক এমন আছে যে, তোমরা যত সফর করছ এবং যে কোন উপত্যকা অতিক্রম করছ, তারা তোমাদের সঙ্গে রয়েছে। অসুস্থতা তাদেরকে মদীনায় থাকতে বাধ্য করেছে।” আর একটি বর্ণনায় আছে যে, “তারা নেকীতে তোমাদের অংশীদার।” (মুসলিম ৫০৪১নং)

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, নবী ﷺ-এর সাথে আবুক অভিযান থেকে আমাদের প্রত্যাবর্তনকালে তিনি বললেন,

(( إِنَّ أَقْوَامًا خَلَفْنَا بِالْمَدِينَةِ مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلَا وَادِيًا ، إِلَّا وَهُمْ مَعَنَا ؛ حَبَسَهُمُ

الْعُذْرُ )) .

“আমাদের পিছনে মদীনায় এরূপ কিছু লোক আছে যারা প্রত্যেক গিরিপথ বা উপত্যকা অতিক্রমকালে আমাদের সাথে রয়েছে। বিশেষ ওজর তাদেরকে ঘরে থাকতে বাধ্য করেছে।” (বুখারী ২৮৩৯নং)

ভালো কাজের সাথে মন লটকে থাকলে ভালো কাজের সওয়াব লাভ হয়। নামাযের জন্য অপেক্ষমাণ ব্যক্তি নামাযরত ব্যক্তির মতোই। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((وَلَا يَزَالُ فِي صَلَاةٍ مَا انتَّظَرَ الصَّلَاةَ)).

“সে ব্যক্তি ততক্ষণ নামাযের মধ্যেই থাকে, যতক্ষণ সে নামাযের প্রতীক্ষা করে।” (বুখারী ৬৪৭, মুসলিম ১৫০৮নং, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

নামাযী তো অনেকেই হয়, কিন্তু নামাযের সাথে মন বাঁধা থাকে কয়টা নামাযীর? জামাআত সহকারে নামায পড়ার মর্যাদা অনুধাবন করে কয়টা নামাযী? বাড়ি, ব্যবসা বা কর্মস্থলে বসে থেকে মসজিদের সাথে হৃদয় লটকে থাকে কত জনের? নিশ্চয় তারা মহান আল্লাহর খাস বান্দা, যাদের জন্য তিনি কিয়ামতের ছায়াহীন ময়দানে আরশের ছায়া দান করবেন। (বুখারী ৬৬০নং, মুসলিম ১০৩১নং)

সওয়াবের কাজে বের হয়ে পথে মৃত্যু হলে মহান আল্লাহ তার সওয়াব দান করে থাকেন। তিনি বলেছেন,

{وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَافًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (سورة النساء ১০০)

“যে কেউ আল্লাহর পথে দেশ ত্যাগ করবে, সে পৃথিবীতে বহু আশ্রয়স্থল ও প্রাচুর্য লাভ করবে এবং যে কেউ আল্লাহ ও রসূলের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগী হয়ে বের হলে অতঃপর (সে অবস্থায়) তার মৃত্যু ঘটলে তার পুরস্কারের ভার আল্লাহর উপর। বস্তুতঃ আল্লাহ চরম ক্ষমালীল, পরম দয়ালু।” (নিসাঃ ১০০)

১০০ খুনের খুনীর কাহিনী প্রসিদ্ধ। ৯৯টি খুন ক’রে এক ছোট আলেমকে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করল, ‘তার তওবা কবুল হবে কি?’ সে নেতিবাচক জবাব দিলে তাকে খুন ক’রে তার সংখ্যা ১০০ পূর্ণ করল। অতঃপর সে বড় একজন আলেমকে জিজ্ঞাসা করল, ‘সে একশত মানুষ খুন করেছে। সুতরাং তার কি তওবার কোন সুযোগ আছে?’ সে বলল, ‘হ্যাঁ আছে! তার ও তওবার মধ্যে কে বাধা সৃষ্টি করবে? তুমি অমুক দেশ চলে যাও। সেখানে কিছু এমন লোক আছে যারা আল্লাহ তাআলার ইবাদত করে। তুমিও তাদের সাথে আল্লাহর ইবাদত কর। আর তোমার নিজ দেশে ফিরে যেও না। কেননা, ও দেশ পাপের দেশ।’ সুতরাং সে ব্যক্তি ঐ দেশ অভিমুখে যেতে আরম্ভ করল। যখন সে মধ্য রাত্তায় পৌঁছল, তখন তার মৃত্যু এসে গেল। (তার দেহ-পিঞ্জর থেকে আত্মা বের করার জন্য) রহমত ও আযাবের উভয় প্রকার ফিরিশ্তা উপস্থিত হলেন। ফিরিশ্তাদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হল। রহমতের ফিরিশ্তাগণ বললেন, ‘এই ব্যক্তি তওবা

ক’রে এসেছিল এবং পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর দিকে তার আগমন ঘটেছে।’ আর আযাবের ফিরিশ্তারা বললেন, ‘এ এখনো ভাল কাজ করেনি (এই জন্য সে শাস্তির উপযুক্ত)।’ এমতাবস্থায় একজন ফিরিশ্তা মানুষের রূপ ধারণ ক’রে উপস্থিত হলেন। ফিরিশ্তাগণ তাঁকে সালিস মানলেন। তিনি ফায়সালা দিলেন যে, ‘তোমরা দু’ দেশের দূরত্ব মাপে দেখ। (অর্থাৎ এ যে এলাকা থেকে এসেছে সেখান থেকে এই স্থানের দূরত্ব এবং যে দেশে যাচ্ছিল তার দূরত্ব) এই দুয়ের মধ্যে সে যার দিকে বেশী নিকটবর্তী হবে, সে তারই অন্তর্ভুক্ত হবে।’ অতএব তাঁরা দূরত্ব মাপলেন এবং যে দেশে সে যাওয়ার ইচ্ছা করেছিল, সেই (ভালো) দেশকে বেশী নিকটবর্তী পেলেন। সুতরাং রহমতের ফিরিশ্তাগণ তার জান কবয করলেন।”

সহীহতে আর একটি বর্ণনায় এরূপ আছে যে, “পরিমাপে ঐ ব্যক্তিকে সংশীল লোকদের দেশের দিকে এক বিঘত বেশী নিকটবর্তী পাওয়া গেল। সুতরাং তাকে ঐ সংশীল ব্যক্তিদের দেশবাসী বলে গণ্য করা হল।”

অন্য বর্ণনায় আছে, “সে ব্যক্তি নিজের বুকের উপর ভর ক’রে ভালো দেশের দিকে একটু সরে গিয়েছিল।” (বুখারী ৩৪৭০, মুসলিম ৭১৮৪-৭১৮৫নং)

সুতরাং সে গন্তব্যে পৌঁছতে না পারলেও তার মন সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল, তাই সে করুণার পাত্র হয়ে গেল।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَبَيَّةٌ وَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَاَنْفِرُوا)). متفق عليه

“মক্কা বিজয়ের পর (মক্কা থেকে) হিজরত নেই; বরং বাকী রয়েছে জিহাদ ও নিয়ত। সুতরাং যদি তোমাদেরকে জিহাদের জন্য ডাক দেওয়া হয়, তাহলে তোমরা (জিহাদে) বেরিয়ে পড়।” (বুখারী ১৮৩৪, মুসলিম ৪৯৩৬নং)

‘মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরত নেই’ এর অর্থ এই যে, মক্কা এখন ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হল। ফলে এখান থেকে মুসলমানেরা আর হিজরত করতে পারবে না।

যে দেশ মুসলিম দেশ, যে দেশে হিজরত নেই এবং যে দেশে জিহাদ নেই, সে দেশে হিজরত ও জিহাদের নিয়ত রাখলে তার সওয়াব পাওয়া যাবে। কিন্তু যখনই পরিস্থিতি নির্দেশ দেবে, তখনই হিজরত ও জিহাদ করব--- এই নিয়ত মনের ভিতরে পোষণ করতে হবে।

আমার কাছে যে জিনিস নেই, সে জিনিস আমার হলে আমি তার মতো করব, যার আছে এবং সে তা সংকর্মে ব্যয় করছে। তাহলে কেবল নিয়তের

কারণেই আমি তার মতোই সওয়াব পাব।

যেমন আমার কাছে যে জিনিস নেই, সে জিনিস আমার হলে আমি তার মতো করব, যার আছে এবং সে তা অসৎকর্মে ব্যয় করছে। তাহলে কেবল নিয়তের কারণেই আমি তার মতোই গোনাহগার হব।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((وَأَحَدْتُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ، إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ : عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا ، فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحْمَهُ، وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا ، فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ . وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا، وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا ، فَهُوَ صَادِقُ النَّيَّةِ ، يَقُولُ : لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ ، فَهُوَ بَنِيَّتِهِ ، فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ . وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا ، وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا ، فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ ، وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحْمَهُ ، وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا ، فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ . وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا ، فَهُوَ يَقُولُ : لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ ، فَهُوَ بَنِيَّتِهِ ، فَوَزَرُهُمَا سَوَاءٌ )).

“তোমাদেরকে একটি হাদীস বলছি তা স্মরণ রাখো। দুনিয়ায় চার প্রকার লোক আছে;

(১) ঐ বান্দা, যাকে আল্লাহ ধন ও (ইসলামী) জ্ঞান দান করেছেন। অতঃপর সে তাতে আল্লাহকে ভয় করে এবং তার মাধ্যমে নিজ আত্মীয়তা বজায় রাখে। আর তাতে যে আল্লাহর হুক রয়েছে তা সে জানে। অতএব সে (আল্লাহর কাছে) সবচেয়ে উৎকৃষ্ট স্তরে অবস্থান করবে।

(২) ঐ বান্দা, যাকে আল্লাহ (ইসলামী) জ্ঞান দান করেছেন; কিন্তু মাল দান করেননি। সে নিয়তে সত্যনিষ্ঠ, সে বলে যদি আমার মাল থাকত, তাহলে আমি (পূর্বোক্ত) অমুকের মত কাজ করতাম। সুতরাং সে নিয়ত অনুসারে বিনিময় পাবে; এদের উভয়ের প্রতিদান সমান।

(৩) ঐ বান্দা, যাকে আল্লাহ মাল দান করেছেন; কিন্তু (ইসলামী) জ্ঞান দান করেননি। সুতরাং সে না জেনে অবৈধরূপে নির্বিচারে মাল খরচ করে; সে তাতে আল্লাহকে ভয় করে না, তার মাধ্যমে নিজ আত্মীয়তা বজায় রাখে না এবং তাতে যে আল্লাহর হুক রয়েছে তাও সে জানে না। অতএব সে (আল্লাহর কাছে) সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্তরে অবস্থান করবে। আর

(৪) ঐ বান্দা, যাকে আল্লাহ ধন ও (ইসলামী) জ্ঞান কিছুই দান করেননি। কিন্তু সে বলে, যদি আমার নিকট মাল থাকত, তাহলে আমিও (পূর্বোক্ত)

অমুকের মত কাজ করতাম। সুতরাং সে নিয়ত অনুসারে বিনিময় পাবে; এদের উভয়ের পাপ সমান।” (তিরমিযী ২৩২৫নং)

বলা বাহুল্য, মন ঠিক হলে সব ঠিক। মন এমন যন্ত্র যে, পরিশ্রম না করেও শ্রমিকের মতো পারিশ্রমিক পাওয়া যায়। আর নিশ্চয় তা মহান আল্লাহর অপার করুণার একটি মহা উপহার।

## মন দিয়ে মন জয়

মানুষের মন কতই না সুন্দর! মানুষ যে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। প্রাণ থাকলে প্রাণী হয়, কিন্তু মন না থাকলে মানুষ হয় না।

যার মন নেই, সে আসলে মানুষ নয়; সে একটি কলের পুতুল (রোবট)।

তরুলতা সহজেই তরুলতা, পশুপক্ষী সহজেই পশুপক্ষী, কিন্তু মানুষ প্রাণপণ চেষ্টায় তবেই মানুষ।

মানুষের মন, যা দান করলে বিনিময়ে মন পাওয়া যায়। মনে মনে মিল, লেগে যায় খিল।

প্রত্যেক মানুষের খোঁজ থাকে, মনের মতো মানুষ পাবে সে। তাইতো সে বলে, ‘মনের মতন রতন পেলে যতন করি তার।’

হৃদয়ের বিনিময়ে হৃদয় পাওয়া যায়। হৃদয় না দিয়ে হৃদয় পাওয়ার আশা করা যায় না।

জ্ঞানিগণ বলেছেন, ‘কোন ভদ্র মানুষকে ক্রয় করার মূল্য তোমার নেই। কিন্তু তুমি তাকে ভক্তি দাও, সে তোমাকে তার হৃদয় বিক্রয় করে দেবে। আর এর ফলে তুমি তার মালিক হয়ে যাবে।’

মনের উপর কারো হাত নেই, কারো মনের উপর জোর খাটানোর চেষ্টা বৃথা।

যুক্তি-তর্ক বা শক্তিব্যয় ইত্যাদি করে কখনো কখনো জয়লাভ করা যায়। কিন্তু সে জয়লাভের কোন মূল্য থাকে না, যদি না তাতে প্রতিপক্ষের মনজয় করা যায়। সে গদিতে আর কতদিন বসতে পাওয়া যায়, যে গদি গায়ের জোরে দখল করা হয়?

‘গায়ের জোরে সবকিছু কেড়ে নেওয়া যায়,

সোনা-দানা গয়না-পাতি ভালোবাসা নয়।’

অনুরূপ টাকা দিয়ে সবকিছু কেনা যায়, কিন্তু মানুষের মন ও মনুষ্যত্ব কেনা যায় না। যেমন টাকা দিয়ে দামী খাবার কেনা যায়, কিন্তু খিদে কেনা যায় না। টাকা দিয়ে দামী বিছানা কেনা যায়, কিন্তু ঘুম কেনা যায় না। টাকা দিয়ে একটা স্বামী অথবা স্ত্রী কেনা যায়, কিন্তু ভালবাসা কেনা যায় না।



সুতরাং টাকা দিয়ে বেশি দিন কোন মানুষকে আপন ক’রে রাখা যায় না।

তদনুরূপ ভয় দেখিয়েও মানুষকে বশ করা যায় না। বন্দুক দেখিয়ে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করা যায় না।

‘ভয়ে প্রাণ যে করিবে দান প্রেম সে তো সঁপিবে না,

টাকা দিয়ে শুধু মাথা কেনা যায়, হৃদয় যায় না কেনা।’

হৃদয় ও ভালোবাসা দিয়ে মানুষকে বশ করা যায়। মন দান ক’রে অনুগত করা যায়। রাগ দেখিয়ে নয়, বরং বিরাগ দেখিয়ে অনুরাগ সৃষ্টি করা যায়। রক্ত দিয়ে অনুরক্ত তৈরি করা যায় না, বরং ভক্তি দিয়ে আসক্তি তৈরি করা যায়। আর তার জন্য চাই ধৈর্য ও সহনশীলতা।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (৩৫) وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ} سورة فصلت

“ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। উৎকৃষ্ট দ্বারা মন্দ প্রতিহত কর; তাহলে যাদের সাথে তোমার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো। এ চরিত্রের অধিকারী কেবল তারাই হয় যারা ধৈর্যশীল, এ চরিত্রের অধিকারী তারাই হয় যারা মহাভাগ্যবান।” (হা-মীম সাজদাহঃ ৩৪-৩৫)

স্বামী-স্ত্রীর সংসারেও একদিন মধু, একদিন কদু হয়। পরস্পরে মন বিনিময় হলে তবেই সে সংসারে শান্তি বিরাজ করে। মন পাওয়া না গেলে বিলাস-সুখে কোন লাভ হয় না। যে মানুষের মন পাওয়া যায় না, তার দেহ নিয়ে কী সুখ পাওয়া যায়?

সত্যিপক্ষের স্ত্রী অসুন্দরী হলেও স্বামীর মনে তার নিজ সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পারে। তার রূপ না থাকলেও গুণই রূপের কাজ করে। মন দিয়ে সে মন জয় করে।

কিন্তু একবার মন ভেঙ্গে গেলে, সে মন পুনর্বার জয় করা যায় না।

‘দিয়েছিলে হৃদয় যখন

পেয়েছিলে প্রাণমন দেহ।

আজ সে হৃদয় নাই যতই সোহাগ পাই

শুধু তাই অবিশ্বাস বিষাদ সন্দেহ।’

## হৃদয়ের মালিক আল্লাহ

মহান আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা। আমরা তাঁরই, তাঁরই দিকে আমরা ফিরে যাব। আমাদের দেহাঙ্গের মালিক তিনি, হৃদয়ের মালিকও তিনি। তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন আমাদের কর্মকেও। বান্দা ভালো কাজ করে নিজের এখতিয়ারে তাঁরই তওফীকে এবং খারাপ কাজ করে নিজের এখতিয়ারে তাঁরই ইচ্ছাতে। তিনি যাকে হিদায়াত করেন, তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং যাকে গোমরাহ করেন, তিনি তার প্রতি অন্যায় করেন না। তিনি সৌভাগ্যবানের হৃদয়ে হিদায়াতের আলো বিচ্ছুরিত করেন, সেটা তাঁর দয়া। আর দুর্ভাগ্যবানের হৃদয়ে মোহর মেরে দেন, সেটা তাঁর ইনসাফ। তিনি মানুষের কিছু অপরাধের শাস্তি দুনিয়াতে প্রদান ক’রে থাকেন। তার কুকর্মের প্রতিফল স্বরূপ তার হৃদয়কে অন্ধ ক’রে দেন।

মুনাফিকরা আল্লাহ, রসূল ও মু’মিনদের সাথে কপটতা ও বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাই তারা হৃদয়ে মোহর মারার সাজাপ্রাপ্ত হয়। আর তখন তারা হিদায়াত পাওয়ার প্রয়াস লাভ করে না। উপদেশ শুনেও শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{حَتَّمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ

عَظِيمٌ} (صُورَةُ الْبَقَرَةِ (৭))

“আল্লাহ তাদের হৃদয় ও কানে মোহর মেরে দিয়েছেন, তাদের চোখের উপর আবরণ রয়েছে এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।” (বাক্বারাহঃ ৭)

{فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ}

“তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করেছেন ও তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাচারী।” (বাক্বারাহঃ ১০)

{وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ}

(صُورَةُ الْأَنْعَامِ (২৫))

“তাদের মধ্যে কিছু লোক তোমার দিকে কান পেতে রাখে, কিন্তু আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি, যেন তারা তা উপলব্ধি করতে না পারে এবং তাদেরকে বধির করেছি। সমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করলেও তারা

তাতে বিশ্বাস করবে না। এমন কি তারা যখন তোমার নিকট উপস্থিত হয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তখন অবিশ্বাসিগণ বলে, ‘এ তো সে কালের উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নয়।’ (আনআমঃ ২৫)

যারা মহান আল্লাহর দূতের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করে না। বরং তাঁর বিরোধিতা করে, তাঁকে নানাভাবে কষ্ট দেয় এবং বক্রপথ অবলম্বন করে, তারা কি শাস্তিযোগ্য নয়? অবশ্যই। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُوذُّونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} (৫) الصف

“(স্মরণ কর,) যখন মুসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, ‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে কেন কষ্ট দিচ্ছ অথচ তোমরা জান যে, আমি তোমাদের প্রতি (প্রেরিত) আল্লাহর রসূল?’ অতঃপর তারা যখন বক্রপথ অবলম্বন করল, তখন আল্লাহ তাদের হৃদয়কে বক্র ক’রে দিলেন। আর আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।” (স্বাফঃ ৫)

কোন কোন বিরুদ্ধাচরণ ও অবাধ্যাচরণের সাজাও হৃদয়ে প্রদান করা হয়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(( لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجَمَاعَاتِ أَوْ لِيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لِيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ )) .

“লোকেরা যেন জামাআত ত্যাগ করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকে; নচেৎ আল্লাহ অবশ্যই তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেবেন, তারপর তারা অবশ্যই উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে।” (মুসলিম ২০৩৯, নাসাঈ ১৩৭০, ইবনে মাজাহ ৭৯৪৮)

আবু মাসউদ রা. বলেছেন, নবী ﷺ নামাযে (কাতার বাঁধার সময়) আমাদের কাঁধে হাত বুলিয়ে বলতেন,

((اسْتَوْوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ ، لِيَلْبِنِي مِنْكُمْ أَوْلُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ )) . رَوَاهُ مُسْلِم

“তোমরা সোজা হয়ে দাঁড়াও, তোমরা (কাতার বাঁধার সময়ে) পরস্পরের বিরোধিতা করো না; নচেৎ তোমাদের অন্তরের মধ্যে বিরোধিতা সৃষ্টি হবে। তোমাদের মধ্যে যারা বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী তারা যেন আমার নিকটবর্তী থাকে। তারপর যারা (জ্ঞান ও যোগ্যতায়) তাদের কাছাকাছি হবে (তারা দাঁড়াবে)। তারপর যারা (জ্ঞান ও যোগ্যতায়) তাদের কাছাকাছি হবে (তারা দাঁড়াবে)।” (মুসলিম ১০০০নং)

তিনি নামায শুরু করার পূর্বে বলতেন,  
 « أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ». ثَلَاثًا « وَاللَّهِ لَتَقِيمَنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ »

.«

“কাতার সোজা করে নাও।” (তিনবার) “আল্লাহর কসম! তোমরা তোমাদের (নামাযের) কাতার অবশ্যই সোজা করবে, নতুবা আল্লাহ তোমাদের হৃদয় পরিবর্তন ক’রে দেবেন। (অথবা তোমাদের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে দেবেন।)” (আবু দাউদ ৬৬২নং)

হৃদয়ে টেরামি থাকলে মানুষের কাজকর্ম টেরা হয়। যেমন বাহ্যিক কাজে বিভিন্নতা থাকলে হৃদয়ের মাঝেও বিভিন্নতা, বিরোধিতা ও অনৈক্য হয় তার অনিবার্য পরিণতি।

মহান আল্লাহ হৃদয়ের অধিকর্তা। ন্যায়পরায়ণতার সাথে সেই হৃদয়ে অন্ধত্ব, অন্ধকার, প্রতিবন্ধকতা ও অন্তরায় সৃষ্টি করেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ } (২৫) سورة الأنفال

“হে বিশ্বাসিগণ! রসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে আহ্বান করে, যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে, তখন আল্লাহ ও রসূলের আহ্বানে সাড়া দাও এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ মানুষ ও তার হৃদয়ের মাঝে অন্তরায় হন এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে।” (আনফাল ৫২৪)

এই জন্যই আমরা মুআযযিনের আযানে ‘হাইয়া আলাস স্লামাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ’ (এসো নামাযের দিকে, এস সাফল্যের দিকে) শুনে বলে থাকি, ‘লা হাউলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ (আল্লাহর সাহায্য ছাড়া পাপকার্য বর্জন করার এবং সৎকার্য সম্পাদন করার কোন ক্ষমতা নেই।’ আর যারা মহান প্রতিপালকের তওফীক ও সাহায্য পায়, তারা কতই না সৌভাগ্যবান!

মহান প্রতিপালকই মানুষের মনকে তাঁর স্মরণ হতে বঞ্চিত করেন। ফলে সে মানুষ আল্লাহর যিকরে উদাসীন হয়ে যায়। সে মন তাঁর ইচ্ছা ও সন্তুষ্টির অনুসারী হয় না। বরং নিজের খেয়ালখুশির গোলাম হয়ে যায়। মহান আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-কে বলেছিলেন,

{ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ

عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطْعَمَنَ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ۝ (২৮) سورة الكهف

“তুমি নিজেকে তাদেরই সংসর্গে রাখ, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে তাঁর মুখমণ্ডল (দর্শন বা সন্তুষ্টি) লাভের উদ্দেশ্যে আহবান করে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে, তাদের দিক হতে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না। আর তুমি তার আনুগত্য করো না, যার হৃদয়কে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী ক’রে দিয়েছি, যে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে।” (কাহফঃ ২৮)

{أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِّن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝ (২৩) الجاثية

“তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে তার খেয়াল-খুশীকে নিজের উপাস্য ক’রে নিয়েছে? আল্লাহ জেনেশুনেই ওকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং ওর কর্ণ ও হৃদয় মোহর ক’রে দিয়েছেন এবং ওর চোখের ওপর রেখেছেন পর্দা। অতএব, আল্লাহ মানুষকে বিভ্রান্ত করার পর কে তাকে পথনির্দেশ করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?” (জাযিয়াহঃ ২৩)

ভালো-মন্দ সব আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। কেউ ভালোর পথ এখতিয়ার করলে তিনি তার জন্য সে পথকে সহজ ক’রে দেন। তার হৃদয়কে ঈমানের সৌন্দর্য দ্বারা সৌন্দর্যমন্ডিত করেন। ফলে সে সুপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়। তিনি বলেছেন,

{مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ ۝ (১১) سورة التغابن

“আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন বিপদই আপতিত হয় না। আর যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত।” (তাগাবুনঃ ১১)

{وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ

هُمُ الرَّاشِدُونَ ۝ (৭) سورة الحجرات

“তোমরা জেনে রেখো যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রসূল রয়েছেন; তিনি বহু বিষয়ে তোমাদের কথা শুনলে তোমরাই কষ্ট পাবে। কিন্তু আল্লাহ

তোমাদের নিকট ঈমান (বিশ্বাস)কে প্রিয় করেছেন এবং ওকে তোমাদের হৃদয়ে সুশোভিত করেছেন। আর কুফরী (অবিশ্বাস), পাপাচার ও অবাধ্যতাকে তোমাদের নিকট অপ্রিয় করেছেন। ওরাই সৎপথ অবলম্বনকারী।” (হুজুরাতঃ ৭)

মহান আল্লাহ মানুষের হিদায়াতকর্তা। কেউ ইচ্ছা করলেই কাউকে হিদায়াত করতে পারে না। তিনি না চাইলে কেউ সৎপথের দিশা লাভ করতে সক্ষম হয় না। শুধু মানুষই নয়, সকল প্রাণীর নিয়ন্ত্রণ তাঁর ক্ষমতাধীন। হুদ পয়গম্বরকে তাঁর সম্প্রদায় আ’দ যখন উপেক্ষা করল, তখন তিনি তাদেরকে বলেছিলেন,

{إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} (সূরা হুদ ৫৬)

“নিশ্চয় আমি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর উপর ভরসা করেছি। ভূপৃষ্ঠে যত বিচরণকারী জীব রয়েছে, তাদের প্রত্যেকেরই চুলের ঝুঁটি তিনি ধারণ ক’রে আছেন (সবাই তাঁর করায়ত্তে)। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সরল পথে আছেন।” (হুদঃ ৫৬)

সে চায়, আপনি চান, আমি চাই, কিন্তু হয় তাই, যা আল্লাহ চান। নবীগণ পথ দেখিয়েছেন, কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে হিদায়াত করেছেন। তিনি নিজ হিকমতে চাহিদা পূরণ করেন। তিনি না চাইলে কারো চাওয়া পাওয়া হয় না। তিনি বলেছেন,

{وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} (৩০) الإنسان

“তোমরা ইচ্ছা করবে না; যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।” (দাহরঃ ৩০)

তিনি সর্বময় কর্তা। তাঁর হাতে আছে মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ডোর। তাঁরই দুই আঙ্গুলের মাঝে আছে মানুষের হৃদয়। তিনি ইচ্ছামতো তা ঘুরাতে-ফিরাতে থাকেন। তিনিই হৃদয়ের আবর্তন-বিবর্তনকারী। এই জন্য মহানবী ﷺ অধিকাংশ শপথ বা কসম করার সময় বলতেন, ‘না, হৃদয়সমূহের পরিবর্তনকারীর কসম!’ (ইবনে মাজাহ ২০৯২নং)

এই জন্যই তিনি হৃদয় অবিচল থাকার প্রার্থনা করতেন। ঈমানে অটল থাকার দুআ করতেন।

শাহর ইবনে হাওশাব বলেন, আমি উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে বললাম, হে মু’মিন জননী! আল্লাহর রসূল যখন আপনার নিকট অবস্থান করতেন, তখন কোন্ দুআ তিনি অধিক মাত্রায় পাঠ

করতেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অধিকাংশ এই দুআ পড়তেন, ‘ইয়া মুক্বাল্লিবালা ক্বুলুবি যাক্বিত ক্বালবী আলা দীনিকা’ অর্থাৎ, হে হৃদয়সমূহকে বিবর্তনকারী! আমার হৃদয়কে তোমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। (তিরমিযী ৩৫২২নং, হাসান)

আম্র ইবনে আস   বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দুআ পড়তেন,

(( اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ )) . رواه مسلم

‘আল্লা-হুম্মা মুসারিফাল ক্বুলুবি স্মারিফ ক্বুলুবানা আলা ত্বা-আ’তিক।’

হে আল্লাহ! হে হৃদয়সমূহকে আবর্তনকারী! তুমি আমাদের হৃদয়সমূহকে তোমার আনুগত্যের উপর আবর্তিত কর। (মুসলিম ৬৯২১নং)

আনাস   বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বেশি বেশি বলতেন,

(( يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ، ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ )) .

“হে হৃদয়সমূহকে বিবর্তনকারী! তুমি আমার হৃদয়কে তোমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখো।”

আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমরা আপনার প্রতি এবং আপনি যা আনয়ন করেছেন তার প্রতি ঈমান এনেছি, আপনি কি আমাদের ব্যাপারে ভয় করেন?’ তিনি বললেন,

(( نَعَمْ ، اِنَّ الْقُلُوْبَ بَيِّنٌ اِصْبَعَيْنِ مِنْ اَصَابِعِ اللّٰهِ ، يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ )) .

“হ্যাঁ, হৃদয়সমূহ আল্লাহর আঙ্গুলসমূহের মধ্যে দু’টি আঙ্গুলের মাঝে আছে। তিনি তা ইচ্ছামত বিবর্তন ক’রে থাকেন।” (তিরমিযী ২১৪০, ইবনে মাজাহ ৩৮৩৪, মিশকাত ১০২নং)

অতএব আপনিও নিজের হৃদয় যাতে পাল্টে না যায়, তার জন্য হৃদয়ের মালিকের কাছে দুআ করুন।

{ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ

الْوَهَّابُ } (৪) سورة آل عمران

“হে আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে বক্র ক’রে দিয়ো না এবং তোমার নিকট থেকে আমাদেরকে করুণা দান কর। নিশ্চয় তুমি মহাদাতা।” (আলে ইমরান : ৮)

(( يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ، ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ )) .

হে হৃদয়সমূহকে বিবর্তনকারী! তুমি আমার হৃদয়কে তোমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখো।

(( اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ )) .

‘আল্লা-হুম্মা মুসারিফাল কুলুবি স্মারিফ কুলুবানা আলা ত্বা-আ’তিকা।’

হে আল্লাহ! হে হৃদয়সমূহকে আবর্তনকারী! তুমি আমাদের হৃদয়সমূহকে তোমার আনুগত্যের উপর আবর্তিত কর।

অন্যের কাছে কিছু চাওয়া-পাওয়ার আগে, তাঁর কাছে চান। যেহেতু তিনিই তার হৃদয়কে আপনার অনুকূলে ফিরিয়ে দেবেন।

চাকরীর জন্য কোথাও দরখাস্ত দেওয়া র আগে, তাঁর নিকট দরখাস্ত দিন। যেহেতু তিনিই কর্তৃপক্ষের মন ঘুরিয়ে আপনার দরখাস্ত মঞ্জুর করাতে পারেন।

শত্রুর শত্রুতা থেকে রক্ষা পেতে আপনি তাঁর নিকট আকূল আবেদন জানান। কারণ তিনিই তার অন্তরকে আপনার প্রতি শত্রুতা থেকে ফেরাতে পারেন।

হিংসুকের হিংসা থেকে অব্যাহতি পেতে তাঁর কাছে নিবেদন করুন। কেননা তিনিই হিংসুকের মনকে আপনার প্রতি হিংসা করা হতে বিরত রাখতে পারেন।

যালেমের জেল থেকে মুক্তি পেতে আপনি তাঁর কাছেই কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করুন, কারণ তিনিই পারেন কর্তৃপক্ষের মনকে আপনার প্রতি সদয় করতে।

যালেম স্বামীর যুলুম থেকে রেহাই পেতে আকূল মনে তাঁর কাছেই আবেদন জানান। কারণ তাঁর দুই আঙ্গুলের মাঝেই আছে আপনার স্বামীর মন। তিনিই পারেন তার মনের পরিবর্তন ঘটাতে।

অত্যাচারী শ্বশুরবাড়ির বধূনির্যাতন থেকে পরিত্রাণ পেতে আপনি তাঁর কোটেই মকদ্দমা পেশ করুন। কারণ তিনিই পারবেন শ্বশুরবাড়ির সকল লোকের মনের পরিবর্তন ঘটাতে।

অবাধ্য স্ত্রীর কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে তাঁর কাছেই অভিযোগ জানান। কারণ তিনিই পারেন তার মনকে আপনার প্রতি ভালোবাসায় পরিপূর্ণ করতে।

কারো হিদায়াত কামনা করেন? তার পিছনে প্রচেষ্টার আগে হিদায়াতের মালিকের কাছে আবেদন করেন, যেন তিনি তার মনকে হিদায়াত করেন।

যালেম মালিক বা কর্মকর্তার পীড়ন থেকে রক্ষা পেতে তাঁর কাছেই আবেদন জানান। কারণ তিনিই পারেন তার মনের অবস্থা পরিবর্তন করতে।

যালেম শাসকের শাসন থেকে রেহাই পেতে তাঁর নিকট অভিযোগ পেশ



করুন। কারণ তিনিই পারেন শাসকের নির্দয় মনকে সদয় করতে।

আধুনিক বিশ্বে ভষ্টকারী ফিতনা, বিলাসভরা লোভনীয় জীবন, নানা মত ও পথের নানা পদস্থলনকারী আহবায়ক, আকর্ষণকারী নানা কামনার জ্বালা। তাই প্রার্থনা করুন মহান প্রতিপালকের কাছে এত শত ফিতনার মাঝে আপনার হৃদয় যেন তাঁর আনুগত্যে অবিচল থাকে।

আর মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَخْلُقُ فِي جَوْفِ أَحَدِكُمْ كَمَا يَخْلُقُ الثَّوْبُ، فَاسْأَلُوا اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ)).

“অবশ্যই তোমাদের হৃদয়ে ঈমান জীর্ণ হয়; যেমন জীর্ণ হয় পুরনো কাপড়। সুতরাং তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা কর, যাতে তিনি তোমাদের হৃদয়ে তোমাদের ঈমান নবায়ন করে দেন।” (তাবারানী, হাকেম ৫, সহীহুল জামে’ ১৫৯০নং)

## মনের ভুল ও বিস্মৃতি ধর্তব্য নয়

মানব-মনের ভুল হয়। বহু বিস্মৃতির শিকার হয় তার হৃদয়। ভালো জিনিসের কথা ভুলিয়ে দেয় শয়তান। কিন্তু মহান আল্লাহ তা ধরেন না। সে ভুল তাঁর অসীম ক্ষমাশীলতার মোকাবেলায় কিছুই নয়।

ভুল মানে মনের ইচ্ছার বিপরীত যা কিছু ঘটে। যে কর্মের সাথে মনের সংযোগ থাকে না, মন চায় না অথচ তা হয়ে যায় অথবা ঠিকের বিপরীত বিশ্বাস বা ধারণা রেখে অজান্তে যা করা হয়, তা মহান আল্লাহ ক্ষমা ক’রে দেন।

শুধু কর্মেই নয়, আকীদার ভুলও তিনি ধরেন না। মহানবী ﷺ বলেছেন,  
 « أَسْرَفَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَى بَنِيهِ فَقَالَ إِذَا أَنَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِي ثُمَّ اسْحَقُونِي ثُمَّ اذْرُونِي فِي الرِّيحِ فِي الْبَحْرِ فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَّرَ عَلَى رَبِّي لَيُعَذِّبُنِي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ بِهِ أَحَدًا. قَالَ فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ فَقَالَ لِلْأَرْضِ أَدَى مَا أَخَذْتَ. فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ فَقَالَ لَهُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ فَقَالَ خَشِيتُكَ يَا رَبَّ - أَوْ قَالَ - مَخَافَتِكَ. فَغَفَرَ لَهُ بِذَلِكَ ».

“এক ব্যক্তি ছিল, যে নিজের প্রতি বড় অন্যায় (পাপ) করেছিল। অতঃপর যখন তার মৃত্যুকাল উপস্থিত হল, তখন সে তার ছেলেদেরকে বলল, ‘আমি মারা গেলে আমাকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলো। তারপর আমার

বাকি দেহাংশ পিষে বাতাসে ছড়িয়ে দিও। কেননা, আল্লাহর কসম! যদি তিনি আমাকে উপস্থিত করতে সমর্থ হন, তাহলে আমাকে এমন আযাব দেবেন যেমন আযাব তিনি আর কাউকেই দেবেন না!’ সুতরাং সে মারা গেলে তাই করা হল। আল্লাহ পৃথিবীকে আদেশ করে বললেন, ‘তোমার মাঝে (ওর যে দেহাণু আছে) তা জমা করা’ পৃথিবী তাই করল। ফলে লোকটি (আল্লাহর সামনে) খাড়া হয়ে গেল। আল্লাহ বললেন, ‘তুমি যা করেছ তা করতে তোমাকে কে উদ্বুদ্ধ করল?’ লোকটি বলল, ‘তোমার ভয়, হে আমার প্রতিপালক!’ ফলে তাকে মাফ ক’রে দেওয়া হল।” (বুখারী ৩৪৮-১, মুসলিম ২৫৬৫নং)

ইজতিহাদী ভুলও তিনি ক্ষমা করেন। বরং তাতে একটি সওয়াব প্রদান করেন।

« إِذَا حَكَّمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَّمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ».

“বিচারক যদি সুবিচারের প্রয়াস রেখে বিচার করে অতঃপর তা সঠিক হয়, তবে তার জন্য রয়েছে দুটি সওয়াব। আর সুবিচারের প্রয়াস রেখে যদি বিচারে ভুল করেও বসে, তবে তার জন্যও রয়েছে একটি সওয়াব।” (বুখারী ৭৩৫২, মুসলিম ৪৫৮৪নং)

আবু সাঈদ খুদরী রাঃ বলেন, দুই ব্যক্তি সফরে বের হল। নামাযের সময় হলে তাদের নিকট পানি না থাকার কারণে তায়াম্মুম করে উভয়েই নামায পড়ে নিল। অতঃপর ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পূর্বেই তারা পানি পেয়ে গেল। ওদের মধ্যে একজন পানি দ্বারা ওযু করে পুনরায় ঐ নামায ফিরিয়ে পড়ল। কিন্তু অপর জন পড়ল না। তারপর তারা আল্লাহর রসূল সঃ-এর নিকট এলে ঘটনা খুলে বলল। যে ব্যক্তি নামায ফিরিয়ে পড়েনি তিনি তার উদ্দেশ্যে বললেন, “তোমার আমল সুন্নাহর অনুসারী হয়েছে এবং তোমার নামাযও যথেষ্ট (শুদ্ধ) হয়ে গেছে।” আর যে ওযু করে নামায ফিরিয়ে পড়েছিল, তার উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, “তোমার জন্য ডবল সওয়াব।” (আবু দাউদ ৩৩৮, নাসাঈ ৪৩৩, দারেমী ৭৪৪, মিশকাত ৫৩৩নং)

এই জন্য উলামাগণ বলেন, কখনো কখনো বিদআতী তার দ্বীন মনে করা আমলে সওয়াব পেয়ে থাকে। যেহেতু সে নিশ্চিতরূপে জানে যে, সেটাই দ্বীন, সেটাই সুন্নাহ। মহান আল্লাহ তার নিয়ত অনুযায়ী ইজতিহাদী ভুলকে ক্ষমা ক’রে একটি সওয়াব লিপিবদ্ধ করেন।

তবে সঠিকতা জানার পর বিপরীত আমল করলে গোনাহ হবে। যেমন হাদীসে উক্ত শ্রেণীর ব্যক্তির সুন্নাহ জানার পর তার বিপরীত আমল করলে

ডবল সওয়াবের অধিকারী হওয়ার জায়গায় গোনাহগার হবে।

নির্দেশ বুঝতে ভুল ক’রে কাজ বিপরীত করলে সে ভুলও ধর্তব্য নয়। ইবনে উমার রাঃ বলেন, খন্দকের যুদ্ধ শেষে যখন নবী সঃ ফিরে এলেন, তখন তিনি আমাদেরকে বললেন, “তোমাদের মধ্যে কেউ যেন বনী কুরাইযাহ ছাড়া অন্য স্থানে (আসরের) নামায না পড়ে।” পথে চলতে চলতে আসরের সময় উপস্থিত হল। একদল বলল, সেখানে না পৌঁছে আমরা নামায পড়ব না। (কারণ, তিনি সেখান ছাড়া অন্য স্থানে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।) অপর দল বলল, বরং আমরা পথেই নামায পড়ে নেব। (কারণ, নামাযের সময় এসে উপস্থিত হয়েছে। তাছাড়া) তাঁর উদ্দেশ্য এই ছিল না যে, আসরের সময় হলেও আমরা নামায পড়ব না। (বরং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, আমরা যেন তাড়াতাড়ি বনী কুরাইযায় পৌঁছে যাই, যাতে সেখানে গিয়ে আসরের সময় হয়। ফলে প্রথম দল পথি মধ্যে নামায পড়ল না। আর দ্বিতীয় দল পড়ে নিল।) অতঃপর নবী সঃ এর নিকট ঘটনাটি খুলে বলা হলে তিনি কোন দলকেই ভর্তসনা করলেন না। (বুখারী ৯৪৬, ৪১১৯, মুসলিম ৪৭০১নং)

সঠিক মনে ক’রে কোন কাজে ভুল ক’রে ফেললে সে ভুলও ধর্তব্য নয়। মা’ন ইবনে ইয়াযীদ বলেন, আমার পিতা ইয়াযীদ দান করার জন্য কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা বের করলেন। অতঃপর তিনি সেগুলি (দান করতে) মসজিদে একটি লোককে দায়িত্ব দিলেন। আমি (মসজিদে) এসে তার কাছ থেকে (অন্যান্য ভিক্ষুকের মত) তা নিয়ে নিলাম এবং তা নিয়ে বাড়ী এলাম। (যখন আমার পিতা এ ব্যাপারে অবগত হলেন তখন) বললেন, আল্লাহর কসম! তোমাকে দেওয়ার নিয়ত আমার ছিল না। (ফলে এগুলি আমার জন্য হালাল হবে কি না তা জানার উদ্দেশ্যে) আমি আমার পিতাকে নিয়ে রসূল সঃ-এর খিদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন,

(( لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ ، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ ))

“হে ইয়াযীদ! তোমার জন্য সেই বিনিময় রয়েছে যার নিয়ত তুমি করেছ এবং হে মা’ন! তুমি যা নিয়েছ তা তোমার জন্য হালাল।” (বুখারী ১৪২২নং)

মহানবী সঃ বলেছেন,

(( قَالَ رَجُلٌ لِأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ : تُصَدِّقُ عَلَى سَارِقٍ ! فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لِأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ ؛ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ : تُصَدِّقُ

اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ ! فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ ! لَا تُصَدِّقَنَّ بِصَدَقَةٍ ،  
فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ : تُصَدِّقُ عَلَى غَنِيٍّ ؟  
فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ ! فَأَتَيْ فَقِيلَ لَهُ :  
أَمَا صَدَقْتِكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ ، وَأَمَا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا  
تَسْتَعِفُّ عَنْ زَنَاهَا ، وَأَمَا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَعْتَبِرَ فَيَنْفِقَ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ )) .

“একটি লোক বলল, ‘(আজ রাতে) আমি অবশ্যই সাদকাহ করব।’  
সুতরাং সে আপন সাদকার বস্তু নিয়ে বের হল এবং (অজান্তে) এক চোরের  
হাতে তা দিয়ে দিল। লোকে সকালে উঠে বলাবলি করতে লাগল যে,  
‘আজ রাতে এক চোরের হাতে সাদকা দেওয়া হয়েছে।’ সাদকাকারী বলল,  
‘হে আল্লাহ! তোমারই যাবতীয় প্রশংসা! (আজ রাতে) অবশ্যই আবার  
সাদকা করব।’ সুতরাং সে নিজ সাদকা নিয়ে বের হল এবং (অজান্তে) এক  
বেশ্যার হাতে তা দিয়ে দিল। সকাল বেলায় লোকে বলাবলি করতে লাগল  
যে, ‘আজ রাতে এক বেশ্যাকে সাদকা দেওয়া হয়েছে।’ সে তা শুনে আবার  
বলল, ‘হে আল্লাহ! তোমারই প্রশংসা যে, বেশ্যাকে সাদকা করা হল। আজ  
রাতে পুনরায় অবশ্যই সাদকাহ করব।’ সুতরাং তার সাদকা নিয়ে বের  
হয়ে গেল এবং (অজান্তে) এক ধনী ব্যক্তির হাতে সাদকা দিল। সকাল  
বেলায় লোকেরা আবার বলাবলি করতে লাগল যে, ‘আজ এক ধনী  
ব্যক্তিকে সাদকা দেওয়া হয়েছে।’ লোকটি শুনে বলল, ‘হে আল্লাহ!  
তোমারই সমস্ত প্রসংশা যে, চোর, বেশ্যা তথা ধনী ব্যক্তিকে সাদকা করা  
হয়েছে।’ সুতরাং (নবী অথবা স্বপ্নযোগে) তাকে বলা হল যে, ‘(তোমার  
সাদকা ব্যর্থ যায়নি; বরং) তোমার যে সাদকা চোরের হাতে পড়েছে তার  
দরুন হয়তো চোর তার চৌর্যবৃত্তি ত্যাগ ক’রে দেবে। বেশ্যা হয়তো তার  
দরুন তার বেশ্যাবৃত্তি ত্যাগ করবে। আর ধনী; সম্ভবতঃ সে উপদেশ গ্রহণ  
করবে এবং সে তার আল্লাহ প্রদত্ত ধন-সম্পদ আল্লাহর রাহে ব্যয় করবে।”  
(বুখারী ১৪২১, মুসলিম ২৪০৯নং, শব্দগুলি বুখারীর)

অনেক দানশীল মানুষই অভিযোগ করেন, তাঁরা মাদ্রাসায় যে দান  
দিচ্ছেন তা হয়তো বৃথা যাচ্ছে। কারণ মাদ্রাসায় তেমন আলেম তৈরি হয়  
না। মাদ্রাসায় পড়ে পড়ুয়ারা দুনিয়াদার হচ্ছে। দান-সাদকা খেয়ে দাড়ি চেঁছে  
দুনিয়াদারীর কাজে ফেঁসে যাচ্ছে। বেআমল হচ্ছে। দ্বীনের কাজে নিযুক্ত  
হচ্ছে না। কেউ বাধ্য হয়ে হলেও নিজের ছেলেকে মাদ্রাসায় দিচ্ছে না।  
কারণ সে ভুল করেছে, ছেলের যেন ভুল না হয়! তাই ছেলেকে পাক্কা

দুনিয়াদার ও ধনী বানানোর জন্য অর্থ ব্যয় ক’রে কেবল ইংরেজী পড়াচ্ছে।

বাস্তব অনেকটা তাই, তা বলে দানশীলদের দান বৃথা যায় না। তাঁদের নিয়তের ভিত্তিতে তা মহান আল্লাহর দরবারে কবুল হয়। তাছাড়া মাদ্রাসায় শতে না হোক, হাজারে একটাও তো আলেমের মতো আলেম তৈরি হয়। আর সেটাই অনেক। তাতেই আছে আপনার দানের সাফল্য।

ভুলবশতঃ কোন পাপ ঘটে গেলে তাও ধর্তব্য নয়।

{وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا

رَحِيمًا} (৫) سورة الأحزاب

“যে বিষয়ে তোমরা ভুল কর সে বিষয়ে তোমাদের কোন অপরাধ নেই, কিন্তু তোমাদের আন্তরিক ইচ্ছা থাকলে (তাতে অপরাধ আছে)। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (আহযাবঃ ৫)

শরীয়তের বিধানে মনের ভুল ধর্তব্য নয়। যেমন মহানবী ﷺ বলেছেন,

(( إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ ، فَأَكَلَ ، أَوْ شَرِبَ ، فَلْيَتِمَّ صَوْمَهُ ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ

وَسَقَاهُ )) . متفقٌ عَلَيْهِ

“যখন কোন ব্যক্তি ভুলবশতঃ কিছু খেয়ে বা পান করে ফেলবে, তখন সে যেন তার রোযা (না ভেঙ্গে) পূর্ণ করে নেয়। কেননা, আল্লাহই তাকে খাইয়েছেন এবং পান করিয়েছেন।” (বুখারী ১৯৩৩, ৬৬৬৯, মুসলিম ২৭৭২নং)

এইভাবে প্রত্যেক ইবাদতে ভুলের বিধান আছে। ভুলের কারণে ইবাদত বাতিল হয়ে যায় না। তবে ভুল ক’রে করা ইবাদতের শর্ত, ওয়াজেব ও সুন্নতের মাঝে পার্থক্য আছে। আর তা যথাস্থানে পরিচিত। যেমন নামাযের শর্ত বা রুক্ন ভুল ক’রে পরিত্যক্ত হলে নামায বাতিল হয়ে যায়। উযু-গোসল না ক’রে ভুলে নামায পড়ে নিলে নামায হয় না। কিন্তু বাহ্যিক দেহে বা কাপড়ে অপবিত্রতা লেগে থাকা অবস্থায় নামায পড়ে নিলে নামায হয়ে যায়। ইজতিহাদী ভুল ক’রে কিবলা ছেড়ে অন্য দিকে মুখ ক’রে নামায পড়লেও নামায হয়ে যায়। পরে সঠিক দিক জানতে পারলে আর ফিরিয়ে পড়তে হয় না। ভুলে গিয়ে ওয়াজেব ত্যাগ করলে ভুলের সিজদা দিলে নামায সঠিক হয়ে যায়। ভুলে গিয়ে সুন্নত ত্যাগ করলে ভুলের সিজদাও লাগে না।

ইহরাম অবস্থায় যে কাজ করলে ‘দম’ (কুরবানী) লাগে, ভুলবশতঃ তা ক’রে ফেললে লাগে না।

পক্ষান্তরে প্রাণহত্যার ব্যাপারটা বড় গুরুতর। সে ক্ষেত্রে ভুল কিন্তু সহজ ভুল নয়। মানুষের একটি প্রাণ। “যে তা হত্যা করল, সে যেন সারা মানব

জাতিকে হত্যা করল। আর যে তা রক্ষা করল, সে যেন সারা মানব জাতিকে রক্ষা করল।” এ ক্ষেত্রে ভুল ক’রেও হত্যাকারীকে ছাড়া হয় না। পরকালের শাস্তি থেকে রেহাই পেলেও দুনিয়ার শাস্তি থেকে রেহাই পায় না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا } (৭২) سورة النساء

“কোন বিশ্বাসীকে হত্যা করা কোন বিশ্বাসীর জন্য সংগত নয়, তবে ভুলবশতঃ হত্যা ক’রে ফেললে সে কথা স্বতন্ত্র। কেউ কোন বিশ্বাসীকে ভুলবশতঃ হত্যা করলে এক বিশ্বাসী দাস মুক্ত করা এবং তার (নিহতের) পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ করা বিধেয়। তবে যদি তারা ক্ষমা ক’রে দেয়, তাহলে ভিন্ন কথা। কিন্তু যদি সে তোমাদের শত্রু পক্ষের লোক হয় এবং বিশ্বাসী হয়, তবে এক বিশ্বাসী দাস মুক্ত করা বিধেয়। আর যদি সে এমন এক সম্প্রদায়ভুক্ত হয়, যার সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ, তবে তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ এবং এক বিশ্বাসী দাস মুক্ত করা বিধেয়। কেউ যদি (উক্ত দাস) না পায় (বা মুক্ত করার সামর্থ্য না রাখে), তাহলে সে একাদিক্রমে দু’মাস রোযা রাখবে। তওবার (সংশোধনের) জন্য এ আল্লাহর বিধান। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।” (নিসাঃ ৯২)

মনের অতিরিক্ত আনন্দে কোন ভুল কথা বলে ফেললে তা ধর্তব্য নয়। যেহেতু মনের অজান্তে উল্টাপাল্টা কথা এক শ্রেণীর উন্মাদনা। আর উন্মাদ বা পাগলের কথা ধর্তব্য নয়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((لِلَّهِ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاةٍ، فَأَنْفَلَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيْسَ مِنْهَا، فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا وَقَدْ أَيْسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ! أَخْطَا مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ)).

“নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দার তওবায় যখন সে তওবা করে

তোমাদের সেই ব্যক্তির চেয়ে বেশী খুশী হন, যে তার বাহনের উপর চড়ে কোন মরুভূমি বা জনহীন প্রান্তর অতিক্রমকালে বাহনটি তার নিকট থেকে পালিয়ে যায়। আর খাদ্য ও পানীয় সব ওর পিঠের উপর থাকে। অতঃপর বহু খোঁজাখুঁজির পর নিরাশ হয়ে সে একটি গাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ে। ইতোমধ্যে বাহনটি হঠাৎ তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে যায়। সে তার লাগাম ধরে খুশীর চোটে বলে ওঠে, ‘হে আল্লাহ! তুমি আমার দাস, আর আমি তোমার প্রভু।’ সীমাহীন খুশীর কারণে সে ভুল ক’রে ফেলে।” (বুখারী ৬৩০৯, মুসলিম ৭১৩১-৭১৩৭নং)

বলা বাহুল্য, মুখে যে খারাপ কথা বলা হয়, তা যদি হৃদয় থেকে না হয়, তাহলে তা ধর্তব্য নয়, বরং ক্ষমার। অনুরূপ মনের বিপরীত মুখে যে ভালো কথা বলা হয়, তাও উপকারী নয়। যেমন মুনাফিকদের কালেমা।

তাহলে নামাযীরা একবার ভেবে দেখবেন কি? নামাযে যা কিছু মুখে বলেন, তা কি আপনাদের মনের মোতাবেক হয়? আর অর্থ না জানার কারণে তা না হলে নামায কতটুক উপকারী হবে বলে ধারণা হয়?

মনের পাপ-চিন্তা ধর্তব্য নয়। ‘মনে কত কথা কয়।’ কত অবৈধ কল্পনা করে। মনের মণিকোঠায় কত অবৈধ প্রেমিক-প্রেমিকাকে বাসর-শয্যা দিয়ে রাখে। মনের নিভৃত কোণে কত কামনার জ্বালা! ষড়রিপুর কত বিড়ম্বনা! মনের ভিতরে যে কথা বলা হয়, তার সবটা প্রকাশ করলে লোকে ‘পাগল’ বলবে। মনের অভ্যন্তরে যা কল্পনা করা হয়, তা বাস্তবায়িত হলে নির্ঘাত অপরাধী হতে হয়। আবার সে সব কুচিন্তা ও অবৈধ কল্পনাকে বাধা দেওয়াও সহজ নয়। তাহলে সে সব কি ধর্তব্য? মহান আল্লাহ বলেন,

{لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}

(সূরা البقرة ২৮৫)

“দু্যলোকে-ভূলোকে যা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহর। বস্তুতঃ তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ, আল্লাহ তার হিসাব তোমাদের নিকট থেকে গ্রহণ করবেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে খুশী শাস্তি দেবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।” (বাক্বারাহঃ ২৮-৪)

তাহলে তো সর্বনাশ! কে রক্ষা পাবে তাহলে?

যখন উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন সাহাবায়ে কেরাম বড়ই বিচলিত হয়ে পড়েন। তাঁরা রসূল ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজি পেশ

ক’রে বলেন, হে আল্লাহর রসূল! নামায-রোযা এবং যাকাত ও জিহাদ ইত্যাদি যে সমস্ত আমল করার নির্দেশ আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, তা আমরা করছি। কারণ, এ কাজগুলো আমাদের সামর্থ্যের বাইরে নয়। কিন্তু অন্তরে যেসব খেয়াল ও কুমন্ত্রণার সৃষ্টি হয় তার উপর তো আমাদের কোন এখতিয়ার নেই। সেগুলো তো মানুষের শক্তির বাইরের জিনিস। অথচ মহান আল্লাহ তারও হিসাব নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। নবী করীম ﷺ বললেন, ‘আপাতত তোমরা বল, আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম।’ এরপর সাহাবাদের শোনার ও মানার উদ্দীপনা দেখে মহান আল্লাহ উক্ত আয়াতকে পরবর্তী (এক আয়াত পরের) আয়াত দ্বারা মানসুখ (রহিত) ক’রে দিলেন। (ইবনে কাসীর ও ফাতহুল ক্বাদীর)

বুখারী-মুসলিম এবং অন্যান্য সুনান গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসটিও এর সমর্থন করে, “অবশ্যই আল্লাহ আমার উম্মতের অন্তরে উদীয়মান খেয়ালের কোন বিচার করবেন না, যে পর্যন্ত না তা কাজে পরিণত করবে অথবা মুখে উচ্চারণ করবে।” (বুখারী ২৫২৮, মুসলিম ১২৭নং) এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অন্তরে উদিত খেয়ালের কোন হিসাব হবে না। কেবল সেই খেয়ালের হিসাব হবে, যা কাজে পরিণত করা হবে।

অবশ্য উক্ত আয়াতের ব্যাপারে ইমাম ইবনে জারীরের বিপরীত মন্তব্য রয়েছে। তাঁর খেয়াল হল, আয়াতকে রহিত করা হয়নি। কেননা, হিসাব হলেই যে শাস্তি হবে, তা জরুরী নয়। অর্থাৎ, এটা জরুরী নয় যে, মহান আল্লাহ যারই হিসাব নেবেন, তাকেই শাস্তি দেবেন। বরং তিনি হিসাব তো প্রত্যেকেরই নেবেন, কিন্তু অনেক মানুষ এমনও থাকবে, যাদের হিসাব নেওয়ার পর আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ক’রে দেবেন। কিছু লোকের সাথে তো এমনও ব্যবহার করা হবে যে, তাদের একটি একটি পাপকে স্মরণ করিয়ে স্বীকারোক্তি নিয়ে বলবেন, দুনিয়ায় এই পাপগুলিকে আমি গোপন করে রেখেছিলাম। যাও, আজ এগুলিকে আমি মাফ ক’রে দিলাম। (ইবনে কাসীর)

কোন কোন উলামা বলেছেন, এখানে ‘নাসখ’ (রহিত করণ) পারিভাষিক অর্থে বলা হয়নি, বরং কখনো কখনো ‘নাসখ’ ব্যবহার করা হয় কোন জিনিসকে আরো পরিষ্কারভাবে বিশ্লেষণ ক’রে দেওয়ার অর্থে। তাই সাহাবাদের অন্তরে এই আয়াত থেকে যে আশঙ্কা ও সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিল সেটাকে দূর ক’রে দেওয়া হল পরবর্তী আয়াত এবং “অবশ্যই আল্লাহ আমার উম্মতের অন্তরের খেয়ালের বিচার করবেন না---।” এই হাদীস দ্বারা। এভাবে উভয় আয়াতের একটিকে ‘নাসিখ’ এবং অপরটি ‘মানসুখ’ ভাবার কোন প্রয়োজন হবে না। (আহসানুল বায়ান)



পরবর্তী (এক আয়াত পরের) আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন,  
 {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا  
 تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن  
 قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفُ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا  
 فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} (সূরা البقرة ২৮৬)

“আল্লাহ কাউকেও তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন না। যে  
 ভাল উপার্জন করবে সে তার (প্রতিদান পাবে) এবং যে মন্দ উপার্জন  
 করবে, সে তার (প্রতিফল পাবে)। হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা  
 বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি, তাহলে তুমি আমাদেরকে অপরাধী করো না।  
 হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তিগণের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব  
 অর্পণ করেছিলে, আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না। হে  
 আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করো না, যা বহন  
 করার শক্তি আমাদের নেই। তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর, আমাদের পাপ  
 মোচন কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমি আমাদের অভিভাবক।  
 অতএব সত্য প্রত্যাখ্যানকারী (কাফের) সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে  
 (সাহায্য ও) জয়যুক্ত কর।” (বাক্বারাহঃ ২৮৬)

আল-হামদু লিল্লাহ। মহান করুণাময়ের লাখো শুকরিয়া। তিনি বড়  
 বোঝা হাক্ক ক’রে দিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন,

{وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ}

“আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না এবং আমার  
 নিকট আছে এক গ্রন্থ; যা সত্য ব্যক্ত করে এবং তাদের প্রতি যুলুম করা  
 হবে না।” (মু’মিনুনঃ ৬২)

বিশেষ ক’রে সৎশীল মু’মিনদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। মহান আল্লাহ  
 বলেছেন,

{وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ

الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (সূরা الأعراف ৪২)

“আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না। যারা বিশ্বাস করে  
 ও সৎকাজ করে, তারাই হবে জান্নাতবাসী, সেখানে তারা চিরকাল  
 থাকবে।” (আ’রাফঃ ৪২)

আর মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثْتُ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ)).

“নিশ্চয় মহান আল্লাহ আমার উম্মতের সে কথাকে অতিক্রম করেন, যা তারা মনের সাথে বলে; যতক্ষণ না তারা তা কাজে পরিণত করে অথবা মুখে প্রকাশ করে।” (বুখারী ২৫২৮, ৫২৬৯, মুসলিম ৩৪৬নং, সুনান আরবাআহ)

এই জন্য মনের ভিতরে কৃত ব্যভিচার ক্ষমার্ত্ত হয়। (তার মানে করা যাবে, তা নয়।) মনে মনে দেওয়া তালুক ধর্তব্য নয়। মনে মনে কুফরী চিন্তায় কেউ কাফের হয় না।

আবু হুরাইরা রাঃ বলেন, একদল সাহাবা রাসূলুল্লাহ সঃ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, ‘আমরা আমাদের মনের ভিতরে এমন কথা হয়, যা আমাদের কেউ তা মুখে বলতে বিশাল মনে করে।’ তিনি বললেন, “তোমরা কি তা পেয়ে থাকো?” তাঁরা বললেন, ‘জী, হ্যাঁ।’ তিনি বললেন, « ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ ».

অর্থাৎ, এটাই হল স্পষ্ট ঈমান। (মুসলিম ৩৫৭নং)

অর্থাৎ, এমন বিশাল মনে করা স্বচ্ছ ও পূর্ণ ঈমানের পরিচয়। মনে এমন কল্পনা ও কুমন্ত্রণা শয়তানের পক্ষ থেকে আসবে। আর তা মনে স্থান না দিয়ে উপেক্ষা করলে কোন ক্ষতি হবে না। তিনি আরো বলেছেন,

« لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَالَ هَذَا خَلَقَ اللَّهُ الْخُلُقَ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ: آمَنْتُ بِاللَّهِ ».

“মানুষ (মনে মনে) প্রশ্ন করতে থাকবে। পরিশেষে বলা হবে, এ সৃষ্টিকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে? সুতরাং যে কেউ এমন কল্পনা অনুভব করবে, সে যেন বলে, ‘আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি।’ (বুখারী ৭২৯৬, মুসলিম ৩৬০, ৩৬৮নং)

অভ্যাসগতভাবে বা মুদ্রাদোষে যে ভুল কথা বলা হয়, তাও ধর্তব্য নয়। মহান আল্লাহ কসম সন্মুখে বলেন,

{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ} (سورة البقرة ২২০)

“তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না। কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য দায়ী করবেন। আর আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, বড় সহিষু।” (বাক্বারাহঃ ২২৫)

{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} (৮৭)

“আল্লাহ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য, কিন্তু যে সব শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কর, সেই সকলের জন্য তিনি তোমাদেরকে দায়ী করবেন।” (মায়িদাহঃ ৫৮৯)

যালেমের পক্ষ থেকে কোন পাপ করতে বাধ্য হলে এবং মনে পাপ না থাকলে তাও ধর্তব্য নয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ وَلَكِنْ مَنْ

شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (النحل ১০৬)

“কেউ ঈমান আনার পরে আল্লাহর সাথে কুফরী করলে এবং কুফরীর জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার উপর আপতিত হবে আল্লাহর ক্রোধ এবং তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি; তবে তার জন্য নয়, যাকে কুফরীতে বাধ্য করা হয়েছে, অথচ তার চিত্ত ঈমানে অবিচল।” (নাহলঃ ১০৬)

এই জন্য ধর্মিতা নারীর পাপ থাকে না। যেহেতু তার মনে সে পাপের ইচ্ছা থাকে না। কিন্তু ‘বাধা দিতে না পারলে উপভোগ কর’---এই দর্শন যদি কেউ প্রয়োগ করে, তাহলে নিশ্চয় তার পাপ লিপিবদ্ধ হয় এবং সে অন্যায়ে শরীক হয়ে যায়।

অনুরূপ বাধ্য হয়ে অনিচ্ছায় কোন ভালো কাজ করলেও তা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

কারো চাপে পড়ে নামায পড়লে, দান করলে বা হজ্জ করলে গ্রহণ যোগ্য নয়।

জোরপূর্বক বিবাহ দিলে, সে বিবাহ শুদ্ধ নয়। যেমন জোর ক’রে নেওয়া তালাকও শুদ্ধ নয়।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ ، وَالنَّسْيَانَ ، وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ)).

“নিশ্চয় মহান আল্লাহ আমার উম্মতের ভুল, বিস্মৃতি এবং যার উপর তাকে নিরুপায় করা হয়, তার (পাপ)কে মার্জনা করেন।” (ইবনে মাজাহ ২০৪৫নং, বাইহাকী, ত্বাবারানী, ইবনে হিব্বান)



## মনের বিরতি

অচেতন না হলে মনের কোন বিরতি নেই। মনকে কাজে না লাগালেও সে কাজ ক’রে যায়। কম্পনা ও খেয়ালের জাল বুনে যায়। পরন্তু তাকে কাজে লাগালে অথবা কাজে মনোযোগ দিলে সে ক্লান্তিবোধ করে। গতানুগতিক কাজে নিরবিচ্ছিন্নভাবে ব্যাপ্ত থাকলে মনে একঘেয়েমি সৃষ্টি হয়। আর তার ফলে কাজে আলস্য, অবজ্ঞা, অবহেলা, বিরক্তি, অনীহা, আগ্রহহীনতা, অরুচি, স্পৃহাহীনতা ইত্যাদি সৃষ্টি হয়। এই জন্য উচিত, মনকে একটু বিরতি দেওয়া, একটা বিশ্রাম দেওয়া। বরং একটু আনন্দ দিয়ে চাঙ্গা ক’রে নেওয়া।

ঘুমালে যেমন মানুষের দেহাঙ্গে স্ফূর্তি ফিরে আসে, ক্ষয়িষ্ণু শক্তি নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে, তেমনি মনকেও রেস্ট দেওয়ার প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে তাকে উজ্জীবিত করার।

একটানা পড়াশোনা করার ফাঁকে একটু খেলাধুলা করা পড়াশোনার জন্যই বড় উপকারী।

একটানা ইবাদত ক’রে যাওয়ার মাঝে একটু মনকে বিরতি দেওয়া ইবাদতে বড় উপকারী।

ঘুমাবার সময় ঘুমালে বিরতি হয়ে যায়। কিন্তু মনকে আনন্দ দিয়ে উজ্জীবিত করতে কী করা যায়?

না, শরীয়তে যা অবৈধ, তা করা যাবে না। তবে যা বৈধ ও অনুমোদিত, তা করা যায়।

যেমন মহান আল্লাহ দেশ-ভ্রমণ করতে বলেছেন উপদেশ গ্রহণের জন্য। তিনি বলেছেন,

{أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا}

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ { (৬১) الحج

“তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতি-শক্তিসম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হতে পারত। বস্তুতঃ চক্ষু তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়।” (হাঙ্ক ৪৬)

দেশ-ভ্রমণের ফলে যেমন মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি হয়, মনকে আনন্দ দেওয়া হয়, তেমনি নিজ কর্মে নতুনভাবে মন বসে। কাজের একঘেয়েমি দূরীভূত হয়। মনের উদ্দীপনা নবায়িত হয়।

মনকে উদ্দীপিত করার লক্ষ্যে বৈধ খেলা খেলা যেতে পারে :-

যাতে জিহাদী প্রশিক্ষণ হয়, যেমন তীরন্দাজি খেলা বা ঘোড়দৌড় খেলা।  
যাতে প্রাণ রক্ষা হয় বা শরীরচর্চা হয়, যেমন সাঁতার খেলা, ফুটবল,  
হাডুডু বা ক্রিকেট খেলা।

যাতে দাম্পত্যের সম্পর্ক মধুর হয়, যেমন স্ত্রীর সাথে বসে রোমান্স  
ইত্যাদি করা।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ لَهُوٌ أَوْ سَهْوٌ إِلَّا أَرْبَعٌ خِصَالٌ :  
مَشْيُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ ، وَتَأْدِيبُهُ فَرَسَهُ ، وَمُلاَعَبَةُ أَهْلِهِ ، وَتَعَلُّمُ السَّبَاحَةِ)).

“প্রত্যেক সেই জিনিস (খেলা) যা আল্লাহর স্মরণের পর্যাযভুক্ত নয়, তা  
অসার ভ্রান্তি ও বাতিল। অবশ্য চারটি কর্ম এরূপ নয়; হাতের নিশানা ঠিক  
করার উদ্দেশ্যে তীর খেলা, ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দেওয়া, নিজ স্ত্রীর সাথে  
প্রেমকেলি করা এবং সাঁতার শিক্ষা করা।” (নাসাঈর কুবরা ৮৯৩৮-৮৯৪০,  
তাবারানীর কাবীর ১৭৬০, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩ ১৫নং)

তীরন্দাজির ব্যাপারে মহানবী ﷺ বলেছেন,

((عَلَيْكُمْ بِالرَّمْيِ فَإِنَّهُ خَيْرٌ أَوْ مِنْ خَيْرٍ لَهُوَكُمْ)).

অর্থাৎ, তোমরা নিক্ষেপ-খেলা করতে থাকো। যেহেতু তা তোমাদের  
সর্বশ্রেষ্ঠ খেলা। অথবা তা সর্বশ্রেষ্ঠ খেলাসমূহের অন্যতম। (বাযযার,  
তাবারানীর আওসাত, সঃ তারগীব ১২৮-১২৯)

আর স্ত্রীর ব্যাপারে মহানবী ﷺ আমাদের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। তিনি বলেছেন,

((حُبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النَّسَاءِ وَالطَّيِّبُ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ)).

“তোমাদের দুনিয়ার মধ্যে আমার কাছে স্ত্রী ও খোশবুকে প্রিয় করা  
হয়েছে। আর নামাযকে করা হয়েছে আমার চক্ষুশীতলতা।” (আহমাদ  
১২২৯৩, নাসাঈ ৩৯৩৯, হাকেম ২৬৭৬, সহীহুল জামে’ ৩ ১২৪নং)

যে সকল খেলা নিয়ে মনকে ফ্রি করা যায়, তার মধ্যে স্ত্রী হল অন্যতম।  
এই জন্য বিবাহ করা হল অর্ধেক দ্বীন। আদর্শ স্ত্রী হল মহান স্রষ্টার সবচেয়ে  
বড় উপহার। আর ভালো স্ত্রী সে, যে তার স্বামীকে আল্লাহর ইবাদত ও  
আনুগত্যে সম্যক সহযোগিতা করে।

যথাসময়ে স্ত্রী নিয়ে আনন্দ করা ইসলামে বৈধ। যেহেতু সে আনন্দদায়িনী  
মনকে চাপা করে, চরিত্রকে সুন্দর করে, আল্লাহর ইবাদতে অনুপ্রাণিত  
করে, দুনিয়া ও আখেরাতের কাজে স্বামীকে অধিক মনোযোগী করে।

মনে শান্তি না থাকলে কোন কাজে মন বসে না। মনে কামনার জ্বালা  
থাকলে সকল কাজে অমনোযোগিতা ও উদাসীনতা আসে। সে ক্ষেত্রে

অর্ধাঙ্গিনী হল দেহাঙ্গ ও মন-প্রাণের প্রশান্তি। সঙ্গিনী সৃষ্টির কারণ বর্ণনায় মহান আল্লাহ বলেছেন,

{هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا} (১৮৭)

“তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে সে তার নিকট শান্তি পায়।” (আ’রাফঃ ১৮৬)

{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (২১) سورة الروم

“তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে আর একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা ওদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও মায়ামমতা সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।” (রুমঃ ২১)

সেই শান্তি পাওয়া গেলে ঘরে শান্তি পাওয়া যায়, বাইরে শান্তি পাওয়া যায়, দেহে শান্তি পাওয়া যায়, মনে শান্তি পাওয়া যায়। আর তার ফলে দুনিয়া ও আখেরাতের কাজে নৈপুণ্য ও সাফল্য আসে।

আনন্দদায়িনীর সাথে আনন্দ করার নমুনা রয়েছে আমাদের মহানবী ﷺ-এর আদর্শ জীবনে।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, ‘একদা এক সফরে আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে ছিলাম। এক জায়গায় আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করলাম এবং তাতে আমি তাঁকে হারিয়ে দিলাম। অতঃপর যখন আমি মোটা হয়ে গেলাম, তখন একবার প্রতিযোগিতা করলাম এবং তিনি আমাকে হারিয়ে দিলেন এবং বললেন এটা হল পূর্বের (প্রতিযোগিতার) উত্তর।’ (আবু দাউদ ২৫৮০নং)

তিনি আরো বলেন, একদা সাওদা বিনতে যামআ’ আমার সাথে দেখা করতে আমার বাসায় এলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ও আমার মাঝখানে বসে গেলেন। তাঁর একটি পা আমার কোলে, আর একটি পা সাওদার কোলে ছিল। আমি তার (সাওদার) জন্য ‘খাযীরা’ (গোশত ছোট ছোট করে কেটে তাতে আটা মিশিয়ে রান্না করা খাবার) তৈরী করলাম। অতঃপর তাকে খেতে বললে সে খেতে অস্বীকার করল। আমি বললাম, ‘তুমি অবশ্যই খাবে, নচেৎ আমি তোমার মুখে তা লেপে দেব।’ সে অস্বীকার করলে আমি প্লেট থেকে সামান্য পরিমাণ নিয়ে তার মুখে লেপে দিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কোল থেকে স্বীয় পা সরিয়ে নিলেন, যাতে সে আমার কাছ থেকে

বদলা নিতে পারে। অতঃপর আমি প্লেট থেকে আরো কিছু নিয়ে আমার মুখে লেপে নিলাম। তা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসতে লাগলেন। ইত্যবসরে উমার ؓ উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলেন, ‘হে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার! হে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার!’ তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বললেন, “তোমরা উঠে তোমাদের মুখ ধুয়ে নাও, আমার মনে হয় উমার প্রবেশ না করে ছাড়বে না।” (নাসাঈ কুবরা ৮৯১৭, সিঃ সহীহাহ ৩১৩১নং)

অনেক সময় বৈধ খেলা দেখেও মনকে আনন্দ দেওয়া যায়। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, একদা হাবশীরা বর্শা-বল্লম নিয়ে মসজিদে খেলা করছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “হে হুমাইরা! তুমি কি ওদের খেলা দেখতে চাও?” আমি বললাম, ‘হ্যাঁ।’ তখন তিনি দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি আমার থুতনিকে তাঁর কাঁধের উপর রাখলাম এবং আমার চেহারাকে তাঁর গালের সাথে লাগিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। (বেশ কিছুক্ষণ দেখার পর) তিনি বললেন, “যথেষ্ট হয়েছে, চল এবারে।” আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল! তাড়াতাড়ি করবেন না।’ তাই তিনি আমার জন্য আবারও দাঁড়িয়ে গেলেন। অতঃপর আবার বললেন, “যথেষ্ট হয়েছে, চল এবারে।” আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল! তাড়াতাড়ি করবেন না।’ আমার যে তাদের খেলা দেখার খুব শখ ছিল তা নয়, বরং আমি কেবল তাঁর অন্যান্য স্ত্রীদেরকে এ কথাটা জানিয়ে দিতে চাইছিলাম যে, আমার কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কতটা মর্যাদা ছিল এবং তাঁর কাছে আমার কতটা কদর ছিল। (নাসাঈ কুবরা ৮৯৫১, মুসলিম ২১০০-২১০৫নং)

মনকে ফ্রি করার জন্য সঙ্গী-সাথীর সাথে একটু মস্করা করা যায়। মহানবী ﷺ সাহাবাদের কখনো কখনো মস্করা করতেন। তাঁরা বলতেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাদের সাথে মস্করা করছেন?’ উত্তরে তিনি বলতেন, “(হ্যাঁ তবে) নিশ্চয় আমি সত্য কথাই বলি।” (তিরমিযী ১৯৯০, সিঃ সহীহাহ ৭২৬নং)

একঘেয়েমি কাটানোর জন্য শিশুদের সাথেও মস্করা ও হাসি-খুশি করা যায়।

বলা বাহুল্য, মনকে সক্রিয় করার জন্য কিছু আনন্দদায়ক জিনিসের প্রয়োজন। তা না হলে মন ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আবুদ দারদা ؓ বলেছেন, ‘আমি কিছু খেলা দ্বারা আমার মনকে বিশ্রাম দিই। যাতে হকের জন্য তা আমার কাছে বেশি শক্তিশালী হয়।’

ইবনে মাসউদ ؓ বলেছেন, ‘তোমার হৃদয়কে (কোন কাজে) বাধ্য করো না। কারণ, বাধ্য করলে হৃদয় অন্ধ হয়ে যায়।’ (জামেউ বায়ানিল ইল্ম ১/১০৪)

## মানুষের মন ও স্বপ্ন

মানুষের মনের একটি মানসপট আছে, যাতে জাগ্রত অবস্থায় অনেক ছবি দর্শন করা যায়। কল্পনা ও খেয়ালের তুলি দিয়ে সেই পটে কত ছবি আঁকা হয়। ঘুমন্ত অবস্থাতেও সে মানসপটে ভালো-মন্দ অনেক ছবি অঙ্কিত হয়, অনেক দৃশ্য প্রদর্শিত হয়; যাকে আমরা স্বপ্ন বলি।

শরীয়তের দৃষ্টিতে সে স্বপ্ন হয় ৩ প্রকার :-

### ১। মনের কল্পনা

মানুষ মনের ভিতর যেটা বেশি কল্পনা করে, তার ধ্যান ও খেয়াল যা নিয়ে বেশি বিচরণ করে, সেই জিনিসকে সে স্বপ্নে দেখতে পায়। সুতরাং যে জিনিসকে সে বেশি ভয় করে অথবা ভালোবাসে অথবা আশা করে অথবা ঘৃণা করে, সেই জিনিস সে স্বপ্নে দেখে।

অনেক সময় শরীরের প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী, যেমন পেট খারাপ, ক্ষুৎ-পিপাসা ইত্যাদির কারণে মেজাজ অনুযায়ী স্বপ্ন দেখা হয়। আর সে সকল স্বপ্ন হয় আবোল-তাবোল নিরর্থক। তবে যাদের মন সুন্দর হয়, তারা সুন্দর স্বপ্ন দেখে এবং যাদের মন অসুন্দর ও নোংরা হয়, তারা তাদের মন অনুসারে খারাপ ও নোংরা স্বপ্ন দেখে থাকে।

### ২। শয়তানী প্রদর্শন

দ্বিতীয় প্রকার স্বপ্ন শয়তান দ্বারা প্রদর্শিত হয়। যেহেতু সে মানুষের শত্রু, তাই মানুষকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পায়। সে মানুষের রক্তশিরায় প্রবাহিত হতে পারে। মানুষের মনে এমন কিছু সৃষ্টি করতে পারে, যাতে মানুষ কষ্ট পায়, দুঃখ পায় এবং আল্লাহর ইবাদতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এমন স্বপ্ন দেখায়, যা করলে মহান স্রষ্টার অবাধ্যতা হয় এবং তার পূজা হয়।

### ৩। ইলাহী প্রদর্শন

এই প্রকার স্বপ্ন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ মানুষকে দেখানো হয়। যার ব্যাখ্যা হয়, অর্থ হয়। তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ হয়, সতর্কতা হয় অথবা প্রেরণা হয়।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(( لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّبُوءَةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ )) قَالُوا : وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ ؟ قَالَ : (( الرُّؤْيَا

الصَّالِحَةُ )) . رواه البخاري

“সুসংবাদ ছাড়া নবুঅতের কিছু বাকি থাকবে না।” লোকেরা প্রশ্ন করল,



‘সুসংবাদ কী?’ তিনি বললেন, “সুস্বপ্ন।” (বুখারী ৬৯৯০নং)

ইহকালে স্বপ্নের মাধ্যমেই মু’মিনরা সুসংবাদ পায়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} (سورة يونس ٦٤)

“তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে পার্থিব জীবনে।” (ইউনুসঃ ৬৪)

সুস্বপ্ন সম্বন্ধে মহানবী ﷺ আরো বলেছেন,

(( إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ تَكْذِبٌ ، وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ )) . متفقٌ عَلَيْهِ

وفي رواية : (( أَصْدَقُكُمْ رُؤْيَا ، أَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا )) .

“(কিয়ামতের) নিকটবর্তী যুগে মু’মিনের স্বপ্ন মিথ্যা হবে না। আর মু’মিনের স্বপ্ন নবুঅতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।” (অর্থাৎ, মু’মিন স্বপ্ন যোগে ভবিষ্যতের খবর জানতে পারে। যেমন, অহীর দ্বারা পয়গম্বরদেরকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অবহিত করা হত।) (বুখারী ৭০১৭, মুসলিম ৬০৪২নং)

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “আর তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি সত্য কথা বলে, তার স্বপ্ন সবচেয়ে বেশি সত্য।”

সত্যবাদী নেককার লোকেরাই আল্লাহর পক্ষ থেকে ভালো স্বপ্ন দেখে থাকে। তারাই দেখে তাদের ভক্তিভাজন নবী ﷺ-কে। তিনি বলেছেন,

(( مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتِمَثَّلُ فِي صُورَتِي وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ )) .

“যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখে সে সত্যই আমাকে দেখে। কারণ শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আমার সম্বন্ধে মিথ্যা বলে সে যেন নিজের বাসস্থান জাহান্নামে করে নেয়।” (বুখারী ১১০, ৬১৯৭নং)

তিনি আরো বলেছেন,

(( إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا ، فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ، فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهَا ، وَلْيُحَدِّثْ بِهَا - وَفِي رِوَايَةٍ : فَلَا يُحَدِّثُ بِهَا إِلَّا مَنْ يُحِبُّ - وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ ، فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا ، وَلَا يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ ؛ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ )) .

“যখন তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি এমন স্বপ্ন দর্শন করে যা তার কাছে

প্রীতিকর, তখন তা নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে (দেখানো) হয়। সুতরাং সে যেন তার জন্য আল্লাহর প্রশংসা করে এবং সে তা (স্বপ্ন) ব্যক্ত করে।” অন্য বর্ণনায় আছে যে, “সে যেন তা তার প্রিয়জন ছাড়া অন্য কারো কাছে ব্যক্ত না করে। আর যখন তাছাড়া কোন অপ্রীতিকর স্বপ্ন দর্শন করে, তখন তা নিঃসন্দেহে শয়তানের পক্ষ থেকে (দেখানো) হয়। সুতরাং সে যেন তার অনিষ্ট থেকে (আল্লাহর নিকট) আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং কাউকে তা ব্যক্ত না করে। কেননা, (তাহলে) তা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।” (আহমাদ ১১০৫৪, বুখারী ৬৯৮৫, ৭০৪৫)

মনের মানুষ অথবা জ্ঞানী মানুষ ছাড়া অন্য কাউকে দেখা স্বপ্ন বলতে হয় না। দিনে বা রাতের যে কোন সময়ে দেখা স্বপ্ন এক রকম হয় না। মহানবী ﷺ তিন প্রকার স্বপ্নের কথাই বলেছেন,

((الرُّؤْيَا ثَلَاثَةٌ فَبَشَرَى مِنْ اللَّهِ وَحَدِيثُ النَّفْسِ وَتَحْوِيفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ...)).

“স্বপ্ন হল তিন প্রকার : আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ, মনের কল্পনা এবং শয়তানের ভীতিপ্রদর্শন।” (আহমাদ ৯১২৯, ইবনে মাজাহ ৩৯০৬নং)

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “শয়তানের পক্ষ থেকে ভয়ানক স্বপ্ন, যার দ্বারা সে আদম-সন্তানকে দুঃখ-কষ্ট দিয়ে থাকে।” (ইবনে মাজাহ ৩৯০৭নং)

সুতরাং শয়তানী স্বপ্ন মানুষকে বলতে হয় না। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেছেন,

« لَا يُحَدِّثَنَّ أَحَدُكُمْ بِتَلْعَبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي مَنَامِهِ ».

“তোমাদের মধ্যে যেন কেউ তার স্বপ্নের মধ্যে শয়তানের খেলার কথা কারো নিকট অবশ্যই বর্ণনা না করে।” (মুসলিম ৬০৬৩নং)

খারাপ স্বপ্ন দেখার পর কী করতে হয়, সে সম্বন্ধে মহানবী ﷺ বলেছেন,

((الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ - وفي رواية : الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ - مِنَ اللَّهِ ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ شِمَالِهِ ثَلَاثًا ، وَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ ؛ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ)). متفقٌ عَلَيْهِ

“সুস্বপ্ন (অন্য এক বর্ণনায় আছে) সুন্দর স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং কুস্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে (দেখানো) হয়। অতএব যে অপ্রীতিকর কিছু দেখবে, সে যেন তার বাম দিকে তিনবার হাল্কাভাবে থুথু মারে ও শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। তাহলে তা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।” (বুখারী ৫৭৪৭, মুসলিম ৬০৩৪নং)

((إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا، فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا ، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ

الشَّيْطَانُ ثَلَاثًا ، وَلَيَحْوِلَنَّ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ )) . رواه مسلم

“যখন তোমাদের কেউ তার অপছন্দনীয় কোন স্বপ্ন দেখবে, তখন সে যেন তার বাম দিকে তিনবার থুথু মারে এবং শয়তান থেকে তিনবার আশ্রয় প্রার্থনা করে। আর যে পার্শ্বে সে শুয়ে থাকে, সে পার্শ্ব যেন বদল ক’রে নেয়।” (মুসলিম ৬০৪১নং)

অতঃপর মন থেকে তা মুছে ফেলে আপন কাজে অবিচল থাকা উচিত এবং মনের মধ্যে কোন অশুভ চিন্তা বা বিপদের আশঙ্কা রাখা উচিত নয়। অবশ্য ভালো স্বপ্ন হলে তা দেখে আশাবাদী হওয়া ভালো।

## স্বাধীন হৃদয় বা মুক্তমন

এমন কোন মন নেই, যে মন স্বাধীন চিন্তা করতে পারে, মুক্তমনে যা আসে তাই অবাধে অকপটে বলতে পারে।

মনের ভিতরে যে সকল কথার উদয় হয়, সব যদি মানুষ প্রকাশ করে, তাহলে লোকে তাকে পাগল বলবে---এটাই হল বাস্তব।

ইসলাম মানুষের ব্যক্তি-স্বাধীনতা খর্ব করে না। ইসলাম কোন পরাধীন জীবন অতিবাহিত করতে আহ্বান করে না। অবশ্য স্বেচ্ছাচারিতায় বাধা দিয়ে সৃষ্টিকর্তার আনুগত্যপূর্ণ সুশৃঙ্খলময় জীবন গড়তে আদেশ করে। সকল প্রকার স্বাধীনতাকে সুবিনাস্ত ও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করে। স্বাধীনতা যাতে স্বৈরাচারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতায় বদলে না যায়, তার বিশেষ নির্দেশনা দান করে। যাতে সীমা ও শৃঙ্খলহীন স্বাধীনতার জীবনে এক ব্যক্তির স্বাধীনতা অপর ব্যক্তির স্বাধীনতার সাথে সংঘর্ষ না বাধায়। কারণ, যে ব্যক্তি সীমাহীন সর্বপ্রকার স্বাধীনতা চাইবে, নিশ্চয় সে ব্যক্তি অন্যের স্বাধীনতা হরণ ও খর্ব করবে। যেহেতু, তাছাড়া পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ সম্ভবই নয়। পরন্তু তা লাভ করতেই হলে সমগ্র স্বাধীনতার মাঝে সংঘাত সৃষ্টি হবে এবং তারপরই সৃষ্টি হবে নানা বিঘ্ন ও বিশৃঙ্খলা।

সুতরাং বাক-স্বাধীনতা বা ব্যক্তি-স্বাধীনতা, যাই বলুন না কেন, তা কিন্তু শৃঙ্খলবিহীন নয়।

আসলে ইসলাম চায়, মানুষের জীবনকে শৃঙ্খলা ও সীমাবদ্ধ করতে। তাই তো মহান আল্লাহ দ্বিনী হুকুম-আহকামকে ‘হুদূদ’ বা সীমারেখা বলে অভিহিত করেছেন। কাজ হারাম হলে বলা হয়েছে,

{ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ }

“এগুলি আল্লাহর সীমারেখা; সুতরাং এর ধারে-পাশে যেয়ো না। এভাবে

আল্লাহ মানুষের জন্য তাঁর নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা সাবধান হয়ে চলতে পারে।” (বাক্বারাহঃ ১৮-৭)

আর ওয়াজেব হলে বলা হয়েছে,

{ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ }

“এ সব আল্লাহর সীমারেখা। অতএব তা তোমরা লংঘন করো না। আর যারা আল্লাহর (নির্দিষ্ট) সীমারেখা লংঘন করে, তারাই অত্যাচারী।” (বাক্বারাহঃ ২২৯)

শৃঙ্খলা ও নিয়মধারার অনুবর্তী হয়ে চলা এ বিশ্বের সর্বক্ষেত্রে নিত্য-ঘটিত, স্বাভাবিক ও বাঞ্ছিত ব্যাপার। মানুষও প্রকৃতিগতভাবে এই নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীনস্থ। মানুষ তাতে স্বাধীন নয়।

মানুষ ক্ষুৎ-পিপাসার বশবর্তী এবং পান-ভোজনের মুখাপেক্ষী। নিয়মিত ও পরিমিত পরিমাণে উপযুক্ত গুণসম্পন্ন পানাহার করতে বাধ্য থাকে। যাতে সে নিজের স্বাস্থ্যের সুরক্ষা করতে পারে। কিন্তু স্বেচ্ছামত চললে অসুস্থতা ও বিভিন্ন ব্যাধির জন্ম হয়।

যেমন মানুষ সামাজিক রীতি-নিয়মের অনুবর্তী, স্বদেশী চাল-চলন, আবাস-লেবাস প্রভৃতির অনুরক্ত। এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাতায়াতের ব্যাপারে পাশপোর্ট-ভিসার নিয়ম, স্বদেশী আইন-কানুন, ট্রাফিক-কানুন প্রভৃতির অনুগত। এ ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতা চালালে সমাজে ঘৃণ্য হতে হয়, আইন-লংঘনের প্রতিফল ভোগ করতে হয়। পথিমধ্যে বিপদগ্রস্ত হতে হয়।

সুতরাং বিশ্ব-সংসারই নির্ধারিত সীমারেখা ও নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীন। আর এর ফলেই বাঞ্ছিত মতে সকলের জীবন ও কাজকর্ম চলে। অতএব সামাজিক কল্যাণ লাভ করতে এবং বিশৃঙ্খলা ও বিঘ্ন দূর করতে সকল মানুষের জন্য মানব-রচিত সামাজিক রীতি-নীতির বাধ্য থাকা যদি জরুরী হয়, তাহলে অনুরূপভাবে উম্মাহর কল্যাণের জন্য এবং সার্বিক মঙ্গল আনয়নের জন্য সকল মানুষের পক্ষে স্রষ্টার প্রেরিত শরীয়তের বিধি-বিধান ও নিয়ম-নীতির অনুবর্তী হওয়া একান্ত জরুরী। তবে কেন ও কী ভেবে কিছু মানুষ এ শাস্ত্র নিয়ম-শৃঙ্খলাকে অবজ্ঞা ও অস্বীকার করে এবং তা মানুষের জন্য পরাধীনতা বলে মনে করে? নিশ্চয় তা প্রকাশ্য অপবাদ এবং ভ্রান্ত ও পাপময় ধারণা ছাড়া কিছু নয়। (মিন মুশকিলাতিশ শাবাব, ইবনে উসাইমীন ২০-২২ পৃঃ)

এ জগতে একমাত্র পাগলেরই আছে পূর্ণ স্বাধীনতা, সেই কেবল যাচ্ছে তাই বলে বেড়াতে পারে, ক’রে বেড়াতে পারে। অবশ্য সে স্বাধীনতা প্রয়োগ করতে গিয়ে অনেক সময় গলা-ধাক্কাও খেয়ে থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে নিরঙ্কুশ

স্বাধীনতা এ পৃথিবীর কারো নেই। প্রত্যেকে কোন না কোন নিয়মের পরাধীন অবশ্যই থাকে। তা না হলে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। প্রত্যেক জিনিসের পশ্চাতে একটা না একটা বাঁধন আছে, নিয়ন্ত্রণ জোড়া আছে। নচেৎ, বিপদ অনিবার্য। আগুন, পানি, বাতাস, খাদ্য, যাই বলুন না কেন, সবকিছুর ব্যবহার বিধি নিয়ন্ত্রিত। ঘোড়ার লাগাম না থাকলে বা গাড়ির ব্রেক না থাকলে ঘোড়া বা গাড়ি কি ঠিক মত ঈপ্সিত পথে চলে থাকে, না কেউ চালাতে পারে? মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিন্তা-গবেষণাও অনুরূপ নিয়ন্ত্রিত। ষড়রিপুর নাকেও দড়ি দেওয়া আছে। তা না হলে পৃথিবীতে কেউ শান্তিতে বাস করতে পেত না। মানুষ মানুষরূপে বাস করতে পারত না; বরং পশুর চাইতেও অধম হয়ে নিজ নিজ স্বাধীনতা প্রয়োগ করতে গিয়ে আপোসে লড়ে ধ্বংস হয়ে যেত।

অতএব প্রত্যেক বস্তুর নিয়ন্ত্রিত দিকটাই ভালো। শৃঙ্খলিত সবকিছুই মানুষের ঈপ্সিত। উচ্ছৃঙ্খলতা সভ্য সমাজ পছন্দ করতে পারে না। কেউ চায় না নিয়ন্ত্রণহারা পানি বা বন্যার অদম্য গতি। কেউ চায় না আগুন তার রান্নাঘর থেকে আয়তনের বাইরে চলে যাক।

কলেজ থেকে ফিরার পথে বেসামাল ডেসে চামেলী বাসায় ফিরছিল। এমন বেসামাল পোশাকে আবেদনময়ী ভঙ্গিমায় চলাতে তার স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু হঠাৎ করে এক দল যুবক তার সে মস্তানা চলন দেখে তার উপর হামলা করে তার রাঙা যৌবন লুটে নিল। দুর্ধর্ষ যুবকদের হাতে ধর্ষিতা ও খুন হল চামেলী। অবশ্য যুবকদেরও এতে স্বাধীনতা ছিল।

অন্যায়ভাবে অবৈধ উপায়ে অর্থ সঞ্চয় করাতে আপনার-আমার স্বাধীনতা আছে। তেমনি ডাকাতেরও ব্যক্তি-স্বাধীনতা আছে ডাকাতি করার। চোরেরও ব্যক্তি-স্বাধীনতা আছে বিনা বাধায় চুরি করার।

মুক্তমনা বন্ধু আমার! আপনি নিশ্চয় মানবেন না এমন স্বাধীনতা। সুতরাং আপনি আপনার মনে মুক্ত ও স্বাধীন, যা খুশি চিন্তা করুন, যে কোন ধারণা পোষণ করুন, কেউ বাধা দেবে না। কিন্তু আপনার সেই মুক্ত চিন্তার লাগামহীন ঘোড়া দিয়ে আমার ফসল নষ্ট করবেন, তা তো আমি হতে দেব না। কেউই তা হতে দেবে না।

আপনি যদি মুক্ত চিন্তার নামে যে সব কথা বলছেন, তা যদি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধী হয়, তাহলে আপনার হৃদয় থাকতেও আসলে আপনি হৃদয়হীন মানুষ। আপনারা যে কী, আর আপনাদের শাস্তি যে কী, তা আপনার স্রষ্টার কাছেই শুনুন।

{وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ

أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ  
أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ { (১৭৭) سورة الأعراف

“আমি তো বহু জ্বিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি; তাদের হৃদয় আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চক্ষু আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা দর্শন করে না এবং তাদের কর্ণ আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা শ্রবণ করে না। এরা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়; বরং তা অপেক্ষাও অধিক বিভ্রান্ত! তারাই হল উদাসীন।” (আ’রাফঃ ১৭৯)

## মনের কর্ম ও ইবাদত

ইবাদত বলা হয় প্রত্যেক সেই গুপ্ত ও প্রকাশ্য কথা ও কাজকে, যা মহান আল্লাহ পছন্দ করেন ও ভালোবাসেন।

প্রকাশ্য কথা ও কাজের ইবাদত বাহ্যিক দেহাঙ্গের ইবাদত যেমন নামায, কুরবানী ইত্যাদি যদিও তাতে মনোযোগ চাই। কিন্তু গুপ্ত কথা ও কাজের ইবাদত হল কেবল মনের ইবাদত। মনের ভিতরেই তা হতে থাকে, তার জন্য বাহ্যিক কোন অঙ্গের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না এবং বাহির থেকে কেউ তা জানতে-বুঝতেও পারে না।

মনের সবচেয়ে বৃহৎ কর্ম হল, মহান আল্লাহকে চেনা ও বিশ্বাস করা। তাঁর অহীর সত্যায়ন করা। তাঁর আনুগত্য স্বীকার করা। তাঁর কিতাব, ফিরিশ্তা, নবী-রসূল, পরকাল ও তকদীরকে বিশ্বাস করা ইত্যাদি।

‘মাদারিজুস সালিকীন’ গ্রন্থে হার্দিক ইবাদতের বিভিন্ন পর্যায় উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে কিছু এইরূপঃ আল্লাহকে অবলম্বন করা, আল্লাহর দিকে পলায়ন করা, হৃদয়কে সত্যবাদিতা ও ইখলাসের উপর অভ্যস্ত করা, আনুগত্য করা, ভয় করা, ভালবাসা, ভক্তি করা, তা’যীম করা, আশা করা, বিনম্র হওয়া, বিষয়-বিতৃষ্ণা, সংযমশীলতা, একনিষ্ঠভাবে আল্লাহতে মগ্ন হওয়া, আগ্রহ ও ভক্তি রাখা, আমল দ্বারা ইল্মের এবং ইখলাস ও ইহসান দ্বারা আমলের হিফায়ত করা, সর্বদা এই অনুভব রাখা যে, আল্লাহ আমার প্রকাশ্য ও গুপ্ত সবকিছু দেখছেন, আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তুর সম্মান করা, আন্তরিকতা ও একাগ্রতা, অবিচলতা, ভরসা, আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা, আত্মসমর্পণ, ধৈর্যশীলতা, আল্লাহতে সন্তুষ্টি, কৃতজ্ঞতা, লজ্জাশীলতা, সত্যনিষ্ঠা, পরার্থপরতা, সচ্চরিত্রতা, বিনয়ী হওয়া, ভদ্রতা, পরোপকারিতা, দৃঢ় সংকল্প, ইচ্ছা ও তলব, আদব করা, একীন করা, আল্লাহকে নিয়ে একাকীত্ব দূর করা, যিকর করা, আল্লাহর মুখাপেক্ষী হওয়া, আল্লাহ ছাড়া

অন্যের অমুখাপেক্ষী হওয়া, এমনভাবে ইবাদত করা, যাতে মনে হয় যে, যেন সে আল্লাহকে দেখছে অথবা আল্লাহ তাকে দেখছেন। জ্ঞানবত্তা, হিকমত অবলম্বন, দূরদর্শিতা, প্রশান্তি অনুভব করা, উদ্বিগ্নশূন্য হওয়া, হিন্মত করা, ঈর্ষা করা, (আত্মমর্যাদাবোধ), (ঈমানের মিষ্টতা) প্রাপ্তি, হৃদয় পরিষ্কার রাখা, (খোলা মন হওয়া), খুশী হওয়া, গোপনীয়তা রক্ষা, ঈমানে সুদৃঢ়তা অবলম্বন, রহস্য-উদঘাটন, তন্ময়তা, আল্লাহকে দর্শন করার অনুভূতি, হৃদয়কে সঞ্জীবিত রাখা, আল্লাহর সম্যক পরিচয় লাভ, তাওহীদে বিশ্বাস ইত্যাদি।

হার্দিক ইবাদতসমূহের গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত হল মহান আল্লাহকে ভালোবাসা। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ বলেন, ‘হৃদয়ের মধ্যে আল্লাহর ভালোবাসা যত বৃদ্ধি পাবে, তত তাঁর প্রতি দাসত্ব ও ইবাদত বৃদ্ধি পাবে। আর যত তাঁর প্রতি দাসত্ব ও ইবাদত বৃদ্ধি পাবে, তত গায়রুল্লাহকে বাদ দিয়ে তাঁর প্রতি ভালোবাসা ও স্বাধীনতা বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং হৃদয় সাত্ত্বিকভাবে আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী দুই দিক থেকে। ইবাদত ও দাসত্বের দিক থেকে এবং সাহায্য চাওয়া ও ভরসা করার দিক থেকে। তাই হৃদয় নিজ প্রতিপালকের দাসত্ব, ভালোবাসা এবং তাঁর প্রতি অভিমুখ ব্যতীত সংশুদ্ধ হতে পারে না, সফল হতে পারে না, সুখী ও খুশী হতে পারে না, উদ্বিগ্নহীন ও প্রশান্ত হতে পারে না। যদিও সারা সৃষ্টির উপভোগ্য সুখ সে লাভ করে, তবুও সে উদ্বিগ্নশূন্য ও প্রশান্ত হতে পারে না। যেহেতু হৃদয়ে আছে নিজ প্রতিপালকের প্রতি সত্তাগত মুখাপেক্ষিতা, এই দিক দিয়ে যে, তিনি তার উপাস্য, ভালোবাসার পাত্র এবং আকাঙ্ক্ষিত। (ফাতাওয়া ১০/১৯৩-১৯৪)

প্রবৃত্তির খেয়াল-খুশীর বিরুদ্ধে জিহাদ করা মনের অন্যতম বড় ইবাদত। যে জিহাদকে সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ বলা হয়েছে।

অনুরূপ মনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ইখলাস। খাঁটি ও বিশুদ্ধভাবে কেবল মহান আল্লাহরই সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে ইবাদত করা।

## আন্তরিকতা ও ইখলাসের গুরুত্ব

শরীয়তে ইখলাসের গুরুত্ব অপরিসীম। তার মানে আপনি যে কাজ করবেন, তা মন দিয়ে করবেন এবং কেবল আল্লাহর জন্য করবেন। সেই কাজ হবে তাঁর জন্য খাঁটি ও বিশুদ্ধ, তাতে লোককে শোনানো, দেখানো, প্রশংসার লোভ, স্বার্থপরতা ইত্যাদি কোন কিছুই ভেজাল থাকবে না।

প্রত্যেক আমল কবুল হওয়ার মৌলিক শর্তাবলীর মধ্যে অন্যতম হল

ইখলাস। ইখলাস না থাকলে আমল বেকার। ইখলাস হল আমলের প্রাণ। ইখলাসহীন আমল আত্মবিহীন শরীরের মতো। অন্য কথায় মনের নিয়ত, সংকল্প ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী কর্মের বিচার হবে।

ইখলাসের প্রতি গুরুত্ব আরোপ ক’রে আল্লাহ তাআলা বলেন,  
 {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا  
 الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ} (৫) سورة البينة

অর্থাৎ, তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে এবং নামায কায়েম করতে ও যাকাত প্রদান করতে। আর এটাই সঠিক ধর্ম। (সূরা বাইয়িনাহ ৫নং আয়াত)

তিনি আরো বলেন,

{قُلْ إِنْ تَخْشَوْا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْذَوُهُ يَعْلَمَهُ اللَّهُ}

অর্থাৎ, বল, তোমাদের মনে যা আছে তা যদি তোমরা গোপন রাখ কিংবা প্রকাশ কর, আল্লাহ তা অবগত আছেন। (সূরা আলে ইমরান ২৯ নং আয়াত)

অর্থাৎ, মানুষ কোন্ উদ্দেশ্যে কোন্ কাজ করে, তা তিনি জানেন এবং সেই অনুযায়ী তিনি তার প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

তিনি মানব-দানব সৃষ্টি করেছেন কেবল তাঁরই ইবাদত করার জন্য। তিনি সারা বিশ্ব রচনা করেছেন,

{لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا}

“যাতে তিনি পরীক্ষা করতে পারেন, কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি ভালো।”

এ কথা তিনি সূরা হূদ ৭, সূরা কাহফ ৭ ও সূরা মূলক ২নং আয়াতে বলেছেন। তার অর্থ হল, সবচেয়ে খাঁটি ও সঠিক আমল করতে পার। সবচেয়ে বেশি আমল উদ্দিষ্ট নয়। উদ্দিষ্ট হল ভালো ও নির্ভেজাল আমল।

ফুযাইল বিন ইয়ায ‘সবচেয়ে ভালো’র ব্যাখ্যাতে বলেছেন, ‘সবচেয়ে বেশি খাঁটি ও সবচেয়ে বেশি সঠিক।’

লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, ‘হে আবু আলী! সবচেয়ে বেশি খাঁটি ও সবচেয়ে বেশি সঠিক কী?’

উত্তরে তিনি বললেন, ‘আমল যখন খাঁটি হয়, কিন্তু সঠিক না হয়, তখন তা কবুলযোগ্য হয় না। অনুরূপ যখন তা সঠিক হয়, কিন্তু খাঁটি হয় না, তখন তাও কবুলযোগ্য হয় না; যতক্ষণ না তা খাঁটি ও সঠিক উভয়ই হয়। খাঁটি তখন হয়, যখন তা কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য হয় এবং সঠিক তখন হয়, যখন তা সুল্লাহর তরীকা অনুযায়ী হয়।’



অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন,

{فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا}

“সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সংকল্প করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকেও শরীক না করে।” (ক/হফ ১১০)

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوُّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ)). (متفق عليه)

“যাবতীয় কার্য নিয়ত বা সংকল্পের উপর নির্ভরশীল। আর মানুষের জন্য তাই প্রাপ্য হবে, যার সে নিয়ত করবে। অতএব যে ব্যক্তির হিজরত (স্বদেশত্যাগ) আল্লাহর (সন্তোষ লাভের) উদ্দেশ্যে ও তাঁর রসুলের জন্য হবে; তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রসুলের জন্যই হবে। আর যে ব্যক্তির হিজরত পার্থিব সম্পদ অর্জন কিংবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যেই হবে, তার হিজরত যে সংকল্প নিয়ে করবে তারই জন্য হবে।” (বুখারী ১নং, মুসলিম ১৯০৭নং)

উক্ত হাদীসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ) এটিকে ‘এক তৃতীয়াংশ অথবা অর্ধেক দ্বীন’ বলে অভিহিত করেছেন।

এটিকে ইমাম বুখারী (রঃ) তাঁর গ্রন্থ সহীহ বুখারীতে সাত জায়গায় বর্ণনা করেছেন। (১, ৫৪, ২৫২৯, ৩৮৯৮, ৫০৭০, ৬৬৮৯, ৬৯৫৩নং) প্রত্যেক স্থানে এই হাদীসটি উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হল, কর্মে মনের বিশুদ্ধতার গুরুত্ব অপরিসীম ও কর্মের প্রতিদান নিয়তের সাথে সম্পৃক্ত---সে কথা প্রমাণ করা।

যে কর্ম মহান প্রতিপালকের কাছে ফলপ্রসূ হবে, যে কাজ মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবে অথবা যে আমল মহান আল্লাহ কবুল করবেন, তা হল তাই, যা কেবল তাঁর উদ্দেশ্যেই করা হবে। সে কাজ তাঁর জন্য খাঁটি ও বিশুদ্ধ না হলে, সে কাজের নিয়ত ও সংকল্প নির্ভেজাল না হলে, সে কাজ যতই মহান হোক না কেন, পরকালে তা কোন কাজে আসবে না।

আবু মূসা আব্দুল্লাহ ইবনে কায়স আশআরী ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ-কে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, যে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য যুদ্ধ করে, অন্ধ পক্ষপাতিত্বের জন্য যুদ্ধ করে এবং লোক প্রদর্শনের জন্য

(সুনাং নেওয়ার উদ্দেশ্যে) যুদ্ধ করে, এর কোন্ যুদ্ধটি আল্লাহর পথে হবে? আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন,

(( مَنْ قَاتَلَ لَتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ))

“যে ব্যক্তি আল্লাহর কালেমাকে উঁচু করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে, একমাত্র তারই যুদ্ধ আল্লাহর পথে হয়।” (বুখারী ৭৪৫৮, মুসলিম ৫০২৯নং)

তার মানে, যে ব্যক্তি বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য যুদ্ধ করে, তা আল্লাহর পথে নয়।

যে ব্যক্তি অন্ধ পক্ষপাতিত্বের কারণে যুদ্ধ করে, অন্ধভাবে কেবল আত্মীয়তা, মৈত্রীচুক্তি বা জাতীয়তাবাদ ইত্যাদির কারণে যুদ্ধ করে, তার যুদ্ধ আল্লাহর পথে নয়।

যে ব্যক্তি মানুষের কাছে সুনাং নেওয়ার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে, তার যুদ্ধও আল্লাহর পথে নয়।

অনুরূপ যে ব্যক্তি পার্থিব কোন স্বার্থ বা সম্পদ লাভের অভিপ্রায়ে যুদ্ধ করে, তার যুদ্ধও আল্লাহর পথে নয়। তাতে তিনি সন্তুষ্ট হবেন না এবং যোদ্ধাকে কোন সওয়াবও দেবেন না।

আবু হুরাইরা রা. বুলেন, এক ব্যক্তি বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! এক ব্যক্তি জিহাদ করতে চায়, কিন্তু সে তাতে পার্থিব কোন স্বার্থ কামনা করে।’ রসূল ﷺ বললেন, “তার জন্য কোন সওয়াব নেই।” লোকটি ঐ একই কথা তিনবার ফিরিয়ে বলল। নবী ﷺ প্রত্যেক বারই উত্তরে বললেন, “তার জন্য কোন সওয়াব নেই।” (আবু দাউদ ২৫১৮নং)

আল্লাহর পথে জিহাদ কত মহান কাজ! তাঁর পথে মরণ অমর শহীদের কাজ। কিন্তু নিয়ত সে কাজকে তুচ্ছ ক’রে ফেলে। আব্দুল্লাহ বিন মুবারক বলেছেন, ‘এমন অনেক ক্ষুদ্র আমল আছে, যাকে নিয়ত বিশাল ক’রে তোলে এবং এমন অনেক বিশাল আমল আছে, যাকে নিয়ত ক্ষুদ্র ক’রে ফেলে।’

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((من غزا في سبيل الله ولم ينو إلا عقلا فله ما نوى))

“যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করল, কিন্তু তার নিয়তে একটি ‘এক্সাল’ (মাথায় রুমালের উপর ব্যবহার্য রশি অথবা উট বাঁধার রশি) অর্জন ছিল, তাহলে সে তাই পেল, যার সে নিয়ত করেছিল।” (আহমাদ ২২৬৯২, নাসাঈ ৩১৩৮, হাকেম ২৫২২নং)

আবু হুরাইরা বুলেন, আমর বিন উক্বাইশের জাহেলী যুগের সুদের বকেয়া

ছিল। সে তা পরিশোধ না নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে অসম্মত হল। ইতিমধ্যে উহুদের যুদ্ধ এসে উপস্থিত হল। (মদীনায়ে এসে) সে বলল, ‘আমার চাচার গোষ্ঠির লোকেরা কোথায়?’ লোকেরা বলল, ‘তারা উহুদে আছে।’ বলল, ‘অমুক কোথায়?’ বলা হল, ‘উহুদে আছে।’ বলল, ‘অমুক কোথায়?’ বলা হল ‘উহুদে আছে।’ সুতরাং সে তার বর্ম পরে ও অস্ত্র ধারণ ক’রে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে তাদের দিকে অগ্রসর হল। সেখানে যখন তারা তাকে দেখল, তখন বলল, ‘সাবধান হে আমর! তুমি আর অগ্রসর হবে না।’ সে বলল, ‘আমি ঈমান এনেছি।’ সুতরাং সে যুদ্ধে शामिल হল এবং জখম হল। অতঃপর সেই বিক্ষত অবস্থায় তাকে তার পরিজনের কাছে বহন ক’রে আনা হল। সা’দ বিন মুআয এসে তার বোনকে বললেন, ‘ওকে জিজ্ঞাসা কর, তোমার গোত্রের পক্ষ-পাতিত্ব করতে গিয়ে এবং তাদের ক্রোধে ক্রোধান্বিত হয়ে কি (যুদ্ধ করেছে), নাকি আল্লাহর জন্য ক্রোধান্বিত হয়ে (যুদ্ধ করেছে)?’ উত্তরে সে বলল, ‘বরং আমি আল্লাহ ও তাঁর রসুলের জন্য ক্রোধান্বিত হয়ে (যুদ্ধ করেছি)। অতঃপর সে মারা গেলে জান্নাত প্রবেশ করল। অথচ সে এক ওয়াত্তের নামাযও পড়েনি! (আবু দাউদ ২৫৩৯নং)

নির্ভেজাল অন্তর দিয়ে কোন কাজ করলে তবেই তার সওয়াব ও প্রতিদান পাওয়া যায়। সে কাজের পথে চলার পদক্ষেপেও সওয়াব অর্জন হয়। সে কাজের জন্য অপেক্ষায় অতিবাহিত সময়ও ইবাদতের মান পায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

(( صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ وَبَيْتِهِ بضعاً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ، وَذَلِكَ أَنْ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضوءَ ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ ، لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ : لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَحُطُّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتْ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ ، وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ ، يَقُولُونَ : اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللَّهُمَّ تَبَّ عَلَيْهِ ، مَا لَمْ يُؤْذِنْ فِيهِ ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ )) .

“মানুষের জামাআতের সঙ্গে নামায পড়ার নেকী, তার বাজারে ও বাড়ীতে নামায পড়ার চেয়ে (২৫ বা ২৭) গুণ বেশী। আর তা এ জন্য যে, যখন কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযু করে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে

আসে এবং নামাযই তাকে মসজিদে নিয়ে যায়, তখন তার মসজিদে প্রবেশ করা পর্যন্ত প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময়ে একটি মর্যাদা উন্নত হয় ও একটি পাপ মোচন করা হয়। অতঃপর যখন সে মসজিদে প্রবেশ করে, তখন যে পর্যন্ত নামায তাকে (মসজিদে) আটকে রাখে, সে পর্যন্ত সে নামাযের মধ্যেই থাকে। আর ফিরিশ্তারা তোমাদের কোন ব্যক্তির জন্য সে পর্যন্ত রহমতের দুআ করতে থাকেন---যে পর্যন্ত সে ঐ স্থানে বসে থাকে, যে স্থানে সে নামায পড়েছে। তাঁরা বলেন, ‘হে আল্লাহ! এর প্রতি দয়া কর, হে আল্লাহ! একে ক্ষমা কর, হে আল্লাহ! এর তওবাহ কবুল কর।’ (ফিরিশ্তাদের এই দুআ সে পর্যন্ত চলতে থাকে) যে পর্যন্ত সে কাউকে কষ্ট না দেয়, যে পর্যন্ত তার ওয়ূ নষ্ট না হয়।” (বুখারী ২ ১১৯, মুসলিম ১৫৩৮-নং, শব্দগুলি মুসলিমের)

ইখলাসের মাহাত্ম্য এতই বেশি যে, ইখলাসের সাথে কোন আমল করলে এবং তার অসীলায় দুআ করলে মহান আল্লাহ তা কবুল করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “তোমাদের পূর্বে (বানী ইসরাঈলের যুগে) তিন ব্যক্তি একদা সফরে বের হল। চলতে চলতে রাত এসে গেল। সুতরাং তারা রাত কাটানোর জন্য একটি পর্বত-গুহায় প্রবেশ করল। অল্পক্ষণ পরেই একটা বড় পাথর উপর থেকে গড়িয়ে নীচে এসে গুহার মুখ বন্ধ করে দিল। এ দেখে তারা বলল যে, ‘এহেন বিপদ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে এই যে, তোমরা তোমাদের নেক আমলসমূহকে অসীলা বানিয়ে আল্লাহর কাছে দুআ কর।’ সুতরাং তারা স্ব স্ব আমলের অসীলায় (আল্লাহর কাছে) দুআ করতে লাগল।

তাদের মধ্যে একজন বলল, ‘হে আল্লাহ! তুমি জান যে, আমার অত্যন্ত বৃদ্ধ পিতা-মাতা ছিল এবং (এও জান যে,) আমি সন্ধ্যা বেলায় সবার আগে তাদেরকে দুধ পান করাতাম। তাদের পূর্বে স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে ও কৃতদাস-দাসী কাউকে পান করাতাম না। একদিন আমি গাছের খোঁজে দূরে চলে গেলাম এবং বাড়ী ফিরে দেখতে পেলাম যে পিতা-মাতা ঘুমিয়ে গেছে। আমি সন্ধ্যার দুধ দহন করে তাদের কাছে উপস্থিত হয়ে দেখলাম, তারা ঘুমিয়ে আছে। আমি তাদেরকে জাগানো পছন্দ করলাম না এবং এও পছন্দ করলাম না যে, তাদের পূর্বে সন্তান-সন্ততি এবং কৃতদাস-দাসীকে দুধ পান করাই। তাই আমি দুধের বাটি নিয়ে তাদের ঘুম থেকে জাগার অপেক্ষায় তাদের শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকলাম। অথচ শিশুরা ক্ষুধার তাড়নায় আমার পায়ের কাছে চেষ্টামেচি করছিল। এভাবে ফজর উদয় হয়ে গেল এবং তারা জেগে উঠল। তারপর তারা নৈশদুধ পান করল। হে আল্লাহ! আমি যদি এ কাজ তোমার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য ক’রে থাকি, তাহলে

পাথরের কারণে আমরা যে গুহায় বন্দী হয়ে আছি এ থেকে তুমি আমাদেরকে উদ্ধার কর।’

এই দুআর ফলস্বরূপ পাথর একটু সরে গেল। কিন্তু তাতে তারা বের হতে সক্ষম ছিল না।

দ্বিতীয়জন দুআ করল, ‘হে আল্লাহ! আমার একটি চাচাতো বোন ছিল। সে আমার নিকট সকল মানুষের চেয়ে প্রিয়তমা ছিল। (অন্য বর্ণনা অনুযায়ী) আমি তাকে এত বেশী ভালবাসতাম, যত বেশী ভালবাসা পুরুষরা নারীদেরকে বাসতে পারে। একবার আমি তার সঙ্গে যৌন মিলন করার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু সে অস্বীকার করল। পরিশেষে সে যখন এক দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ল, তখন সে আমার কাছে এল। আমি তাকে এই শর্তে ১২০ দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) দিলাম, যেন সে আমার সঙ্গে যৌন-মিলন করে। সুতরাং সে (অভাবের তাড়নায়) রাজী হয়ে গেল। অতঃপর যখন আমি তাকে আয়ত্তে পেলাম। (অন্য বর্ণনা অনুযায়ী) যখন আমি তার দু’পায়ের মাঝে বসলাম, তখন সে বলল, তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং অবৈধভাবে (বিনা বিবাহে) আমার সতীচ্ছদ নষ্ট করো না। সুতরাং আমি তার কাছ থেকে দূরে সরে গেলাম; যদিও সে আমার একান্ত প্রিয়তমা ছিল এবং যে স্বর্ণমুদ্রা আমি তাকে দিয়েছিলাম তাও পরিত্যাগ করলাম। হে আল্লাহ! যদি আমি এ কাজ তোমার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তাহলে তুমি আমাদের উপর পতিত মুসীবতকে দূরীভূত কর।’

সুতরাং পাথর আরো কিছুটা সরে গেল। কিন্তু তাতে তারা বের হতে সক্ষম ছিল না।

তৃতীয়জন দুআ করল, ‘হে আল্লাহ! আমি কিছু লোককে মজুর রেখেছিলাম। (কাজ সুসম্পন্ন হলে) আমি তাদের সকলকে মজুরী দিয়ে দিলাম। কিন্তু তাদের মধ্যে একজন মজুরী না নিয়ে চলে গেল। আমি তার মজুরীর টাকা ব্যবসায় বিনিয়োগ করলাম। (কিছুদিন পর) তা থেকে প্রচুর অর্থ জমে গেল। কিছুকাল পর একদিন সে এসে বলল, ‘হে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমার মজুরী দিয়ে দাও।’ আমি বললাম, ‘এসব উট, গাভী, ছাগল এবং গোলাম (আদি) যা তুমি দেখছ তা সবই তোমার মজুরীর ফল।’ সে বলল, ‘হে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমার সঙ্গে উপহাস করবে না।’ আমি বললাম, ‘আমি তোমার সঙ্গে উপহাস করিনি (সত্য ঘটনাই বর্ণনা করছি)।’ সুতরাং আমার কথা শুনে সে তার সমস্ত মাল নিয়ে চলে গেল এবং কিছুই ছেড়ে গেল না। হে আল্লাহ! যদি আমি এ কাজ একমাত্র তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করে থাকি, তাহলে যে বিপদে আমরা পড়েছি

তা তুমি দূরীভূত করা।’ এর ফলে পাথর সম্পূর্ণ সরে গেল এবং সকলেই (গুহা থেকে) বের হয়ে চলতে লাগল। (বুখারী ২২৭২ নং মুসলিম ২৭৪৩নং)

পার্থিব উপভোগ্য সকল সম্পদ অভিশপ্ত। দুনিয়ার কোন মূল্য নেই মহান আল্লাহর কাছে। কিন্তু তার মধ্যে সেই জিনিসের মূল্য আছে, যার মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। সে জিনিস অভিশপ্ত নয়, যার মাধ্যমে মহান আল্লাহর ইবাদত হয়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا مَا ابْتَغَىٰ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)).

“পৃথিবী অভিশপ্ত এবং অভিশপ্ত তার মধ্যে যা কিছু আছে সে সকল (পার্থিব বিষয় ও) বস্তুও। তবে সেই বস্তু (বা কর্ম) নয় যার মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের আশা করা হয়।” (তাবারানী, সহীহ তারগীব ৯নং)

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে আমল করলে বা ছাড়লে তাতে শির্ক ও রিয়া হয়। কিন্তু ‘ইখলাস’ থাকলে শির্ক থেকে বাঁচা যায়। আর আমল লোক চক্ষু থেকে গোপনে হলে তাতে ইখলাস রাখা সহজ হয়।

সালামাহ বিন দীনার বলেন, ‘তুমি তোমার পাপসমূহকে গোপন করার চাইতে তোমার পুণ্যসমূহকে বেশি গোপন কর।’

নচেৎ পুণ্যসমূহের অভ্যন্তরে সুনাম নেওয়ার উদ্দেশ্যে অনুপ্রবেশ করলে তা পণ্ড হয়ে যায়। তাই কোন মু’মিনের হৃদয়ে ইখলাস ও সুনাম নেওয়ার ইচ্ছা একত্র হতে পারে না।

কোনও কাজে আন্তরিকতা থাকলে সে কাজ সুন্দর হয়, নিখুঁত হয়। যাকে মন থেকে চাওয়া যায়, তাকে নিশ্চয় পাওয়া যায়। ‘যার জন্য মন কাঁদে, নাই চালে ভাত রাঁধে। যার জন্য মন কাঁদে না, চাল থাকতেও ভাত রাঁধে না।’ এটা আমরা আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করতে পারি। এও জানি যে, যে কাজ পরের জন্য করি, তাতে আন্তরিকতার অভাব থাকে। কিন্তু নিজের কাজ হলে তা অন্তর দিয়ে করা হয়। বিধায় তা অতি সুন্দর হয়।

আমেরিকার এক ছুতোর কাঠের ঘর বানানোর এক কোম্পানিতে চাকরি করত। কাজে বহু পুরাতন ও কারিগরিতে বড় সুদক্ষ ছিল সে। মাসিক বেতনে খুব সুন্দর কাজ করত। এক সময় সে কাজ থেকে অবসর চাইল মালিকের কাছে, বোনাসও চাইল। মালিক বলল, ‘সবশেষে একটি ঘর বানিয়ে তোমাকে অবসর দেব।’ মন না চাইলেও ছুতোর তা বানাতে বাধ্য হল। সুতরাং সে ঘরটি তেমন সুন্দর হল না। মালিক বলল, ‘এবার তুমি অবসর নিতে পার। আর এই ঘর তোমার বোনাস।’ ছুতোরের বড়

আফসোস হল, আগে জানলে ঘরটাকে সে আরো সুন্দর বরং সবচেয়ে বেশি সুন্দর ক’রে বানাতে। বলা বাহুল্য, সার্বিকভাবে সকল কাজে ‘ইখলাস’ থাকলে নিজেকে ঠকতে হতো না।

## ইখলাসের পরিণাম ও সুফল

১। ইখলাস হল কনভার্টার যন্ত্র। যে কোন আমলকে মন্দ থেকে ভালোতে, ইহলৌকিক থেকে পারলৌকিকে, মুবাহ থেকে মুস্তাহাযে এবং স্বাভাবিক কর্ম থেকে ইবাদতে পরিবর্তিত ও পরিণত করতে পারে। ঘুম, পানাহার ইত্যাদি নৈকট্য ও ইবাদতে পরিণত করতে পারে ইখলাস।

২। মনের ইখলাস দেহাঙ্গের সামান্য আমলকে অসামান্য করতে পারে। আব্দুল্লাহ বিন মুবারক বলেছেন, ‘এমন অনেক ক্ষুদ্র আমল আছে, যাকে নিয়ত বিশাল ক’রে তোলে এবং এমন অনেক বিশাল আমল আছে, যাকে নিয়ত ক্ষুদ্র ক’রে ফেলে।’

একজন সলফ তাঁর শিষ্যকে বলেছিলেন, ‘তোমার সকল আমলের নিয়তে ইখলাস রেখো, তাহলে অল্প আমলই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।’

৩। ইখলাস-ওয়ালা (মুখলিস) ব্যক্তির জন্য তার বিরোধীর বিরুদ্ধে আল্লাহই যথেষ্ট। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ وَيُخَوِّفُوْكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ وَمَنْ يُضِلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ

هَادٍ} (سورة الزمر ٣٦)

“আল্লাহ কি তাঁর দাসের জন্য যথেষ্ট নন? অথচ তারা তোমাকে আল্লাহর পরিবর্তে অপরের ভয় দেখায়। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার জন্য কোন পথপ্রদর্শক নেই।” (যুমারঃ ৩৬)

৪। মুখলিস ব্যক্তি সঠিক পথ পায়, তার হৃদয় থেকে হিকমত ও দূরদর্শিতা নিঃসৃত হয় এবং তার রসনায় তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। যেমন একজন তাবেয়ী মাকহুল বলেছেন, ‘যে কোনও ব্যক্তি ৪০ দিন ইখলাস অনুশীলন করবে, তার হৃদয় ও রসনা থেকে হিকমতের ঝরনা নিঃসৃত হবে।’ (বুস্তানুল আরেফীন ৭পৃঃ)

যখন ফিতনা এসে সমাজকে গ্রাস করবে এবং হক ও বাতিলের মাঝে তালগোল খেয়ে যাবে, তখনই একনিষ্ঠ মুখলিস ব্যক্তিকে মহান প্রতিপালক সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন, যে সঠিকতা তার বচনে ও আচরণে প্রকাশলাভ করবে।

## ইহসান

হৃদয়ের অন্যতম ইবাদত হল ইহসান। যে ইহসান দ্বীনের তৃতীয় ও সর্বশেষ পর্যায়। যেমন জিবরীল عليه السلام নবী ﷺ-কে বলেছিলেন যে, ‘আমাকে ইহসান সম্পর্কে বলুন! তিনি বলেছিলেন,

(( اَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ )).

“ইহসান হল এই যে, তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে; যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তাহলে তিনি কিন্তু তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন।” (বুখারী ৫০, মুসলিম ১০২নং)

## তাক্বওয়া

হৃদয়ের একটি ইবাদত তাক্বওয়া, সাবধানতা, আল্লাহ-ভীরুতা ও পরহেযগারী।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (۷) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا} (۸) سورة الشمس

“শপথ আত্মার এবং তার সুঠাম গঠনের। অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও তাক্বওয়ার জ্ঞান দান করেছেন।” (শাম্সঃ ৭-৮)

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَظْلِمُهُ ، وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ ، التَّقْوَى هَاهُنَا

التَّقْوَى هَاهُنَا )) وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ.

“এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার প্রতি যুলুম করবে না, তাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবে না এবং তাকে তুচ্ছ ভাবে না। আল্লাহভীতি এখানে রয়েছে। আল্লাহভীতি এখানে রয়েছে।” (এই সাথে তিনি নিজ বুকের দিকে ইঙ্গিত করলেন।) (মুসলিম ৬৭০৬নং)

মহান আল্লাহ তাক্বওয়ার আদেশ দিয়েছেন তাঁর কিতাবের বহু জায়গায়। বহু জায়গায় তার সুফলও বিবৃত করেছেন। কুরআন তেলাঅতকারীর কাছে তা অবিস্মৃত নয়।





## ‘যুহুদ’ বা বিষয়-বিতৃষ্ণা

অন্তরের অন্যতম ইবাদত হল বিষয়-বিতৃষ্ণা ও সংসার-বিরাগ। ইকালের উপর পরকালকে প্রাধান্য দেওয়া।

এর মানে কিন্তু বৈরাগ্যবাদ নয়। যেহেতু ইসলামে বৈরাগ্যবাদের কোন স্থান নেই।

‘বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়  
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়  
লভিব মুক্তির স্বাদ--।’

এই হল ইসলামের রীতি।

ইবনুল মুবারক বলেন, “সব চাইতে শ্রেষ্ঠ ‘যুহুদ’ হল, ‘যুহুদ’ গোপন করে সংসার করা।”

ইব্রাহীম বিন আদহাম বলেন, ‘যুহুদ হল দুই প্রকার : প্রথম প্রকার ফরয এবং দ্বিতীয় প্রকার নফল। হারাম জিনিসে যুহুদ ফরয এবং হালাল জিনিসে যুহুদ নফল।’

মনে রাখা দরকার যে, কর্ম ও উপার্জনে অক্ষম ও অলস ব্যক্তি কিন্তু ‘যাহেদ’ (সংসার-বিরাগী) নয়। আসলে যাহেদ হল সেই ব্যক্তি, যে ধনী হওয়া সত্ত্বেও ধনের প্রতি বিতৃষ্ণা রাখে।

একদা উমার বিন আব্দুল আযীয (রাহিমাহুল্লাহ)কে দেখা গেল তিনি রোদে বসে আছেন। জিজ্ঞাসা করা হল, ‘আপনি কি অসুস্থ?’ বললেন, ‘না, আমি আমার (পরিহিত) কাপড় শুকাচ্ছি।’ প্রশ্নকারী অবাক হয়ে বলল, ‘আপনার পোশাক কী, হে আমীরুল মু’মিনীন!’ বললেন, ‘লুঙ্গি, কামীস ও চাদর।’ বলল, ‘আর একটি ক’রে লুঙ্গি, কামীস ও চাদর গ্রহণ করেন না কেন?’ তিনি বললেন, ‘ছিল, পুরনো হয়ে নষ্ট হয়ে গেছে।’ বলল, ‘অন্যও তো গ্রহণ করতে পারেন?’ এ কথা শুনে তিনি মাথা নিচু ক’রে কেঁদে ফেললেন এবং বললেন,

{ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعُلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ

لِلْمُتَّقِينَ } (৮৩) سورة القصص

“এ পরলোকের আবাস; যা আমি নির্ধারিত করি তাদেরই জন্য যারা এ পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। সাবধানীদের জন্য শুভ পরিণাম।” (ক্বাস্বাস্বঃ ৮৩)

‘যুহুদ’-এর কাছাকাছি একটি শব্দ হল ‘অরা’। উভয়ের মাঝে পার্থক্য

হল, যুহদ সেই জিনিস বর্জন করা, যা আখেরাতে উপকারী নয়। আর অরা' সেই জিনিস বর্জন করা, যা আখেরাতে ক্ষতিকর বলে আশঙ্কা হয়। অন্য কথায় কিছু বৈধ জিনিসকে বর্জন করা হল যুহদ এবং মকরুহ বা ঘৃণ্য জিনিসকে বর্জন করা হল অরা'।

আর এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত-বাক্য এই যে, যে জিনিস আল্লাহ থেকে উদাস করে, সে জিনিসে যুহদ হল উত্তম। আর যে জিনিস আল্লাহ থেকে উদাস করে না, বরং বান্দা তাতে শুকরিয়া প্রকাশকারী হয়, তাহলে তাতে যুহদ উত্তম নয়। আর 'যুহদ' মানে হল সম্পদের আসক্তি ও লালসা থেকে মনকে মুক্ত করা।

হৃদয়ের অন্যতম ইবাদত সন্দিহান জিনিস থেকে সুদূরে থাকা। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(( إِنَّ الْحَالَ بَيْنَ ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ ، اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى ، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ )) . متفقٌ عَلَيْهِ

“অবশ্যই হালাল বিবৃত ও স্পষ্ট এবং হারাম বিবৃত ও স্পষ্ট, আর উভয়ের মাঝে রয়েছে বহু সন্দিহান বস্তু; যা অনেক লোকেই জানে না। অতএব যে ব্যক্তি এই সন্দিহান বস্তুসমূহ হতে দূরে থাকবে, সে তার দীন ও ইজ্জতকে বাঁচিয়ে নেবে এবং যে ব্যক্তি সন্দিহানে পতিত হবে (সন্দিগ্ধ বস্তু ভক্ষণ করবে), সে হারামে পতিত হবে। (এর উদাহরণ সেই) রাখালের মত, যে নিষিদ্ধ চারণভূমির আশেপাশে পশু চরায়, তার পক্ষে নিষিদ্ধ সীমানায় পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শোন! প্রত্যেক বাদশাহরই সংরক্ষিত চারণভূমি থাকে। আর শোন! আল্লাহর সংরক্ষিত চারণভূমি হল তাঁর হারামকৃত বস্তুসমূহ। শোন! দেহের মধ্যে একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে; যখন তা সুস্থ থাকে, তখন গোটা দেহটাই সুস্থ হয়ে থাকে। আর যখন তা খারাপ হয়ে যায়, তখন গোটা দেহটাই খারাপ হয়ে যায়। শোন! তা হল হৃৎপিণ্ড (অন্তর)।” (বুখারী ৫২, ২০৫১, মুসলিম ৪১৭৮-৮৭)

(( دَعَا مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ )) .

“তা বর্জন কর, যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে এবং তা গ্রহণ কর, যাতে তোমার সন্দেহ নেই।” (তিরমিযী ২৫১৮, নাসাঈ, ৫৭১১, সহীহুল জামে' ৩৩৭৭নং)

আনাস   বলেন, একদা নবী   পথে একটি খেজুর পেলেন। অতঃপর তিনি বললেন,

(( لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا ))

“যদি আমার এর সাদকাহ হওয়ার আশঙ্কা না হত, তাহলে আমি এটি খেয়ে ফেলতাম।” (বুখারী ২০৫৫, ২৪৩১, মুসলিম ২৫২৭-২৫২৯নং)

হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, কুড়িয়ে পাওয়া জিনিসে হালাল-হারামের ব্যাপারে সন্দেহ হলে বর্জন করা উচিত। তবে সন্দেহ না হলে সামান্য হালাল জিনিস কুড়িয়ে প্রচার না ক’রে খাওয়া বৈধ। সামান্য জিনিসের জন্য ঘোষণা করাও এক প্রকার বাড়াবাড়ি। যেমন উমার   দেখলেন এক ব্যক্তি একটি মাত্র আঙ্গুর কুড়িয়ে পেয়ে তা ঘোষণা করছে। তিনি তাকে দূরী দিয়ে প্রহার করলেন এবং বললেন, ‘সেই জিনিসে অরা’ আছে, যে জিনিস গ্রহণ করলে আল্লাহ রাগান্বিত হন।’ (মিরক্বাত ৬/১৩৩)

## হৃদয়ের আমল ও অন্যান্য দেহাঙ্গের আমলের মাঝে পার্থক্য

উভয় আমলের মাঝে অবশ্যই পার্থক্য আছে। তবে উভয়ের মাঝে হার্দিক আমলের গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত বেশি। নিম্নের বিবরণে তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

১। হার্দিক ইবাদত নষ্ট হলে তার ফলে সংশ্লিষ্ট দৈহিক আমলও নষ্ট হয়ে যাবে। যেমন ইখলাস একটি হার্দিক ইবাদত। হৃদয় থেকে ইখলাস বিলীন হলে বান্দা শির্কে আপতিত হবে। বড় শির্ক বা মুনাক্কীতে আপতিত হলে ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। রিয়াতে আপতিত হলে সেই আমল বরবাদ হবে, যাতে রিয়ার অনুপ্রবেশ ঘটবে ইত্যাদি।

২। হার্দিক ইবাদত জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভ ও জান্নাত পেয়ে ধন্য হওয়ার মৌলিক কারণ। যেমন তাওহীদ, তাক্বওয়া, মুসলিমদের ব্যাপারে মন পরিস্কার রাখা ইত্যাদি।

৩। হার্দিক ইবাদত দৈহিক আমল অপেক্ষা কঠিন। যেমন আব্দুল্লাহ বিন আমর   এক লোকের নিকট থেকে মুসলিমদের ব্যাপারে মন পরিস্কার রেখে জান্নাতী হওয়ার খবর শুনে বলেছিলেন, ‘সেই আমলই তোমাকে ঐ মর্যাদায় পৌঁছিয়েছে। আর সেটাই আমরা পারি না।’ (আহমাদ ১২৬৯৭, নাসাঈর কুবরা ১০৫৯৭, আব্দুর রাযযাক ২১৬২ ১নং, ‘সুস্থ মন’ শিরোনাম দ্রঃ)

ইউনুস বিন উবাইদ (রাহিমাঃল্লাহ) তাঁর এক দ্বীনী ভাইয়ের চিঠির

জবাবে লিখেছিলেন, ‘তোমার চিঠি পেলাম। তাতে তুমি আমার অবস্থা লিখে তোমাকে জানাতে বলেছ। আমি তোমাকে জানাই যে, আমি আমার মনের কাছে আর্জি রাখলাম, তুমি মানুষের জন্য তাই পছন্দ কর, যা নিজের জন্য কর এবং মানুষের জন্য তাই অপছন্দ কর, যা নিজের জন্য কর। কিন্তু সে এ আর্জি থেকে দূরে থাকল। তারপর আমি পুনর্বীর তার কাছে আর্জি রাখলাম, ভালো ছাড়া মন্দ বিষয়ে লোকেদের চর্চা করবে না। কিন্তু দেখলাম, তার চাইতে গরমের দিনে রোযা রাখা বেশি সহজ। এই হল আমার অবস্থা ভাই! অস-সালাম।’ (নুযহাতুল ফুয়াল্লা ১/৫৩৯)

৪। হার্দিক ইবাদত প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার দিক থেকে দৈহিক ইবাদত অপেক্ষা বেশি উত্তম। বরং দৈহিক ইবাদতকে সৌন্দর্যমন্ডিত করে হার্দিক ইবাদত। কোন এক সলফ বলেছেন, ‘দুনিয়ার মিসকীনরা দুনিয়া থেকে বের হয়ে গেল অথচ তাতে সবচেয়ে সুন্দর জিনিসের স্বাদ গ্রহণ ক’রে গেল না।’ লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, ‘তাতে সবচেয়ে সুন্দর জিনিস কী?’ বললেন, ‘আল্লাহর মহব্বত, তাঁর সঙ্গ পেয়ে একাকিত্ব দূর করা, তাঁর সাক্ষাতের জন্য উদগ্রীব থাকা, তাঁর অভিমুখী থাকা এবং তিনি ছাড়া সব কিছু থেকে বৈমুখ থাকা।’ (তাহযীবু মাদারিজিস সালেকীন ২ ৪৫পৃঃ)

৫। দৈহিক ইবাদতের চাইতে হার্দিক ইবাদতের সওয়াব বেশি। বহু সলফে সালেহীন অধিক দৈহিক ইবাদত করার চাইতে হার্দিক ইবাদত করাকে প্রাধান্য দিতেন। অবশ্য তাঁরা দৈহিক ইবাদতকে গুরুত্বহীন ভাবতেন না। আবুদ দারদা রাঃ বলতেন, ‘এক ঘন্টা চিন্তা-গবেষণা করা রাত্রি জেগে নামায পড়ার চাইতে উত্তম।’ (নুযহাতুল ফুয়াল্লা ১/১৬০)

উম্মুদ দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে জিজ্ঞাসা করা হল, ‘আবুদ দারদার কোন্ ইবাদত বেশি ছিল?’ উত্তরে তিনি বললেন, ‘চিন্তা-গবেষণা করা ও উপদেশ গ্রহণ করা।’

৬। হার্দিক ইবাদত দৈহিক ইবাদতের উদ্দীপক ও উদ্যোক্তা। আবেদের হৃদয়ে যখন কোন ইবাদতের আগ্রহ ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, তখনই তার দেহাঙ্গ সেই ইবাদত করতে অনুপ্রাণিত হয় এবং তার কষ্টকে সহসায় বরণ ক’রে নেয়।

৭। হার্দিক ইবাদত দৈহিক ইবাদতকে বিশাল ক’রে তোলে। যেমন ইবনুল মুবারক বলেছেন, ‘এমন অনেক ক্ষুদ্র আমল আছে, যাকে নিয়ত বিশাল ক’রে তোলে এবং এমন অনেক বিশাল আমল আছে, যাকে নিয়ত ক্ষুদ্র ক’রে ফেলে।’

৮। হার্দিক ইবাদত অনেক সময় দৈহিক ইবাদতের বিকল্প হয়ে থাকে।

উদাহরণ স্বরূপ আল্লাহর পথে জিহাদ।

{لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (৭১)  
وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيَيْنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَرْحًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ} (৭২) سورة التوبة

“দুর্বল, পীড়িত এবং অর্থব্যয় করতে যারা অসমর্থ তাদের কোন অপরাধ নেই; যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষী হয়। সৎকর্মপরায়ণদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন পথ নেই। আর আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। আর ঐ লোকদেরও (বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন পথ) নেই, যারা তোমার নিকট এই উদ্দেশ্যে এল যে, তুমি তাদেরকে বাহন দান করবে, (যাদেরকে) তুমি বললে, ‘আমার নিকট তোমাদেরকে আরোহণ করাবার মত কোন বাহন নেই।’ তখন তারা এমন অবস্থায় ফিরে গেল যে, তাদের চক্ষু হতে অশ্রু বইতে লাগল এ দুঃখে যে, তাদের কাছে ব্যয় করার মত কোন কিছুই নেই।” (তাওবাহঃ ৯১-৯২)

অভিযোগ তো নেই-ই, তার ওপর তাদেরও নিয়ত অনুযায়ী সওয়াব আছে। জাবের বিন আব্দুল্লাহ আনসারী রাঃ বলেন, নবী সঃ-এর সাথে তাবুক অভিযান থেকে আমাদের প্রত্যাবর্তনকালে তিনি বললেন,

(( إِنَّ أَقْوَامًا خَلَفْنَا بِالْمَدِينَةِ مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلَا وَادِيًا ، إِلَّا وَهُمْ مَعَنَا ، حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ )) .

“আমাদের পিছনে মদীনায এরূপ কিছু লোক আছে যারা প্রত্যেক গিরিপথ বা উপত্যকা অতিক্রমকালে আমাদের সাথে রয়েছে। বিশেষ ওজর তাদেরকে ঘরে থাকতে বাধ্য করেছে।” (বুখারী ২৮৩৯নং)

আল্লাহর নবী সঃ বলেছেন,

(( مَنْ سَأَلَ اللَّهَ تَعَالَى الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشَّهَدَاءِ ، وَإِنْ مَاتَ

عَلَى فِرَاشِهِ )) . رواه مسلم

“যে ব্যক্তি সত্য নিয়তে আল্লাহর কাছে শাহাদত প্রার্থনা করবে, আল্লাহ তাকে শহীদদের মর্যাদায় পৌঁছিয়ে দেবেন; যদিও সে নিজ বিছানায় মৃত্যুবরণ করে।” (মুসলিম ৫০৩৯নং)

৯। দৈহিক আমলের নির্ধারিত সময়-সীমা আছে। কিন্তু হার্দিক আমলের কোন সময়-সীমা নেই, বরং তা বহুগুণে বর্ধিত। কেননা, দৈহিক আমল

যতই বেশি ও বিশাল হোক না কেন, তার নির্দিষ্ট সময় আছে। যেমন নামায, তার সময় আছে, রোযার সময় আছে, হজ্জের সময় আছে। কিন্তু হার্দিক ইবাদত সর্বাবস্থায় বান্দার সাথী থাকে, নিদ্রা ও জাগরণে, সুস্থতায় ও অসুস্থতায়, সুখে ও দুঃখে সব সময় তা চলমান থাকে। যেমন মহান আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা থেকে বান্দার হৃদয় কোন সময়ের জন্য শূন্য হয় না। সে দাঁড়িয়ে থাক বা শুয়ে, চলমান থাক বা বসে, মুসাফির থাক বা গৃহবাসী, পানাহারে থাক বা ইবাদতে, নিজের কাজে থাক বা চাকরির কাজে সর্বদা সেই মহাক্ষতের ইবাদত মনের মণিকোঠায় চালু থাকে। অনুরূপ ইখলাস, ভয়, ভরসা ইত্যাদি।

পরিশেষে জ্ঞাতব্য যে, হার্দিক ইবাদত বেশি গুরুত্ব ও মাহাত্ম্যপূর্ণ, তার মানে এই নয় যে, দৈহিক ইবাদতের কোন গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য নেই। উভয় প্রকার ইবাদতেরই গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য আছে, তবে তুলনামূলক বেশি আছে হার্দিক ইবাদতের। প্রত্যেক ইবাদতের প্রতিই যত্নবান হতে, প্রত্যেক ইবাদতকেই গুরুত্ব দিতে হবে ও তার যথার্থ হক আদায় করতে হবে। এটাই হচ্ছে মহান আল্লাহর আবেদগণের সঠিক পন্থা। (দঃ আ'মালুল কুলুব, খালেদ আস-সাবত)

## সুস্থ মন

কিয়ামতের বিভীষিকাময় ময়দান। জান্নাত-জাহান্নামের অনিশ্চয়তা নিয়ে সকল মানুষ চিন্তিত। সেখানে সাহায্যকারী কেউ নেই; না স্বজন-বন্ধু, না অর্থ-সম্পদ। কেউ কারো উপকার করবে না। অবশ্য উপকারী হবে সুস্থ অন্তর।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ}

“যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না; সেদিন উপকৃত হবে কেবল সেই; যে আল্লাহর নিকট সুস্থ অন্তঃকরণ নিয়ে উপস্থিত হবে।” (শুআ'রাঃ ৮৮-৮৯)

কেমন সে সুস্থ অন্তঃকরণ বা মন?

সুস্থ মন : যে মন সকল প্রকার পাপ-পঙ্কিলতা ও অসদাচরণ; যেমন হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, বিদ্বেষ, কুধারণা ইত্যাদি থেকে পরিচ্ছন্ন।

সুস্থ মন : যাতে কোন প্রকার এমন প্রবৃত্তি নেই, যা মহান প্রতিপালকের আদেশ ও নিষেধের বিরোধিতা করে। কোন প্রকার এমন সন্দেহ নেই, যা তাঁর বাণীকে অবিশ্বাস করে।

সুস্থ মন : যে মন মানুষের মঙ্গল কামনা করে। যে মন পরের শুভাকাঙ্ক্ষী হয়।

এই মনের মানুষই কিয়ামতে সহী-সালামতে অবস্থান করবে। এ মনের মানুষই জান্নাতের অধিকারী হবে।

আনাস বিন মালেক رضی اللہ عنہ বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে বসে ছিলাম। এক সময় তিনি বললেন, “এখন তোমাদের নিকট একজন জান্নাতী ব্যক্তি উপস্থিত হবে।” সুতরাং আনসারদের এক ব্যক্তি উপস্থিত হল, যার দাড়ি থেকে ওয়ূর পানি টপকাচ্ছিল এবং তার জুতোজোড়া বাম হাতে লটকানো ছিল।

পরের দিন নবী ﷺ একই কথা বললেন। সুতরাং তখনও সেই ব্যক্তি প্রথমবারের মতো উপস্থিত হল।

তৃতীয় দিনেও নবী ﷺ তাঁর একই কথা বললেন এবং সেই ব্যক্তি প্রথমবারের মতোই উপস্থিত হল।

অতঃপর নবী ﷺ উঠে গেলে আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস رضی اللہ عنہ লোকটির পিছু ধরলেন। তিনি তাকে বললেন, ‘আমি আমার আন্ধার সাথে ঝগড়া করেছি এবং কসম ক’রে বলেছি, আমি তিন দিন তাঁর কাছে যাব না। তুমি যদি দিন কয়টি কেটে যাওয়া পর্যন্ত আমাকে আশ্রয় দেওয়া ভালো মনে কর, তাহলে আমি তোমার কাছে থেকে যাব।’ সে বলল, ‘ঠিক আছে (থাকো)।’

আনাস رضی اللہ عنہ বলেন, আব্দুল্লাহ বলতেন, তিনি তার কাছে ঐ তিন রাত কাটিয়েছেন। কিন্তু তাকে রাতে কোন নামায পড়তে দেখেননি। অবশ্য সে জেগে উঠলে এবং বিছানায় পার্শ্ব পরিবর্তন করলে আল্লাহ আযযা অজান্নার যিক্র করত ও তকবীর বলত। পরিশেষে ফজরের নামায পড়তে উঠত।

আব্দুল্লাহ رضی اللہ عنہ বলেন, অবশ্য আমি তাকে ভালো ছাড়া অন্য কথা বলতে শুনিনি। অতঃপর যখন তিন রাত্রি অতিবাহিত হল এবং তার আমলকে আমি নগণ্য মনে ক’রে বসলাম, তখন আমি তাকে বললাম, ‘আল্লাহর বান্দা! আসলে আমার সাথে আমার আন্ধার কোন রাগারাগি ছিল না, ছাড়াছাড়িও না। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তিন-তিনবার বলতে শুনলাম, “এখন তোমাদের নিকট একজন জান্নাতী ব্যক্তি উপস্থিত হবে।” অতঃপর ঘটনাক্রমে তিনবারে তুমিই উপস্থিত হলে। তাই আমার ইচ্ছা হল, আমি তোমার কাছে রাত কাটিয়ে তোমার আমল কী তা দেখব এবং আমিও তার অনুসরণ করব। কিন্তু আমি তো তোমাকে বেশি আমল করতে দেখলাম না। তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বললেন, সে মর্যাদায় তোমাকে কিসে

পৌছে দিল?

সে বলল, ‘তুমি যা দেখলে তাই। তবে আমি আমার মনে কোন মুসলিমের প্রতি ধোঁকা দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করি না এবং কাউকে আল্লাহ মঙ্গল দান করলে আমি তাতে তার প্রতি হিংসাবোধ করি না।’

আব্দুল্লাহ রাঃ বললেন, ‘সেই আমলই তোমাকে ঐ মর্যাদায় পৌছিয়েছে। আর সেটাই আমরা পারি না।’ (আহমাদ ১২৬৯৭, নাসাঈর কুবরা ১০৫৯৭, আব্দুর রাযযাক ২১৬২ ১নং, সর্বশেষ তাহকীক অনুযায়ী আলবানীর নিকট ঘটনাটি সহীহ নয়, যযীফ তারগীব ১৭২৮নং, শুআইব আরনাউত সহীহ বলেছেন।)

এখানে একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে, সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন আমর রাঃ লোকটির কাছে রাত কাটানোর বাহানায় মিথ্যা বললেন কেন?

এর উত্তরে বলা যায় যে, সাহাবী রাঃ আসলে মিথ্যা বলেননি। বরং তিনি ‘তাওরিয়াহ’ (ছদ্মবাক্য) ব্যবহার করেছেন।

‘তাওরিয়াহ’র অর্থ এই যে, দ্ব্যর্থবোধক কথা বলে সত্য উদ্দেশ্য মনে গোপন রাখা, যা ব্যক্ত কথা অনুযায়ী মিথ্যা হয় না; যদিও আপাতঃদৃষ্টিতে এবং বাহ্যিক বাক্-ভঙ্গিতে মিথ্যাই বলা হয়। যদিও এটা এক প্রকার প্রবঞ্চনা ও ধোঁকা তবুও মিথ্যা বলা হতে বাঁচার জন্য তার প্রয়োগ শরীয়তে বৈধ। যদি তাতে কোন বিধেয় সং উপকার থাকে তবে। আর হ্যাঁ, ঐ ধরনের দ্ব্যর্থক কথা বলে কোন বাতিলকে হক বা হককে বাতিল সাব্যস্ত করা এবং কোন প্রকৃত অধিকারীর অধিকার বিনষ্ট করার উদ্দেশ্য যেন না হয়। নচেৎ এ ধরনের শব্দ বা কথা ব্যবহার হারাম।

তাহলে সাহাবী রাঃ-এর ‘তাওরিয়াহ’টা কী?

আসলে তিনি পূর্বে এক সময় আন্ধার সাথে ঝগড়া করেছিলেন। কিন্তু তিনি বাক্-ভঙ্গিতে প্রকাশ করলেন, তা যেন আজই।

সুফিয়ান বিন দীনার বলেন, আমি আলীর অন্যতম শিষ্য আবু বাশীরকে বললাম, ‘আমাদের পূর্ববর্তীদের আমল সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলুন।’ তিনি বললেন, ‘তারা সামান্য আমল করতেন, কিন্তু অসামান্য সওয়াব অর্জন করতেন।’ আমি বললাম, ‘তা কী কারণে?’ তিনি বললেন, ‘তাদের বক্ষস্থল সুস্থ থাকার কারণে?’

আবু দুজানা রাঃ অসুস্থ ছিলেন। তাঁর মুখমন্ডল চাঁদের মতো হাস্যোজ্জ্বল ছিল। তাঁকে বলা হল, ‘কী কারণে আপনার চেহারা চাঁদের মতো এত ঝলমল করছে?’

তিনি বললেন, ‘আমার নিকট দুটি আমল অপেক্ষা অন্য কিছু নির্ভরযোগ্য নেই : প্রথম এই যে, আমি সে বিষয়ে মুখ খুলতাম না, যে বিষয়



আমার সাথে সম্পৃক্ত নয়। আর দ্বিতীয় এই যে, মুসলিমদের জন্য আমার হৃদয় পরিষ্কার ছিল।’

কাসেম জুয়ী (রাহিমাঃল্লাহ) বলেছেন, ‘দ্বীনের মৌলিক বিষয় হল সংযম। সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত হল রাত্রি জাগরণ করা এবং বেহেশতের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পথ হল বন্ধস্থলকে পরিষ্কার রাখা।’

এতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই যে, যার মন সত্যিকারে পরিষ্কার, তার চরিত্র সবার চাইতে শ্রেষ্ঠ এবং সে সব চাইতে ভালো লোক।

আব্দুল্লাহ বিন আমর রাঃ বলেন, একদা মহানবী সঃ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, ‘সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ লোক কে?’ উত্তরে তিনি বললেন,

((كُلُّ مَحْمُومٍ الْقَلْبِ صَدُوقِ اللِّسَانِ)).

“সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ লোক হল সেই, যার হৃদয় হল পরিষ্কার এবং জিভ হল সত্যবাদী।”

জিজ্ঞাসা করা হল, ‘পরিষ্কার হৃদয়ের অর্থ কী?’ বললেন,

((هُوَ النَّقِيُّ النَّقِيُّ لَا إِمَّ فِيهِ وَلَا بَغْيٍ وَلَا غِلٌّ وَلَا حَسَدَ)).

“যে হৃদয় সংযমশীল, নির্মল, যাতে কোন পাপ নেই, অন্যায় নেই, ঈর্ষা ও হিংসা নেই।”

জিজ্ঞাসা করা হল, ‘তারপর কে?’ তিনি বললেন, “যে দুনিয়াকে ঘৃণা করে এবং আখেরাতকে ভালোবাসে।”

জিজ্ঞাসা করা হল, ‘তারপর কে?’ বললেন, “সুন্দর চরিত্রের মুমিন।”  
(ইবনে মাজাহ ৪২ ১৬, সহীহুল জামে ৩২৯ ১নং)

পক্ষান্তরে অসুস্থ মন?

সে মন পরের শ্রী দেখে কাতর হয়।

অন্যের ঋদ্ধি-বৃদ্ধি দেখে হিংসা করে।

অন্যের আয়-উন্নতি দেখে ধ্বংস-কামনা করে।

অন্যের প্রতি অকারণে বিদ্বেষ ও ঘৃণা পোষণ করে।

অন্যের প্রশংসা শুনে তার গা-জ্বালা করে।

নিজে যেমন ধ্বংসপ্রাপ্ত, তেমনি অন্যকেও সেই রূপ হওয়ার আশা করে।

বেশ্যা চায়, সারা বিশ্বের মহিলারা সবাই বেশ্যা হোক। আমার বদনাম হয়েছে, তেমনি সবারই হোক।

কিন্তু মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (১৭) سورة النور

“যারা বিশ্বাসীদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, তাদের জন্য আছে ইহলোকে ও পরলোকে মর্মস্তদ শাস্তি। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।” (নূর ৪: ১৯)

আসুন! আমরা মু’মিনদের জন্য আমাদের হৃদয়কে পরিষ্কার করি এবং তার জন্য হৃদয়-মনের নিয়ন্ত্রণকারী মহান প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা জানাই, যাতে পূর্বাপর কোন মুসলিমের প্রতি আমাদের মনে কোন প্রকার অপরিচ্ছন্নতা না থাকে।

{ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ

آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ } (১০) سورة الحشر

‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং বিশ্বাসে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাদেরকে ক্ষমা কর এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো দয়ালু, পরম দয়ালু।’ (হাশরঃ ১০)

## প্রবৃত্তি-পূজা

মানুষ সৃষ্টি হয়েছে এমন এক প্রকৃতি দিয়ে যার মধ্যে আছে তাওহীদ, সততা, পবিত্রতা ইত্যাদি। কিন্তু পরিবেশের কারণে তার মন পাটে যায়, পারিপার্শ্বিকতার চাপে তার হৃদয় বদলে যায়, পরিমন্ডলের নিত্য দেখা ও শোনার কর্মকান্ড তাকে সেই অনুযায়ী গড়ে তোলে।

মানুষ সৃষ্টি হয়েছে এমন জীব রূপে, যে নিজের মঙ্গল বুঝে নিতে পারে, কিন্তু পথ খুঁজে নিতে পারে না। পথ খুঁজতে নানা পথের সামনে ধন্দে পড়ে পথভ্রষ্ট হতে পারে। আবার সে এমন সৃষ্টি, যে নিজেকে কাবু ও নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

« لَمَّا صَوَّرَ اللَّهُ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ تَرَكَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَتْرَكَهُ فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يُطِيفُ

بِهِ يَنْظُرُ مَا هُوَ فَلَمَّا رَأَاهُ أَجْوَفَ عَرَفَ أَنَّهُ خُلِقَ خَلْقًا لَا يَتِمَّاكَ ».

“আল্লাহ যখন জান্নাতে আদমের মূর্তি তৈরি করলেন, তখন তাঁর ইচ্ছামতো কিছুদিন তাকে বর্জন করলেন। ইবলীস তার চারিপার্শ্ব ঘুরতে লাগল এবং দেখতে লাগল সেটা কী। অতঃপর সে যখন দেখল, তা ফাঁপা, তখন সে জানতে পারল, সে হবে এমন সৃষ্টি, যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না।” (মুসলিম ৬৮-১৫নং)

মানুষের মনে আছে প্রবণতা, আছে আবেগ, উৎকণ্ঠা, বিহ্বলতা ও

চঞ্চলতা। আছে আশা, আকাঙ্ক্ষা, কামনা, বাসনা ও স্পৃহা। আছে খেয়াল-খুশীর স্বেচ্ছাচারিতা। আছে প্রবৃত্তির টান, শয়তানী কুমন্ত্রণা। আছে বক্রতা ও টেরামি। আছে হঠকারিতা, ঔদ্ধত্য ও গোড়ামি। এত কিছুর মাঝে সে মন কীরূপে সঠিক পথে দৃঢ় থাকতে পারে, এত প্রতিকূল বাতাসের মাঝে কীভাবে মনতরী গন্তব্য বন্দরে পৌঁছতে পারে?

সেই জন্য মহান স্রষ্টা গাইড দিলেন মানুষকে, পথপ্রদর্শক পাঠালেন তার কাছে, নিয়ন্ত্রক জিনিস দিলেন তার ভিতরে, দিকদর্শন যন্ত্র দিলেন তার জীবন-তরীতে।

কিন্তু কিছু মানুষ মেনে নিল তাদের স্রষ্টার সেই নির্দেশনাকে। পক্ষান্তরে মেনে নিল না অধিকাংশ মানুষ। তারা তাদের নিজেদের বিবেক-বুদ্ধিকে প্রাধান্য দিল, নিজেদের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করল, নিজেদেরকে মহাজ্ঞানী মনে ক’রে স্রষ্টার পথ-নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করল। ফলে তাদের জীবন হল কম্পাসহীন জল-জাহাজের মতো, রাডার-বিচ্ছিন্ন উড়ো-জাহাজের মতো, সুতো-কাটা ঘুড়ির মতো, লাগামহীন ঘোড়ার মতো, ব্রেকহীন গাড়ির মতো। সুতরাং তারা হল সবচেয়ে বেশি বিভ্রান্ত, সবার চাইতে বেশি সীমালংঘনকারী। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ}

بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ } (سورة القصص ৫০)

“অতঃপর ওরা যদি তোমার আহবানে সাড়া না দেয়, তাহলে জানবে ওরা তো কেবল নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। আল্লাহর পথনির্দেশ অমান্য ক’রে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে, তার অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে? নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে পথনির্দেশ করেন না।” (ক্বাস্বাস্বঃ ৫০)

কেবল আহবানে সাড়া দেওয়াই নয়, মহানবী ﷺ-কে বিচারক মানতে হবে, তাঁর সিদ্ধান্ত ও ফায়সালা সর্বান্তঃকরণে মেনে নিতে হবে এবং মনে কোন দ্বিধা রাখাও চলবে না। যে তা না করবে, সে হবে মনপূজারী, সে মু’মিন হতে পারবে না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ

حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } (سورة النساء ৬৫)

“কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা বিশ্বাসী (মু’মিন) হতে পারবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে

তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বাঙ্গুঃকরণে তা মেনে নেয়।”

(নিসাঃ ৬৫)

মহান আল্লাহর অমোঘ নীতি, যা সীমা-অতিক্রমকারী ও অত্যাচারীদের জন্য তাঁর কাছে নির্ধারিত আছে; আর তা এই যে, তারা হিদায়াত থেকে বঞ্চিত থাকে। কারণ, নবীদেরকে মিথ্যা ভাবা, আল্লাহর আয়াতসমূহ হতে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া এবং নিরন্তর কুফরী ও বিদ্বেষ এমন অপরাধ, যাতে সত্য গ্রহণের যোগ্যতা ও তার দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যায়। এরপর মানুষ যুলুম, পাপ, কুফর ও শিকের অন্ধকারে হাবুডুবু খেতে থাকে। ঈমানের আলো তার ভাগ্যে আর জোটে না। এ হল মন-পূজার একটি অনিবার্য পরিণতি।

একই রীতির কথা মহান আল্লাহ বলেছেন,

{بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (২৭) فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} (সূরা الروم ৩০)

“অজ্ঞানতাবশতঃ সীমালংঘনকারীরা তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ ক’রে থাকে; সুতরাং আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন কে তাকে সৎপথে পরিচালিত করবে? তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত রাখ। আল্লাহর সেই প্রকৃতির অনুসরণ কর; যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটিই সরল ধর্ম; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।” (রুমঃ ২৯-৩০)

তারা স্রষ্টার জ্ঞান গ্রহণ করে না। নিজেদের জ্ঞানকেও সঠিকভাবে কাজে লাগায় না। বরং তারা এ প্রকৃত্ত্ব সম্বন্ধে অবগতই নয় যে, তারা জ্ঞান থেকে বঞ্চিত ও ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত। আর এই অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতার কারণে তারা নিজেদের বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে সক্ষম হয় না এবং নিজেদের প্রবৃত্তি ও বাতিল মতের অনুসারী হয়ে থাকে। ফলে স্রষ্টার হিদায়াতের আলো লাভে বঞ্চিত হয়। কারণ আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াত তাদেরই ভাগ্যে জোটে, যারা হিদায়াত অনুসন্ধানী ও তার আকাঙ্ক্ষী হয়। পক্ষান্তরে যারা তার সত্য-অনুসন্ধিৎসা থেকে বঞ্চিত হয়, তাকে ভ্রষ্টতার মাঝে ছেড়ে দেওয়া হয়।

আরো এক শ্রেণীর মন-পূজারী মানুষের জন্য মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ

مَاذَا قَالَ آتِنَا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ (১৬) وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ { (১৭) سورة محمد

“তাদের মধ্যে কতক তোমার কথা মন দিয়ে শোনে, অতঃপর তোমার নিকট হতে বের হয়ে জ্ঞানবানদেরকে বলে, এই মাত্র সে কী বলল? ওরাই তারা, যাদের অন্তরে আল্লাহ মোহর মেরে দেন এবং তারা নিজেদের খেয়াল-খুশীরই অনুসরণ করে। যারা সৎপথ অবলম্বন করে, তাদেরকে আল্লাহ সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে ধর্মভীরু হবার শক্তি দান করেন।” (মুহাম্মাদঃ ১৬-১৭)

কিছু মানুষ আছে, যারা শরীয়তের বিচার চায় না, আল্লাহর ফায়সালা মানে না, রাসুলের বিধান মানার মানসিকতা রাখে না। বরং তারা নিজেদের খেয়াল-খুশী অনুযায়ী বিচার করে, মুখ দেখে ডাল দেয় অথবা নিজের পাতে ঝোল টানে, অর্থের টানে পক্ষপাতিত্ব করে এবং বিচারে নিজেদের স্বেচ্ছাচারিতা চালায়। মহান আল্লাহ বিচারকার্যে নিজের মনপূজা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি দাউদ عليه السلام-এর উদ্দেশ্যে বলেছেন,

{يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ} (২৬) سورة ص

‘হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না, করলে এ তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ পরিত্যাগ করে, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি, কারণ তারা বিচার দিনকে ভুলে থাকে।’ (স্বাদঃ ২৬)

সুমহান বিচারক মু’মিনগণকে আমভাবে বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} (১৩০) سورة النساء

“হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা ন্যায় বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাক, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দাও; যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। সে বিভ্রান্ত হোক অথবা বিভ্রান্তী হোক, আল্লাহ উভয়েরই যোগ্যতর অভিভাবক। সুতরাং তোমরা

ন্যায়-বিচার করতে খেয়াল-খুশীর অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা পৈঁচালো কথা বল অথবা পাশ কেটে চল, তাহলে (জেনে রাখ) যে, তোমরা যা কর, আল্লাহ তার খবর রাখেন।” (নিসাঃ ১৩৫)

উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ ঈমানদারকে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার এবং ন্যায় অনুযায়ী সাক্ষ্য দেওয়ার প্রতি তাকীদ করছেন, যদিও তার কারণে তাকে অথবা তার পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে ক্ষতির শিকার হতে হয় তবুও। কেননা, সব কিছুর উপর সত্যের থাকে কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য।

অনুরূপ মহান আল্লাহর তাকীদ যে, কোন ধনবানের ধন এবং কোন দরিদ্রের দরিদ্রতার ভয় যেন তোমাদেরকে সত্য কথা বলার পথে বাধা না দেয়। বরং আল্লাহ এদের তুলনায় তোমাদের অনেক কাছে এবং তাঁর সন্তুষ্টি সবার উর্ধ্বে।

মোট কথা প্রবৃত্তির অনুসরণ, অন্ধ পক্ষপাতিত্ব অথবা বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে সুবিচার করতে বাধা না দেয়। যেমন, মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন,

(وَلَا يَجْزِيكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا)

অর্থাৎ, কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার না করাতে প্ররোচিত না করে। সুবিচার কর---। (সূরা মায়দাঃ ৮)

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন, “যদি তোমরা পৈঁচালো কথা বল অথবা পাশ কেটে চল---” অর্থাৎ, কথার পৈঁচে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা এবং পাশ কাটিয়ে যাওয়া বলতে (সত্য) সাক্ষ্য গোপন করা ও তা পরিত্যাগ করা। এই দু’টি জিনিস থেকেও বাধা প্রদান করা হয়েছে।

উক্ত আয়াতে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার প্রতি তাকীদ করা হয়েছে এবং এর জন্য যা যা প্রয়োজন তার প্রতি যত্ন নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন :-

\* সর্বাবস্থায় সুবিচার প্রতিষ্ঠা কর, তা থেকে পাশ কাটিয়ে যেয়ো না এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কার অথবা অন্য কোন চাপ বা প্রবর্তনা যেন এ পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। বরং এর প্রতিষ্ঠার জন্য তোমরা একে অপরের সাহায্যকারী হও।

\* তোমাদের কেবল লক্ষ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ। যেহেতু এ রকম হলে পরিবর্তন, হেরফের এবং গোপন করা থেকে তোমরা বিরত থাকবে। ফলে তোমাদের বিচার-ফায়সালা ন্যায়-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

\* ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষতি যদি তোমার অথবা তোমার পিতা-মাতার কিংবা তোমার আত্মীয়-স্বজনের উপর আসে, তবুও তুমি কোন

পরোয়া না ক’রে নিজের ও তাদের স্বার্থ রক্ষার তুলনায় সুবিচারের দাবীসমূহকে অধিক গুরুত্ব দাও।

\* ধনের কারণে কোন ধনীর খাতির করো না (যেমন ক্ষমতার কারণে কোন ক্ষমতাসীন নেতার খাতির করো না।) এবং কোন দরিদ্রের প্রতি দরিদ্রতার ফলে মায়া প্রদর্শন করবে না। কেননা, আল্লাহই জানেন তাদের উভয়ের কল্যাণ কিসে আছে?

\* সুবিচার কায়ম করার পথে প্রবৃত্তি, পক্ষপাতিত্ব এবং শত্রুতা যেন বাধা না হয়, বরং এ সব কিছুকে পরিহার ক’রে বাধাহীন সুবিচার করো।

যে সমাজে এই সুবিচারের যত্ন নেওয়া হবে, সে সমাজ হবে নিরাপত্তা ও শান্তির আধার এবং আল্লাহর পক্ষ হতে সেখানে অজস্র রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হবে। সাহাবায়ে কেরাম রাঃ এ বিষয়টিকে খুব ভালোভাবেই হৃদয়ঙ্গম ক’রে নিয়েছিলেন। সুতরাং আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাঃ সম্পর্কে এসেছে যে, রসূল সঃ তাঁকে খায়বারের ইয়াহুদীদের নিকট পাঠালেন, সেখানকার ফলসমূহ ও ফসলাদি অনুমান ক’রে দেখে আসার জন্য। ইয়াহুদীরা তাঁকে ঘুষ পেশ করল; যাতে তিনি তাদের ব্যাপারে একটু শিথিলতা প্রদর্শন করেন। তিনি বললেন, ‘আল্লাহর কসম! আমি তাঁর পক্ষ হতে প্রতিনিধি হয়ে এসেছি যিনি দুনিয়ায় আমার কাছে সব থেকে বেশী প্রিয়তম এবং তোমরা আমার নিকট সর্বাধিক অপ্রিয়। কিন্তু স্বীয় প্রিয়তমের প্রতি আমার ভালোবাসা এবং তোমাদের প্রতি আমার শত্রুতা আমাকে তোমাদের ব্যাপারে সুবিচার না করার উপর উদ্বুদ্ধ করতে পারবে না।’ এ কথা শুনে তারা বলল, ‘এই সুবিচারের কারণেই আসমান ও যমীনের শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনা সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে।’ (ইবনে কাযীর, আহসানুল বায়ান)

যারা নিজেদের মনের গোলামী থেকে পবিত্র থাকে, তারা কি তাদের মতো, যারা মনের খেয়াল-খুশীর গোলাম? কক্ষনই না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ} (١٤)

“যে ব্যক্তি তার প্রতিপালক হতে (আগত) সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে কি তার মত, যার নিকট নিজের মন্দ কর্মগুলো শোভনীয় প্রতীয়মান হয় এবং যারা নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে?” (মুহাম্মাদঃ ১৪)

বরং আল্লাহর গোলাম ও মনের গোলাম, উভয় প্রকার মানুষের মাঝে আসমান-যমীন তফাৎ। তিনি বলেছেন,

{فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ (৩৭) وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (৩৮) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ (৩৯) وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ (৪০) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ (৪১)}

“সুতরাং যে সীমালংঘন করেছে এবং পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে, জাহীম (জাহান্নাম)ই হবে তার আশ্রয়স্থল। পক্ষান্তরে যে স্বীয় প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রেখেছে এবং কুপ্রবৃত্তি হতে নিজেকে বিরত রেখেছে, জান্নাতই হবে তার আশ্রয়স্থল।” (ন-সিআতঃ ৩৭-৪১)

শুধু নিজেরই মন-পূজা নয়, বরং অন্য মানুষের মন-পূজা করতে নিষেধ করেছেন মহান প্রতিপালক। তিনি অঙ্গ লোকেদের খেয়াল-খুশীর আনুগত্য করতে নিষেধ ক’রে বলেছেন,

{ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ}

“এরপর আমি তোমাকে দ্বীনের বিশেষ বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছি; সুতরাং তুমি ওর অনুসরণ কর এবং অঙ্গদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না।” (জাযিয়াহঃ ১৮)

মহান আল্লাহ আমাদেরকে বিজাতির খেয়াল-খুশীর অনুসারী হতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন,

{وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنَّ آتِبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (১২০) سورة البقرة}

“ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা তোমার প্রতি কখনও সন্তুষ্ট হবে না; যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর। বল, আল্লাহর পথ-নির্দেশ (ইসলাম)ই হল প্রকৃত পথ-নির্দেশ (সুপথ)। তোমার নিকট আগত জ্ঞানপ্রাপ্তির পর তুমি যদি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহর বিপক্ষে তোমার কোন অভিভাবক থাকবে না এবং সাহায্যকারীও থাকবে না।” (বাক্বারাহঃ ১২০)

এখানে ধর্মকি দেওয়া হচ্ছে যে, যদি জ্ঞান আসার পরেও তুমি ঐ শ্রেণীর ভ্রষ্ট লোকদেরকে কেবল সন্তুষ্ট করার জন্য তাদের আনুগত্য কর, তাহলে তোমার কোন সাহায্যকারী থাকবে না। এখানে আসলে উস্মাতে মুহাম্মাদীকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, বিদআতী ও ভ্রষ্ট লোকেদের সন্তুষ্টি লাভের জন্য তারা যেন এমন কাজ না করে এবং কোন দ্বীনী ব্যাপারে তেষামোদ ও তার অযথা অপব্যখ্যা না করে।

তাদের বৈপরীত্য করতে আদিষ্ট মুসলিমরা। খেয়াল-খুশীবশতঃ তাদের



অন্ধানুকরণ করা যাবে না। তাদের দ্বীন বিষয়ক কোন কাজের সাদৃশ্য অবলম্বন করা যাবে না। উদাহরণ স্বরূপ আমরা মহান আল্লাহর নিম্নের বাণী প্রনিধান করতে পারি, তিনি বলেছেন,

{وَلَيْنَ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ} (سورة البقرة ١٤٥)

“যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তুমি যদি তাদের নিকট সমস্ত নিদর্শন পেশ কর, তবুও তারা তোমার ক্বিবলার অনুসরণ করবে না এবং তুমিও তাদের ক্বিবলার অনুসারী নও। তারাও একে অন্যের ক্বিবলার অনুসারী নয়। তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর তুমি যদি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর, তাহলে নিশ্চয়ই তুমি সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (বাক্বারাহঃ ১৪৫)

এখানেও মহান আল্লাহ ধর্মকি দিয়ে উম্মতকে সতর্ক করেছেন যে, কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও যদি তারা বিজাতি ও বিদআতীদের অনুকরণ করে, তাহলে তা যুলুম, সীমালংঘন ও ভ্রষ্টতা বৈ কিছুই নয়।

মহান আল্লাহর প্রেরিত দ্বীনে মানুষ মতভেদ সৃষ্টি করেছে, খেয়ালখুশীবেশে নানা মত ও পথ সৃষ্টি করেছে, সকলের দাবী তার দ্বীনটাই সঠিক, তার মতটাই নির্ভুল, তার যুক্তিটাই অকাট্য। কিন্তু মহান আল্লাহর ফায়সালা জানার পর কোন মানুষের জন্য বৈধ নয়, অন্য কারো নিজস্ব মতের অনুসরণ করা। বৈধ নয় স্বকপোলকল্পিত কোন ধর্মের, মনমানি কারো মতবাদের, স্বরচিত কারো তরীকার অনুসরণ। মহান আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-কে বলেছেন,

{وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ}

“এর পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি। সুতরাং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে তুমি তাদের বিচার-নিষ্পত্তি কর এবং যে সত্য তোমার নিকট এসেছে, তা ত্যাগ ক’রে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য এক একটি শরীয়ত (আইন) ও স্পষ্ট

পথ নির্ধারণ করেছি। ইচ্ছা করলে আল্লাহ তোমাদেরকে এক জাতি করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য (তিনি তা করেননি)। অতএব সংকর্মে তোমরা প্রতিযোগিতা কর, আল্লাহর দিকেই সকলের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছিলে, সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন।” (মায়িদাহঃ ৪৮)

মানুষের মাঝে বিচারকার্যেও কোন মানুষের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করা যাবে না। কোন নেতা-নেত্রীর চাহিদা অনুযায়ী বিচার-নিষ্পত্তি করা যাবে না। কোন মনগড়া সংবিধান দ্বারা মীমাংসা করা যাবে না। প্রজাগণের সুবিধা অনুসারে অথবা সংখ্যাগুরু জনসাধারণের স্বার্থ অনুসারে অথবা জনগণের নিজস্ব তৈরি আইনানুসারে দেশ শাসন করা যাবে না। কারণ স্রষ্টার বিধান প্রত্যাখ্যান ক’রে সৃষ্টির খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করা ভ্রষ্টতা ছাড়া কিছু নয়। মহান আল্লাহ নিজ নবী ﷺ-কে বলেছেন,

{وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (৫৭) أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} (৫০) سورة المائدة

“এবং (পুনঃ বলছি) আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তুমি তদনুযায়ী তাদের মধ্যে বিচার-নিষ্পত্তি কর এবং তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। আর এ সম্বন্ধে সতর্ক থাক, যাতে আল্লাহ যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, ওরা তার কিছু থেকে তোমাকে বিচ্যুত করতে না পারে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে জেনে রাখ যে, তাদের কোন কোন পাপের জন্য আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিতে চান এবং মানুষের মধ্যে অনেকেই তো সত্যত্যাগী। তবে কি তারা প্রাক-ইসলামী (জাহেলী) যুগের বিচার-ব্যবস্থা পেতে চায়? খাঁটি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিচারে আল্লাহ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর?” (মায়িদাহঃ ৪৯-৫০)

তিনি আরো বলেছেন,

{وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنَّ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ} (৩৭) سورة الرعد

“আর এভাবে আমি এ (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায় জীবন-বিধান স্বরূপ; জ্ঞান প্রাপ্তির পর তুমি যদি তাদের খেয়াল-খুশীর

অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমার কোন অভিভাবক ও রক্ষক থাকবে না।” (রা’দঃ ৩৭)

{قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ} (৭৭) سورة المائدة

অর্থাৎ, বল, ‘হে ঐশীগ্রন্থধারিগণ! তোমরা তোমাদের ধর্ম সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করো না এবং যে সম্প্রদায় ইতিপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে ও অনেকে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে, তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না।’ (মায়িদাহঃ ৭৭)

অর্থাৎ, ভ্রষ্ট জাতির খেয়াল-খুশীর অনুসরণ ক’রে সত্যের অনুসরণ করতে গিয়ে সীমা অতিক্রম করো না। যাঁর সম্মান প্রদর্শন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাঁর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন করে তাঁকে আল্লাহর আসনে অধিষ্ঠিত করো না। যেমন ঈসা ﷺ-এর ব্যাপারে তোমরা করেছ।

অতিরঞ্জন সর্বযুগে শির্ক ও ভ্রষ্টতার সব থেকে বড় উপকরণ হিসাবে দেখা গেছে। মানুষের মনে যাঁর প্রতি নিতান্ত বিশ্বাস ও ভালোবাসা আছে, সে তাঁর ব্যাপারে অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি করে থাকে। তিনি যদি ইমাম বা ধর্মীয় নেতা হন, তাহলে তাঁকে নবীদের মত নিষ্পাপ মনে করা এবং নবীদেরকে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত করা তো সাধারণ ব্যাপার। দুর্ভাগ্যবশতঃ মুসলিমরাও এই অতিরঞ্জন থেকে মুক্ত নয়। তারাও কিছু ইমাম ও উলামার ব্যাপারে অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি করেছে যে, তাঁদের রায় ও উক্তি এমনকি তাঁদের প্রতি সম্পৃক্ত ফতোয়া এবং ফিকহকেও রসূল ﷺ-এর হাদীসের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করেছে! (আহসানুল বায়ান)

বহু মানুষ আছে, যারা হক মানতে চায় না, জেনেও মানতে চায় না, অথবা না জেনেই গ্রহণ করতে চায় না। পক্ষান্তরে হকপন্থীদেরকে প্রতিহতও করতে পারে না। তখন বাধ্য হয়েই তারা নিরপেক্ষ প্রস্তাব পেশ করে। তখন নিজের ঘোলকেও টক বলতে চায় না এবং প্রতিপক্ষের ঘোলকেও মিষ্টি বলে স্বীকার করে না। পরিশেষে বলে, ‘তোমাদেরটাও ঠিক, আমাদেরটাও ঠিক!’ সমন্বয় সাধনের জন্য নানা সন্ধিচুক্তি আনয়ন করে। মহামিলনের নানা বুলি আওড়ায়, ‘তোমরা আমাদেরটা মেনে নাও, আমরা তোমাদেরটা মেনে নিই।’ তারা বাতিলকে সমর্থন করার আমন্ত্রণ জানায়। বাতিলকে মেনে নেওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানায়। যেমন মক্কার মুশরিকরা মহানবী ﷺ-এর কাছে এই (নিরপেক্ষ সন্ধি) প্রস্তাব রেখেছিল যে, এক বছর আমরা তোমার উপাস্যের ইবাদত করব এবং এক বছর তুমি আমাদের

উপাস্যের ইবাদত করবে। তারই ফলে অবতীর্ণ হয়েছিল শির্কমুক্তির একটি সূরা। মহান আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-কে আরো নির্দেশ দিলেন,

{قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ} (৫৬) سورة الأنعام

অর্থাৎ, বল, ‘তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে আহ্বান কর, নিশ্চয় তাদের উপাসনা করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে।’ বল, ‘আমি তোমাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করি না; করলে আমি বিপথগামী হব এবং সৎপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকব না।’ (আনআমঃ ৫৬)

অর্থাৎ, আমিও যদি তোমাদের মতই আল্লাহর ইবাদত করার পরিবর্তে তোমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী গায়রুল্লাহর পূজা করতে আরম্ভ ক’রে দিই, তাহলে অবশ্যই আমিও ভ্রষ্ট হয়ে যাব। অর্থাৎ, গায়রুল্লাহর পূজা করাই হল সব থেকে বড় ভ্রষ্টতা।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই ভ্রষ্টতাই অতি ব্যাপক। এমন কি মুসলিমদের একটি বড় সংখ্যা এতে নিমজ্জিত। জানি না, তাদের প্রতিপক্ষ কতটা তাদের উপাস্যের উপাসনা করে, কিন্তু তারা ওদের উপাস্যের উপাসনায় যোগ দেয় অথবা ওদের মতো তারাও গায়রুল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত হয়। ইসলাম এসেছে সৃষ্টির উপাসনা বর্জন করে মানুষকে একমাত্র মহান স্রষ্টার উপাসনায় উদ্বুদ্ধ করতে। সেখানে বহু সংখ্যক মুসলিম সৃষ্টির উপাসনায় সম্মতি ও সমর্থন জানায়। কেউ গায়রুল্লাহর পূজা না করলেও তাতে সম্মতি জানায়। কেউ ‘সব ধর্ম সমান’ বলে, কেউ জগা-খিচুরি ধর্ম উত্তম মনে করে, কেউ মানবতা ধর্মের ঢাক বাজায়, কেউ বলে, ‘সর্ব ধর্ম নিপাত যাক।’ এইভাবে তারা প্রকৃতি ও স্রষ্টার ধর্ম বাদ দিয়ে মনগড়া ধর্মের বুলি আওড়ায় এবং নিজেদের মনের খেয়াল-খুশীর পূজা করে।

কিছু মানুষ আছে, যারা নিজের খেয়াল-খুশীবশে হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করে। তারা আল্লাহর বিধান না মেনে নিজেদের রুচিবোধ ও বিবেকের বিধান বহাল করে। অথচ হালাল-হারাম করার অধিকার একমাত্র সৃষ্টিকর্তার। সুতরাং এ ব্যাপারে অবিশ্বাসীদের স্বেচ্ছাচারিতার অনুসরণ করা যাবে না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قُلْ هَلَمْ شَهِدْكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَبِإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ} (১৫০) سورة الأنعام

অর্থাৎ, বল, ‘তোমরা তোমাদের সাক্ষীদেরকে হাজির কর, যারা সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ এ নিষিদ্ধ করেছেন।’ অতঃপর তারা সাক্ষ্য দিলেও তুমি তাদের সাথে সাক্ষ্য দিও না। যারা আমার আয়াত (বাক্যাবলী)কে মিথ্যা মনে করেছে, যারা পরকালে বিশ্বাস করে না এবং প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায়, তুমি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। (আনআমঃ ১৫০)

বলা বাহুল্য, মানুষের মনগড়া তত্ত্ব অনুসারে সুদ, ঘুস, মদ, ব্যভিচার ইত্যাদিকে হালাল মানা যাবে না। মনপূজারীদের ইচ্ছা-অনুযায়ী কোন জিনিসকে বৈধািবৈধ মানা যাবে না। বরং হালাল তাই, যা আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ করেছেন এবং হারাম তাই, যা আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ করেছেন। সুতরাং এ ব্যাপারে ভ্রষ্টকারী ও ভ্রষ্টাচারীদের খেয়াল-খুশীর আনুগত্য করা যাবে না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا

اضْطُرَرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لِّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ}

“আর তোমাদের কী হয়েছে যে, যার যবেহকালে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে, তোমরা তা ভক্ষণ করবে না? অথচ তোমরা নিরুপায় না হলে যা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তা তিনি বিশদভাবেই তোমাদের নিকট বিবৃত করেছেন। অনেকে অজ্ঞানতাবশতঃ নিজেদের খেয়াল-খুশী দ্বারা অবশ্যই অন্যকে বিপথগামী করে। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সীমা লংঘনকারীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।” (আনআমঃ ১১৯)

দ্বীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে দাঈরা সংঘাতের মুখে পড়েন। পড়েন হুমকি ও ধমকির মুখে। প্রলোভন ও প্ররোচনা তাঁদেরকে বিচলিত করতে চায়। বিরোধীদের বিবাদ-বিসম্বাদ ও প্রতিবাদ তাঁদেরকে প্রতিহত করতে চায়। যদিও তাঁরা সকল নবী ও কিতাবে বিশ্বাস রাখেন এবং সকলের প্রতিপালকও এক। তবুও বিরোধীরা নিজেদের খেয়াল-খুশী অনুযায়ী সেই তাওহীদকে অস্বীকার করতে চায়, যে তাওহীদ ছিল প্রত্যেক নবী ও প্রত্যেক কিতাবের মূল বিষয়বস্তু। সে ক্ষেত্রে দাঈদেরকে অবিচল থাকার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-কে সম্বোধন করে বলেছেন, তুমি তাওহীদের প্রতি আহ্বান কর এবং এর উপর অটল থাক। আর তারা তাদের খেয়াল-খুশী ও প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে যে জিনিসগুলো গড়ে নিয়েছে যেমন, মূর্তিপূজা ইত্যাদি, তাতে তুমি তাদের অনুসরণ করো না। তিনি বলেছেন,

{فَلِذَلِكَ فَادُعْ وَاسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ

كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ} (১০) سورة الشورى

“সুতরাং এ জন্য তুমি আহ্বান কর এবং তোমাকে যেভাবে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকতে বলা হয়েছে সেভাবে তুমি প্রতিষ্ঠিত থাক। আর ওদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। বল, ‘আল্লাহ যে গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, আমি তাতে বিশ্বাস করি এবং তোমাদের মধ্যে ন্যায্যবিচার করতে আদিষ্ট হয়েছি। আল্লাহই আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালক। আমাদের কর্ম আমাদের জন্য এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের জন্য। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোন বিবাদ-বিসম্বাদ নেই। আল্লাহই আমাদেরকে একত্রিত করবেন এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন।” (শূরাঃ ১৫)

অহংকারী মানুষেরা নিজেদের মনপূজা করে। যেহেতু অহংকার হল সত্য প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছ করার নাম। সত্যকে অপছন্দ ক’রে এবং তা গ্রহণ না ক’রে কেউ যদি সত্যশ্রয়ীকে তাচ্ছিল্য করে, তাহলে তার পরিণাম নিশ্চয় ভালো হয় না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُم لِلْحَقِّ كَارِهُونَ (৭০) وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ} (৭১) سورة المؤمنون

“বস্তুতঃ সে তাদের নিকট সত্য এনেছে। আর তাদের অধিকাংশ সত্যকে অপছন্দ করে। সত্য যদি তাদের কামনা-বাসনার অনুগামী হত, তাহলে বিশৃংখল হয়ে পড়ত আকাশ-মন্ডলী, পৃথিবী এবং ওদের মধ্যবর্তী সবকিছুই; পক্ষান্তরে আমি তাদেরকে দিয়েছি উপদেশ, কিন্তু তারা উপদেশ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।” (মু’মিনুনঃ ৭০-৭১)

এখানে ‘সত্য’ বলতে দীন ও শরীয়তকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, দীন বা ধর্ম যদি তাদের ইচ্ছানুসারে অবতীর্ণ হত, তাহলে এ কথা স্পষ্ট যে, পৃথিবী ও আকাশের সমস্ত নিয়ম-শৃঙ্খলা ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত। যেমন তাদের ইচ্ছা এক উপাস্যের পরিবর্তে অনেক উপাস্য হোক। যদি সত্যই এ রকম হত, তাহলে কি বিশ্ব-জাহানের নিয়ম-শৃঙ্খলা ঠিক থাকত? অনুরূপ তাদের অন্যান্য ইচ্ছা ও বাসনাও রয়েছে।

অবিশ্বাসীদের একটা ধারণা হল, পরকাল বলে কিছু নেই, মানুষের ভালো-মন্দ কর্মের হিসাব বলে কিছু নেই। এ এক সর্বনাশী বিশ্বাস। কুপ্রবৃত্তির গোলামি ক’রে যে এ বিশ্বাস পোষণ করবে, সে নিশ্চয় ধ্বংস হবে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِيُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ (١٥) فَلَا يَصُدُّكَ

عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ} (১৬) সূরা طه

“কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, আমি এটা গোপন রাখতে চাই; যাতে প্রত্যেকেই নিজ কর্মানুযায়ী ফল লাভ করতে পারে। সুতরাং যে ব্যক্তি কিয়ামতে বিশ্বাস করে না ও নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, সে যেন তোমাকে তাতে বিশ্বাস স্থাপনে নিবৃত্ত না করে, নিবৃত্ত হলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।” (ত্বা-হাঃ ১৫-১৬)

আসলে অবিশ্বাসীরাও কুবিশ্বাস করে। আর সকল কুবিশ্বাস হল মনের খেয়াল-খুশীর কাটা ফসল। সুতরাং অবিশ্বাসীরাও উপাসনা করে, আর তাদের উপাস্য হল তাদের মন। আর যাদের উপাস্য নিজেদের মন ও খেয়াল-খুশী হয়, তারা কি সৎপথ পায়? কক্ষনো না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ

وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ} (২৩) الجاثية

“তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে তার খেয়াল-খুশীকে নিজের উপাস্য ক’রে নিয়েছে? আল্লাহ জেনেছেনই ওকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং ওর কর্ণ ও হৃদয় মোহর ক’রে দিয়েছেন এবং ওর চোখের ওপর রেখেছেন পর্দা। অতএব, আল্লাহ মানুষকে বিভ্রান্ত করার পর কে তাকে পথনির্দেশ করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?” (জাযিয়াহঃ ২৩)

মনপূজারী সেটাকেই ভাল মনে করে, যেটাকে তার প্রবৃত্তি ভাল মনে করে এবং সেটাকেই সে মন্দ মনে করে, যেটাকে তার প্রবৃত্তি মন্দ মনে করে। অর্থাৎ, আল্লাহ ও তাঁর রসুলের যাবতীয় বিধি-বিধানের উপর স্বীয় প্রবৃত্তির চাহিদাকে প্রাধান্য এবং তার জ্ঞান-বুদ্ধিকে বেশী গুরুত্ব দেয়। অথচ জ্ঞান-বুদ্ধিও পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অথবা স্বার্থপরতার শিকার হয়ে প্রবৃত্তির মতো ভুল সিদ্ধান্তও নিতে পারে।

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণকৃত পথনির্দেশ ও দলীল ছাড়াই স্বীয় মনমর্জির দ্বীন অবলম্বন করে, সে আসলে মনপূজারী। যেমন জাহেলী যুগের লোকেরা পাথর পূজা করত। অতঃপর যখন তুলনামূলক কোন সুন্দর পাথর পেয়ে যেত, তখন তারা পূর্বের পাথরকে ফেলে দিয়ে দ্বিতীয় পাথরটিকে উপাস্য বানিয়ে নিত। (ফাতহুল ক্বাদীর)

মনপূজারীর অবস্থা এই যে, হৃকপস্থীকে দেখে ব্যঙ্গ করে, নানা মন্তব্য

করে। উল্টে হকপন্থীকে বিপথগামী ধারণা করে। মহান আল্লাহ বলেছেন,  
 {وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُوكَ إِلَّا هُزُؤًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا (৫১) إِنَّ كَادَ  
 لَيُضِلَّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ  
 أَضَلُّ سَبِيلًا (৫২) أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (৫৩)}

“ওরা যখন তোমাকে দেখে, তখন ওরা তোমাকে কেবল উপহাসের পাত্ররূপে গণ্য করে এবং বলে, ‘এই কি সেই; যাকে আল্লাহ রসূল করে পাঠিয়েছেন? সে তো আমাদের দেবতাগণ থেকে আমাদেরকে দূরে সরিয়েই দিত; যদি না আমরা তাদের আনুগত্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকতাম।’ যখন ওরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন ওরা জানবে কে সর্বাধিক পথভ্রষ্ট। তুমি কি দেখ না তাকে, যে তার কামনা-বাসনাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? তবুও কি তুমি তার কর্মবিধায়ক হবে।” (ফুরক্বানঃ ৪১-৪৩)

যুগে যুগে মনপূজারীরা মহান আল্লাহর প্রেরিত নিদর্শন ও রসূলকে মিথ্যাঞ্জন করেছে। ফলে তাদের প্রাপ্য শাস্তি তারা প্রাপ্ত হয়েছে। মহাশাস্তি তো তাদের অপেক্ষায় আছে মহাদিনের পর। মহান আল্লাহ বলেছেন,  
 {وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعَرِّضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ (২) وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ  
 أَمْرٍ مُّسْتَقَرٌّ (৩) وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ (৪) سورة القمر}

“তারা কোন নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, ‘এটা তো চিরাচরিত যাদু।’ তারা মিথ্যা মনে করে এবং নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে, আর প্রত্যেক কাজের জন্য একটি স্থিরীকৃত সময় রয়েছে। তাদের নিকট এসেছে সংবাদ, যাতে আছে ধমক।” (ক্বামারঃ ২-৪)

কোন মুসলিম (আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণকারী) এক স্রষ্টার উপাসক নিজের মন-উপাসক হতে পারে না। হতে পারে না তার অনুগামী ও অনুগত, যে নিজ মন-পূজা করে।

স্রষ্টার অবাধ্যতা ক’রে মনপূজারী নেতার আনুগত্য করতে পারে না নেতৃত্বাধীন লোকেরা।

স্রষ্টার অবাধ্যতা ক’রে মনপূজারী গুরুর আনুগত্য করতে পারে না কোন শিষ্য।

স্রষ্টার অবাধ্যতা ক’রে মনপূজারী স্বামীর আনুগত্য করতে পারে না কোন স্ত্রী।

স্রষ্টার অবাধ্যতা ক’রে মনপূজারী স্ত্রীর আনুগত্য করতে পারে না কোন স্বামী।



স্রষ্টার অবাধ্যতা ক’রে মনপূজারী পিতামাতার আনুগত্য করতে পারে না কোন সন্তান। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا} (২৮)

“তুমি তার আনুগত্য করো না, যার হৃদয়কে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী ক’রে দিয়েছি, যে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে।” (ক/হফঃ ২৮)

মনের গোলামি করে অনেক মানুষ ধ্বংস হয়েছে। যারাই পাপাচারী, তারাই স্বেচ্ছাচারী, তারাই ধ্বংসোন্মুখ। যারাই আল্লাহর অবাধ্য, তারাই আসলে নিজ মনের বাধ্য। এমন মন-পূজার কতিপয় উদাহরণ কুরআন মাজীদ থেকে উদ্ধৃত হল :-

(১) আদম-পুত্র হাবীল ও ক্বাবীল। কুরবানী কবুল হওয়া-না হওয়াকে কেন্দ্র ক’রে ক্বাবীল মনের তাবেদারি করে এবং নিজ ভাইকে হত্যা করে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَأْتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (২৭) لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لَتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدَيَّ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَنَّكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (২৮) أُرِيدُ أَنْ تَبْؤَءَ بِيَأْتِي وَإِيَّاكَ فَتَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ (২৯) فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (৩০) سورة المائدة

“আদমের দুই পুত্রের (হাবীল ও কাবিলের) বৃত্তান্ত তুমি তাদেরকে যথাযথভাবে শুনিবে দাও, যখন তারা উভয়ে কুরবানী করেছিল, তখন একজনের কুরবানী কবুল হল এবং অন্য জনের কুরবানী কবুল হল না। তাদের একজন বলল, আমি তোমাকে অবশ্যই হত্যা করব। অপরজন বলল, আল্লাহ তো সংযমীদের কুরবানীই কবুল করে থাকেন। আমাকে হত্যা করার জন্য তুমি আমার প্রতি হাত তুললেও তোমাকে হত্যা করার জন্য আমি তোমার প্রতি হাত তুলব না, আমি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালককে ভয় করি। তুমি আমার ও তোমার পাপের ভার বহন কর এবং দোষখবাসী হও এই তো আমি চাই এবং এ হল যালেম (অনাচারী)দের কর্মফল। অতঃপর তার মন তাকে ভ্রাতৃ-হত্যায় উত্তেজিত করল, সুতরাং সে (ক্বাবীল) তাকে (হাবীলকে) হত্যা করল, ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হল।” (মায়িদাহঃ ২৭-৩০)

(২) এমন এক ব্যক্তি, যে আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান রাখত; কিন্তু পরে

পার্শ্বিক ভোগ-বিলাস ও শয়তানের পিছে পড়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। তার কথা মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (১৭৫) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرَكُهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (১৭৬) سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ} سورة الأعراف

“তাদেরকে ঐ ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়ে শোনাও, যাকে আমি আমার আয়াতসমূহ দান করেছিলাম, অতঃপর সে সেগুলিকে বর্জন করে, তারপর শয়তান তার পিছনে লাগে, ফলে সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। আমি ইচ্ছা করলে ঐ (আয়াতসমূহ) দ্বারা তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয় এবং নিজ কামনা-বাসনার অনুসরণ করে। তার উদাহরণ কুকুরের মত, ওকে তুমি তাড়া করলে সে জিভ বের করে হাঁপায় এবং তুমি ওকে এমনি ছেড়ে দিলেও সে জিভ বের করে হাঁপাতে থাকে। যে সম্প্রদায় আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে, তাদের উদাহরণ এটা। সুতরাং তুমি কাহিনী বিবৃত কর, যাতে তারা চিন্তা করে। যে সম্প্রদায় আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে ও নিজেদের প্রতি অনাচার করে, তাদের উদাহরণ কত নিকৃষ্ট!” (আ’রাফঃ ১৭৫-১৭৭)

(৩) মিসরের রানী যুলাইখার কাহিনী। রাজ-পরিবারে ইউসুফ যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হলেন, তখন তিনি রূপে-গুণে, প্রজ্ঞা ও জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে উঠলেন।

এতদিন যে মহিলা তাঁকে মায়ের মতো স্বগৃহে রেখে মানুষ করল, একদিন সেই তাঁর কাছে (উপযাচিকা হয়ে) যৌন-মিলন কামনা করল। সুযোগ বুঝে এক কক্ষে তাঁকে একা পেয়ে দরজাগুলি বন্ধ ক’রে দিয়ে বলল, ‘এস! (আমরা কাম-প্ৰবৃত্তি চরিতার্থ করি।)’

ইউসুফ বললেন, ‘আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (আমি এ কাজ করতে পারি না।) বাদশা আযীয আমার প্রভু! তিনি আমাকে সম্মানজনকভাবে স্থান দিয়েছেন। নিশ্চয় সীমালংঘনকারীরা সফলকাম হয় না।’

সেই নির্জন কক্ষে এক অপরূপ সুন্দর নবযুবককে নাগালের মধ্যে পেয়ে সেই মহিলা তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছিল। একজন পরিপূর্ণ যুবতীর

কাছে একটি যুবক আগুনের কাছে ঘিয়ের মতো। সুতরাং ইউসুফও তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়তেন; যদি না তিনি তাঁর প্রতিপালকের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করতেন। মহান আল্লাহ তাঁকে মন্দ কর্ম ও অশ্লীলতা হতে বিরত রাখবার জন্য কোন এক নিদর্শন প্রদর্শন করলেন। যেহেতু তিনি ছিলেন মহান আল্লাহর একজন নির্বাচিত বান্দা।

ইউসুফ মিলনে সম্মত হলেন না। যুলাইখা তাঁকে বারবার ফুসলাতে লাগল। অবশেষে সে তাঁর সাথে জবরদস্তি শুরু করল। ইউসুফ তার নিকট থেকে রক্ষা পাওয়ার মানসে পালাতে শুরু করলেন। দৌড়ে দরজার দিকে গেলে যুলাইখা পিছন হতে (তাঁকে টেনে রুখতে গিয়ে) তাঁর জামা ধরে টান দিল। জামা ছিঁড়ে গেল, কিন্তু তিনি থামলেন না। বরং দরজা খুলে বের হয়ে গেলেন।

কিন্তু দরজা খুলতেই দেখলেন রাজা দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন। বন্ধ কক্ষ থেকে দু'জনকে বের হতে দেখে রাজার সন্দেহ হওয়ারই কথা। নিজেকে বাঁচাবার জন্য স্ত্রী যুলাইখা ইউসুফের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে বলে উঠল, 'যে তোমার পরিবারের সাথে কুকর্ম কামনা করে, তার জন্য কারাগারে প্রেরণ অথবা অন্য কোন বেদনাদায়ক শাস্তি ব্যতীত কী দণ্ড হতে পারে?'

ইউসুফ বললেন, 'সেই আমার কাছে যৌন-মিলন কামনা করেছিল। (আমার কোন দোষ নেই।) সেই আমাকে কুকর্মে লিপ্ত হওয়ার জন্য বাধ্য করার চেষ্টা করেছে। আর আমি তার স্পর্শ থেকে বাঁচার জন্য বাইরের দরজার দিকে ছুটে পালিয়ে এসেছি।'

স্বামীর মনে সন্দেহ প্রবল হল। তিনি দোষী-নির্দোষ প্রমাণ করতে চাইলে যুলাইখার পরিবারের একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিল, 'যদি তার জামার সন্মুখ দিক ছিন্ন করা হয়ে থাকে, তাহলে মহিলাটি সত্য কথা বলেছে এবং সে মিথ্যাবাদী। আর যদি তার জামা পিছন দিক হতে ছিন্ন করা হয়ে থাকে, তাহলে মহিলাটি মিথ্যা কথা বলেছে এবং সে সত্যবাদী।'

সুতরাং রাজা যখন দেখলেন যে, তাঁর জামা পিছন দিক থেকে ছিন্ন করা হয়েছে, তখন তিনি স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বললেন, 'এটা তোমাদের (নারীদের) ছলনা; নিশ্চয় তোমাদের ছলনা বিরাট! হে ইউসুফ! তুমি এ বিষয়কে উপেক্ষা কর। (কারো নিকট প্রকাশ ও প্রচার করো না।) আর হে নারী! তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তুমিই অপরাধিনী।'

আযীযের স্ত্রী এক সময় দোষ স্বীকার ক'রে বলল, 'এক্ষণে সত্য প্রকাশ পেয়ে গেল। আমিই তার কাছে যৌন-মিলন কামনা করেছিলাম, আর সে অবশ্যই সত্যবাদী। এটা এ জন্য যে, যাতে সে জানতে পারে যে, তার

অনুপস্থিতিতে আমি তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি এবং আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র সফল করেন না।

{وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ

رَحِيمٌ} (সূরা ৫৩) سورة يوسف

আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না, মানুষের মন অবশ্যই মন্দকর্ম-প্রবণ, কিন্তু সে নয় যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’ (সূরা ইউসুফ : ৫৩)

বলা বাহুল্য, যারা অবৈধ ভালোবাসা করে, যে প্রেমিক-প্রেমিকা চুপে-চুপে, চুরি-ছুপে, ঝোড়ে-ঝোপে অবৈধ প্রেম নিবেদন ক’রে বেড়ায়, যে মজনু মা-বাপের হৃদয়ে ছুরি মেরে তাদের রক্ত দিয়ে লায়লার পায়ে আলতা পরায়, যে প্রেমিকা মা-বাপের বুক লাথি মেরে রসের নাগরের সাথে চোরের মতো পালিয়ে যায়, যারা প্রেম-কুন্ডার কামড়ে পাগল হয়ে দ্বীন, লজ্জা, বংশ-মর্যাদা, মান-সম্মান সবকিছু বিসর্জন দেয়, তারা কি প্রেমপূজারী বা মনপূজারী নয়? অবশ্যই।

এক প্রকার ফিতনাগ্রস্ত মন, যা মন্দকে মন্দ জানে না, ঘৃণ্যকে ঘৃণা করে না, পাপকে পাপ ভাবে না, অন্যায়ের প্রতিবাদ করে না, ভালোকে ভালো মনে করে না, ভালোর কদর করে না, বরং ভালোকে মন্দ মনে করে এবং মন্দকে ভালো মনে করে। এমন মনের মানুষও একপ্রকার মনপূজারী। মহানবী ﷺ বলেছেন,

« تُعْرِضُ الْفِتْنَةُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا فَأَيُّ قَلْبٍ أَشْرَبَهَا نُكِبَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءٌ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِبَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءٌ حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ عَلَى أَبْيَضٍ مِثْلَ الصَّفَا فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْآخِرُ أَسْوَدُ مُرَبَادًا كَالْكُوزِ مُجَحِّيًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أَشْرَبَ مِنْ هَوَاهُ » .

“মানুষের হৃদয়ে চাটাইয়ের পাতা (বা ছিলকার) মত একটির পর একটি করে ক্রমান্বয়ে ফিতনা প্রাদুর্ভূত হবে। সুতরাং যে হৃদয়ে সে ফিতনা সঞ্চারিত হবে, সে হৃদয়ে একটি কালো দাগ পড়ে যাবে এবং যে হৃদয় তার নিন্দা ও প্রতিবাদ করবে, সে হৃদয়ে একটি সাদা দাগ অঙ্কিত হবে। পরিশেষে (সকল মানুষের) হৃদয়গুলি দুই শ্রেণীর হৃদয়ে পরিণত হবে। প্রথম শ্রেণীর হৃদয় হবে মসৃণ পাথরের ন্যায় সাদা; এমন হৃদয় আকাশ-পৃথিবী অবশিষ্ট থাকা অবধি-কাল পর্যন্ত কোন ফিতনা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর হৃদয় হবে উবুড় করা কলসীর মত ছাই রঙের;

এমন হৃদয় তার সঞ্চারিত ধারণা ছাড়া কোন ভালোকে ভালো বলে জানবে না এবং মন্দকে মন্দ মনে করবে না (তার প্রতিবাদও করবে না)।”  
(মুসলিম ৩৮-৬নং)

যে প্রবৃত্তির পূজারী নয়, সেই প্রকৃত স্বাধীন মানুষ। নচেৎ প্রবৃত্তিপূজারী পরাধীনতায় বাস করে। সে স্বেচ্ছাচারিতা চালায় ঠিকই, কিন্তু সে আসলে মনের হাতে বন্দী থাকে।

মনপূজার অনিবার্য পরিণতি নানা ফিতনা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, গৃহযুদ্ধ, ফির্কাবন্দি, দলাদলি, নতুন নতুন মযহাব ও ধর্মের আবিস্কার।

মনপূজারী কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মানে না।

মনপূজারী কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর অপব্যাখ্যা করে।

মনপূজারী নিজের মনোমতো দলীল প্রয়োগ করে, যদিও তা দুর্বল বা জাল হয়। বরং তা সহীহ প্রমাণ করার জন্য খুব পায়তারা দেখায়।

মনপূজারী কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর সহীহ বুঝ অহংকারবশতঃ প্রত্যাখ্যান করে এবং হকপন্থী উলামাগণকে তুচ্ছজ্ঞান করে।

মনপূজারী নিজের সপক্ষে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর দলীল না পেয়ে প্রতিপক্ষকে গালি দিয়ে প্রতিহত করার অপচেষ্টা করে।

মনপূজারী কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর বিরোধী, কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর মনগড়া ব্যাখ্যা গ্রহণকারী, সলফদের অর্থ ও ব্যাখ্যা বর্জনকারী, মনপূজারী আসলে বিদআতী। আসলে একজন সুবিধাবাদী।

সে মনপূজারী নয়, যে মনকে উদার রাখে, যার মনে গৌড়ামি নেই। যে সরল মনে সহীহ দলীল-সহ হক জেনে তার অনুসরণ করে।

সে মনপূজারী নয়, তাগুতপূজারীও নয়। সে একমাত্র আল্লাহর অনুরাগী। সে হল মহান প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুসংবাদপ্রাপ্ত জ্ঞানী ও সুপথপ্রাপ্ত।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ  
(۱۷) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ  
أُولُوا الْأَلْبَابِ} (۱۸) سورة الزمر

“যারা তাগুতের পূজা হতে দূরে থাকে এবং আল্লাহর অনুরাগী হয়, তাদের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার দাসদেরকে, যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং যা উত্তম তার অনুসরণ করে। ওরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং ওরাই বুদ্ধিমান।” (যুমারঃ ১৭- ১৮)

## হৃদয়ের রোগসমূহ

মানুষের মনের ভিতরে অনেক রোগ বাসা বাঁধে। মানসিক রোগী পার্থিব সুখ-সন্তোষ থেকে চির বঞ্চিত হয়। অবশ্য আমরা এখানে অন্য ধরনের রোগের কথা বলব, যে রোগ আসলে এক-একটা পাপ। আর সে পাপের স্থল হল হৃদয়। আমরা এখানে সেই সকল রোগের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করব।

### ১। শির্ক :

মানুষের হৃদয়ে সবচেয়ে বড় রোগ হল শির্ক তথা শিকী বিশ্বাস।

মুশরিক অপবিত্র হয়। অসুস্থ হৃদয়ে যাকে-তাকে অমূলক ভয় করে। অকারণে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়। অস্বাভাবিকভাবে আতঙ্কিত হয়।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا}

وَمَا وَاهُمْ النَّارُ وَبُئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ} (সূরা আল عمران ১০১)

“যারা কাফের তাদের হৃদয়ে আমি ভীতির সঞ্চার করব, যেহেতু তারা আল্লাহর সাথে শির্ক করেছে; যার সপক্ষে আল্লাহ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। জাহান্নাম হবে তাদের নিবাস। আর অনাচারীদের আবাসস্থল অতি নিকৃষ্ট!” (আলে ইমরানঃ ১৫১)

তিনি আরো বলেছেন,

{وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا} (৬)

“কতিপয় মানুষ কতক জ্বিনদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করত, ফলে তারা তাদের ভয় বাড়িয়ে দিত। (জ্বিনঃ ৬)

মুশরিক যার-তার উপর ভরসা রাখে, যার-তার উপর নির্ভর করে। আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপর ভরসা রেখে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, নদী-পাথর, মূর্তি-কবর, পশু-পাখী, তাবীয-কবচ, তার-সুতো, ধাতু-কড়ি ইত্যাদিকে বিপত্তারণ বা রোগমুক্তিদাতা ধারণা করে।

মুশরিক যার-তার কাছে আশা রাখে, যাকে-তাকে বড় মানে। সম্মানিত মানব হয়েও যার-তার সামনে মাথা নত করে, যাকে-তাকে সিজদা করে। মন নিচ হওয়ার কারণে নিজের অপমান নিজে করে!

২। ‘রিয়্য’ (লোক-প্রদর্শনমূলক কার্যকলাপ) ও ‘সুমআহ’ (লোককে শুনিয়ে করা কাজ)

মানুষ এমন অনেক কাজ করে, যাতে তার একাগ্রতা থাকে না, কোন আন্তরিকতা থাকে না। এটা একটা হার্দিক রোগ। যে কাজ করে, পরিস্থিতি হিসাবে সে কাজের পিছনে তার নানা উদ্দেশ্য থাকতে পারে। সে কাজ হয়তো বাধ্য হয়ে করছে অথবা নিছক কর্তব্য বলে করছে। পার্থিব কর্মে উদাহরণ দেখুন, যে কাজ মানুষ নিজের জন্য করে, সে কাজ পরের হলে করে না। নিজের কাজে যে আন্তরিকতা ও যত্ন থাকে, পরের কাজে তা থাকে না।

আমেরিকার এক ছুতোর কাঠের ঘর বানানোর এক কোম্পানিতে চাকরি করত। কাজে বহু পুরাতন ও কারিগরিতে বড় সুদক্ষ ছিল সে। মাসিক বেতনে খুব সুন্দর কাজ করত। এক সময় সে কাজ থেকে অবসর চাইল মালিকের কাছে, বোনাসও চাইল। মালিক বলল, ‘সবশেষে একটি ঘর বানিয়ে তোমাকে অবসর দেব।’ মন না চাইলেও ছুতোর তা বানাতে বাধ্য হল। সুতরাং সে ঘরটি তেমন সুন্দর হল না। মালিক বলল, ‘এবার তুমি অবসর নিতে পার। আর এই ঘর তোমার বোনাস।’ ছুতোরের বড় আফসোস হল, আগে জানলে ঘরটাকে সে আরো সুন্দর বরং সবচেয়ে বেশি সুন্দর ক’রে বানাতো।

লক্ষ্য করুন, তার আফসোস এ কথার প্রমাণ যে, সে কাজটি নিজের মতো ক’রে করেনি। যে কোনও কারিগর, মিস্ত্রি, চাকর, চাকুরে, ব্যবসায়ী, পণ্য প্রস্তুতকারী, কৃষক ইত্যাদি যে কোনও কর্মচারী, যে পরের জন্য কিছু করে, তার মনে উক্ত রোগ থাকতে পারে।

ড্রাইভার যখন মালিকের বা কোম্পানির গাড়ি চালায়, তখন যে বেপরোয়া হয়ে চালায়, নিজের গাড়ি চালানোর সময় সে বেপরোয়া হয়ে চালায় না। কারণ আপন ভালাই পাগলেও বোঝে।

নিজের রোগী, পরের রোগী অথবা টাকা-ওয়ালা রোগী ও বিনি-টাকার রোগী দেখার সময় চিকিৎসকদের মনোরোগ লক্ষ্য করুন। আন্তরিকতার মাঝে বড় ফারাক নজরে আসবে।

ইবাদতের কাজে মানুষের মনে অনুপ্রবেশ করে নানা এমন চিন্তা, যা তার আমলকে নষ্ট ক’রে দেয়। ভালো কাজকে খারাপ ক’রে দেয়। যেহেতু নিয়ত অনুসারে কাজের মান নির্ণয় হয়।

মানুষ ভালো কাজ করে, কিন্তু তাতে উদ্দেশ্য হয় লোককে দেখানো, যাতে পার্থিব কোন স্বার্থসিদ্ধি হয়। সে কাজ দ্বারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি বা

সওয়াব উপার্জন উদ্দেশ্য থাকে না। থাকে মানুষের মনস্তষ্টির আশা, থাকে প্রশংসার আশা, থাকে সুখ্যাতি ও সুনাম কুড়াবার উদ্দেশ্য। তার ফলে কাজটাই বিফল হয়ে যায়।

একজন নামায পড়ছিল আল্লাহর জন্য। হঠাৎ একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির আগমন ঘটল সেখানে। অমনি গেল নামাযের গতি বদলে। নামায অপেক্ষাকৃত সুন্দর হতে লাগল। নামাযে অনুপ্রবেশ করল ‘রিয়া’ চোর। অতঃপর সে লুণ্ঠে নিল নামাযকে। সেই নামাযে শরীক হয়ে গেল ঐ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি।

এক ব্যক্তি একজনের কাছে চাকরি করে। সে মুসলিম। মালিক নামাযী, সুতরাং সে নামাযী পছন্দ করে। কিন্তু তার চাকর বেনামাযী। মালিক বলল, ‘তুমি যদি নামায পড়, তাহলে বেতন আরো ৫০০ টাকা বেশি পাবে।’ শুরু হয়ে গেল নামায, কিন্তু অতিরিক্ত ৫০০ টাকা লাভের জন্য।

নতুন বেনামাযী জামাই এসেছে। নামাযী শ্বশুরবাড়িতে সমালোচনা শুরু হল, ‘জামাই বেনামাযী।’ সে কথা বউ পৌঁছে দিল তার কানে। বদনাম থেকে বাঁচার জন্য শুরু ক’রে দিল নামায। কিন্তু আল্লাহর জন্য নয়, শ্বশুরবাড়ির লোকের জন্য।

নতুন বউ এসেছে শ্বশুরবাড়ি। বউ পর্দানশীন নয়। পর্দাবাড়িতে সমালোচনা শুরু হল, ‘বউ বেপর্দা।’ সমালোচনা থেকে রক্ষার খাতিরে বউ হয়ে গেল কলাবউ। পর্দা ছিল একটি ফরয কর্ম। কিন্তু তা করা হল দুর্নাম থেকে বাঁচার জন্য।

বউ দেখে এলে বউ পছন্দ হল। বউ সুন্দরী, ঘরনী ও দ্বীনদার। কিন্তু কনেপক্ষ বলল, ‘বরের দাড়ি নেই। দাড়ি-ওয়ালা ছাড়া জামাই করব না।’ সাথে সাথে বর দিল দাড়ি ছেড়ে। দাড়ি হল এক মহিলাকে লাভের জন্য, নবীর স্ননত পালন ক’রে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য নয়।

দ্বীনদার যুবক। গালভরতি সুন্দর স্ননতী দাড়ি। বিবাহ-বাসরে সুন্দরী বউ বলল, ‘তুমি এ বয়সে দাড়ি রেখেছ? দেখে বুড়া লাগে। বয়স হলে রাখবে।’ বাস! সকাল হলে সেলুনে ক্লিনসেফ হয়ে গেল। বিবির মনকে উন্নত করতে গিয়ে নবীর স্ননত ভুলুষ্ঠিত হল!

আর এ কথা বিদিত যে, কারো মনকে তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে আমল যেমন ‘রিয়া’ ও শির্ক, তেমনি কারো মনকে তুষ্ট করতে গিয়ে কোন আমল ত্যাগ করাও ‘রিয়া’ ও শির্ক।

এক হাজী প্রত্যেক বছর হজ্জ করে। মুআল্লিম হয়ে অথবা অপরের পক্ষ থেকে বদলী হজ্জ করে টাকা উপার্জনের জন্য অথবা হজ্জস্থলে ব্যবসা



করার জন্য। মূল উদ্দেশ্যই তাই। তার হজ্জ হয় টাকা কামানোর অসীলা।

একজন দ্বীনের দায়ী ভালো বক্তা। বক্তৃতার জন্য ফিস নেন হাজার-হাজার টাকা। উদ্দেশ্য তাঁর টাকা কামানোই। দ্বীন প্রচার তাঁর নেশা নয়, অর্থের প্রসার তাঁর পেশা হয়।

‘দিবানিশি পোড়া পেটের লাগিয়া,  
কি না করিতেছি ঘুরিয়া ঘুরিয়া।  
বাণীরে বানরী করিয়া যতনে,  
নাচাইয়া ফিরি ভবনে ভবনে।’

কত শত তালেবে ইলম ইলম শিক্ষা করে চাকরির উদ্দেশ্যে, দুনিয়া কামাবার উদ্দেশ্যে। আসল উদ্দেশ্য তাই।

কত শত ক্বারী কুরআন পড়েন দুনিয়া উপার্জনের উদ্দেশ্যে।

কত শত ইমাম ইমামতি করেন পেট চালানোর জন্য, পরিবারের ভরণ-পোষণ করার জন্য।

কত দানী দান করে, কত মুজাহিদ জিহাদ করে, কত দাঈ দাওয়াতের কাজ করে, দাওয়াত অফিসের প্রতিনিধিত্ব করে, কত মুদারিস দর্স দান করে, কত শিক্ষক শিক্ষকতা করে কেবল দুনিয়ার জন্য, আল্লাহর জন্য নয়।

এক প্রবাসী ভাই বিদাতী গ্রামের মানুষ। তাঁর আন্মা মারা গেলেন। বাড়ি ফিরলে আত্মীয়স্বজনরা গ্রাম খাওয়াতে বলল। তিনি বললেন, ‘আমি মায়ের নামে সাদকা করব, কোন অনুষ্ঠান করব না।’ বড় বোন বলল, ‘আরব থেকে টাকা কামাই ক’রে এনেছিস, মায়ের নামে খরচ করা।’ তিনি বললেন, ‘সঠিক পথে খরচ করব, বেঠিক পথে নয়। গ্রাম খাওয়ালে মুসলিম-মুশরিক, আস্তিক-নাস্তিক, নামাযী-বেনামাযী সকলকে খাওয়াতে হবে। এমন লোক খাবে যে দুআও করবে না, করতে জানে না, পরন্তু লবণ বা ঝাল কম-বেশি হলে বদনাম করতে ছাড়বে না।’ দোলাভাই বলল, ‘ছাড়ো ওকে, ও বখীল। খরচ করার ভয়ে আল্টা-পাল্টা বকছে।’ মোড়ল বললেন, ইমাম সাহেব বললেন, ‘এ কেমন মায়ের বেটা তুমি? সবাই খাওয়ায়, আর তুমি এ কথা বলছ? সবাই কি তাহলে বোকা, আর তুমি একাই বুদ্ধিমান? সউদী আরব গিয়ে কি তোমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে?’ কেউ শুনল না মনের কথা, শয্যাসঙ্গিনীও না। পরিশেষে তিনি ৭টি গরু যবাই ক’রে বিরাট ভোজ করলেন! বাধ্য হয়ে করলেন, বদনাম থেকে বাঁচার জন্য করলেন। এতে কি তাঁর মা উপকৃত হবেন?

সুনাম নেওয়ার জন্য অথবা বদনাম থেকে বাঁচার জন্যই অনেকে মেহমান খাওয়ান, দাওয়াত খাওয়ান, ভালো খাওয়ান। এতে কি খাওয়ানোর সওয়াব

পাবেন?

অনেকে হাতে তসবীহ-দানা বা জপমালা নিয়ে জপ করেন, অনেকে অপরকে শুনিয়ে শুনিয়ে তসবীহ পড়েন, অনেকে অপরকে দেখিয়ে চোখের পানি ফেলেন, যেন তিনি আল্লাহর ভয়ে কাঁদছেন। কিন্তু আসলে তা নয়। তারা এ সবে সওয়াব তো পাবেই না, উল্টে শির্ক লিপিবদ্ধ হবে।

ইবাদত যেখানে সামাজিকতা, লৌকিকতা বা দেশাচারের সাথে লুটাপুটি খায়, সেখানেই সমস্যাটা বেশি। সেখানেই মনকে ধরে রাখা কঠিন। সেখানেই ইবাদত বরবাদ যায় এবং গোনাহ লাযেম হয়ে যায়। বিশেষ ক’রে সমাজের বিবাহ, জানাযা, ঈসালে সওয়াব, কুরবানী, আকীকা, মুসলমানি বা খতনা ইত্যাদিতে বিষয়টি লক্ষ্য করা যেতে পারে।

এমনিতেই মুসলিম অতিরিক্ত নফল ইবাদত করতে সক্ষম হয় না। আবার যে সকল ইবাদত না করতে চাইলেও সামাজিকতার গডডলিকাপ্রবাহে পড়ে করতে হয়, তাতেও যদি নিয়ত ঠিক না ক’রে লোকপ্রদর্শন উদ্দেশ্য হয় এবং ‘রিয়া’ সুন্দরী মনের মণিকোঠায় অনুপ্রবেশ ক’রে মনের গতিক পাল্টে দেয়, তাহলে অবশ্যই সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অবশ্যই সে লাজ্জিত হবে, অপমানিত হবে।

আপনি নিজের মনকে জিজ্ঞাসা ক’রে দেখতে পারেন, সুন্দরী ‘রিয়া’র সাথে আপনার কোন সম্পর্ক আছে কি না? মন আপনাকে জবাব দেবে।

আপনার ছেলে বা মেয়ের বিয়েতে বিশাল খরচ ক’রে এত ধুমধাম কেন করলেন?

আপনার আক্সা বা আন্মা মরাতে গরু যবাই ক’রে, পুকুরের মাছ ধরে ভোজবাজি কেন করলেন?

ঈসালে সওয়াবে উল্লেখযোগ্য আনুষ্ঠানিকতা কেন করলেন?

পরিবারের তরফ থেকে একটা ছাগল কুরবানী দিলেই যথেষ্ট হতো। কিন্তু আপনি একটা গরু কেন দিলেন? কেন সবার চেয়ে বেশি মূল্যবান কুরবানী দিতে গেলেন?

আকীকাতে কেন ছাগল ছেড়ে গরু দিতে গেলেন? মেয়ের আকীকায় একটা পশুই যথেষ্ট ছিল, দুটা দিলেন কী জন্য?

অভিসারিকা ‘রিয়া’ সুন্দরীর ডাকে সাড়া দিচ্ছেন না তো? তারই তাকীদে অনর্থক আপনি আপনার অর্থের অপচয় ঘটাচ্ছেন না তো?

অপ্রয়োজনে নামের আগে আল-হাজ্জ, হাজী, মওলানা, হাফেয, ক্বারী ইত্যাদি কেন লিখেন বা বলেন? ‘রিয়া’ সুন্দরীর প্রেমকে প্রশ্ন দিয়ে তার আনুগত্যে তা করছেন না তো?

‘মনেরে আজি কহ যে, গোপনে চাহিলে দান নাহি কর, মজলিসে কর সহজে।’ কী ব্যাপার?

যে কাজ নির্জনে করতে উদ্বুদ্ধ হন না, সে কাজ লোকারণ্যে করতে এত অনুপ্রাণিত কেন?

যে কাজ করতে আপনার দেহ-মনে আলস্য আসে বা সময় থাকে না, সে কাজে আকর্ষণীয় পুরস্কার থাকলে অনায়াসে ক’রে ফেলেন কেন? পরকালের পুরস্কার কি ইহকালের এই পুরস্কার অপেক্ষা এতই তুচ্ছ?

আপনার সামাজিক কাজের জন্য এত ব্যানার, ক্যামেরা, সাংবাদিক ও প্রচার-মাধ্যম কেন?

মোটকথা, যা ইবাদত, তা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর জন্য হয়, তাতে ‘রিয়া’ ঢোকে। আর তা ইবাদতকে নষ্ট ক’রে দেয়, যেমন সিকাঁ মধুকে নষ্ট ক’রে দেয় এবং উপযাচিকা ‘রিয়া’ প্রিয়া আপনার বিবাহিত জীবনকে নষ্ট ক’রে দেয়।

আবেদ ইবাদত করবে কেবল আল্লাহর জন্য, মুসলিম যে কোন ভালো কাজ করবে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। মাবুদ আল্লাহ তাঁর আবেদ ও বান্দাকে সেই আদেশই দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

{ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ } [البينة : ৫]

অর্থাৎ, তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে। (সূরা বাইয়িনাহ ৫ আয়াত)

অন্য উদ্দেশ্যে ইবাদত করলে, লোককে দেখানোর জন্য বা লোকের কাছে সুনাম পাওয়ার জন্য কোন ভালো কাজ করলে তা পণ্ড হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ

النَّاسِ } {سورة البقرة (২৬৬)}

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! দানের কথা প্রচার করে এবং কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে নষ্ট করে দিয়ো না; ঐ লোকের মত যে নিজের ধন লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে। (সূরা বাকারাহ ২৬৪ আয়াত)

লোককে দেখিয়ে কাজ করা, সমাজকে ধোঁকা দিয়ে ভালো কাজের অভিনয় করা, মনের ইচ্ছা নেই অথচ মানুষকে দেখিয়ে নেক কাজ করা আসলে মুনাফিকদের চরিত্র। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى }

يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ (١٤٢) سورة النساء

অর্থাৎ, নিশ্চয় মুনাফিক (কপট) ব্যক্তির আশ্বেষ্য প্রতারণা করে। চায়। বস্তুতঃ তিনিও তাদেরকে প্রতারণা করে থাকেন এবং যখন তারা নামাযে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সাথে নিছক লোক-দেখানোর জন্য দাঁড়ায় এবং আশ্বেষ্যকে তারা অল্পই স্মরণ করে থাকে। (সূরা নিসা ১৪২)

বহু মানুষ আছে সমাজে, যারা মুনাফিক। অহী অবতীর্ণ হয়ে মনের খবর বলে দেওয়ার সময় যদি মুনাফিক থাকে, তাহলে বর্তমান সময়ে কত মুনাফিক থাকতে পারে, তা অনুমেয়। সেই মুনাফিকরা মুসলিম সমাজে বাস করে, তাদের মসজিদে যায়। আবার প্রথম কাতারে স্থান দখল করে। মসজিদ ও নামাযের বিষয়ে নানা তর্কে অংশ গ্রহণ করে। ইমাম ও পরহেযগার মানুষদের ভুল ধরে। আগ্রহ দেখিয়ে নামায পড়ে, কিন্তু তা হাতির বাইরের দাঁত। জানাযা, জুমআ ও ঈদের নামাযে এদের বেশ সমাবেশ ঘটে। তাদের এই লোক-দেখানি নামাযের মাধ্যমে তারা কিছু পেতে চায় প্রকৃত মুসলিমদের কাছে এবং পেয়েও যায়। কিন্তু কখনো-কখনো থলার বিড়াল ঝাঁপ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। দ্বীনের খুঁটি নামাযকে নিয়ে তারা ব্যবসা করে, রাজনীতি করে, স্বার্থসিদ্ধি করে। লাভ অর্জন করে ইহকালে। পরকালে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তর।

যে কাজ আশ্বেষ্যর জন্য করতে হয়, সে কাজ অন্যের জন্য করলে তো অবশ্যই শির্ক হবে। যার উদ্দেশ্যে করা হবে, সেই হবে আশ্বেষ্যর শরীক। বান্দা তাকেই মহান আশ্বেষ্যর সমকক্ষ স্থির করে! কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

(( قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشَّرْكِ ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ

مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ )) . رواه مسلم

“মহান আশ্বেষ্য বলেন, ‘আমি অংশীদারি (শির্ক) থেকে সমস্ত অংশীদারদের চাইতে অধিক অমুখাপেক্ষী। কেউ যদি এমন কাজ করে, যাতে সে আমার সঙ্গে অন্য কাউকে অংশীদার স্থাপন করে, তাহলে আমি তাকে তার অংশীদারি (শির্ক) সহ বর্জন করি।” (অর্থাৎ তার আমলই নষ্ট করে দিই।) (মুসলিম ৭৬৬৬নং)

অন্য শব্দে,

(( قَالَ اللَّهُ ، عَزَّ وَجَلَّ : أَنَا خَيْرُ الشُّرَكَاءِ ، مَنْ عَمِلَ لِي عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ

غَيْرِي ، فَأَنَا بَرِيءٌ مِنْهُ ، وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ )) .

“আল্লাহ আয্যা অজাল্ল বলেছেন, ‘আমি শির্ক (অংশীদারী) হতে সকল অংশীদার অপেক্ষা অধিক বেপরোয়া। অতএব যে ব্যক্তি আমার জন্য কোন এমন আমল করবে, যাতে সে আমি ভিন্ন অন্য কাউকে অংশী করবে, আমি তার থেকে সম্পর্কহীন। আর সে আমল তার জন্য হবে যাকে সে শরীক করেছে।” (ইবনে মাজাহ ৪২০২, আহমাদ ৭৯৯৯নং)

শির্ক ছোট বা গুপ্ত হলেও তা সর্বনাশী কর্ম। সুতরাং মানুষকে তুষ্ট করার জন্য আমল বড় ভয়ানক। পরিণাম ও পরিণতির জন্য ভয়ানক। মাসীহ দাজ্জালের নাম কে না শুনেছে? তার ফিতনার কথা কে না জানে? পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ফিতনা তার। তার থেকেও বড় ফিতনা হল গোপন প্রেমিকা ‘রিয়া’ সুন্দরীর।

আবু সাঈদ খুদরী রাঃ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল সঃ আমাদের নিকট এলেন। তখন আমরা কানা দাজ্জাল নিয়ে আলোচনা করছিলাম। তিনি বললেন,

((أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخَوْفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ؟))

“আমি তোমাদেরকে এমন জিনিসের কথা বলে দেব না কি, যা আমার নিকট তোমাদের জন্য কানা দাজ্জাল অপেক্ষাও অধিক ভয়ানক?” আমরা বললাম, ‘অবশ্যই বলে দিন, হে আল্লাহর রসূল!’ তিনি বললেন,

((الشَّرْكُ الْخَفِيُّ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّيَ فَيَزِينُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ)).

“গুপ্ত শির্ক; আর তা এই যে, এক ব্যক্তি নামায পড়তে দাঁড়ায়। অতঃপর অন্য কেউ তার নামায পড়া লক্ষ্য করছে দেখে সে তার নামাযকে আরো অধিক সুন্দর করে পড়ে।” (ইবনে মাজাহ ৪২০৪, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ২৭ নং)

হ্যাঁ, গোপন প্রেমিকার মতো মনোচোর ঐ ‘রিয়া’। আবেদের ইবাদত ধ্বংসকারী গুপ্ত শির্ক তা। মহানবী সঃ মানুষকে সতর্ক করেছেন তার সম্বন্ধে।

মাহমুদ বিন লাবীদ রাঃ বলেন, নবী সঃ (একদা স্বগৃহ হতে) বের হয়ে বললেন,

((أَيُّهَا النَّاسُ ! يَاكُمْ وَشِرْكُ السَّرَائِرِ))...

“হে মানবমন্ডলী! তোমরা গুপ্ত শির্ক হতে সাবধান হও।” সকলে বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! গুপ্ত শির্ক কী?’ তিনি বললেন,

((يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّيُ ، فَيَزِينُ صَلَاتَهُ جَاهِدًا لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ النَّاسِ إِلَيْهِ ،

فَذَلِكَ شِرْكُ السَّرَائِرِ)).

“মানুষ নামায পড়তে দাঁড়িয়ে তার নামাযকে চেষ্টার সাথে সুশোভিত করে (সুন্দর করে পড়ে); এই কারণে যে, লোকেরা তার প্রতি দৃকপাত করে দেখে তাই। এটাই (লোকেদের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে নামায পড়া) হল গুপ্ত শির্ক।” (বাইহাক্বী ৩৪০০, ইবনে খুযাইমা ৯৩৭, সহীহ তারগীব ৩১নং)

লোক-দেখানি আমলই হল ছোট শির্ক। এই শির্কের ফলে আমল নষ্ট হয়ে যায়। তার কোন প্রতিদান পাওয়া যাবে না প্রতিদানের দিনে।

পূর্বোক্ত মাহমূদ বিন লাবীদ রাঃ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সঃ বলেন,

((إِنَّ أَحْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشَّرْكَ الْأَصْغَرَ)).....

“তোমাদের উপর আমার সবচেয়ে অধিক যে জিনিসের ভয় হয় তা হল ছোট শির্ক।” সাহাবাগণ প্রশ্ন করলেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! ছোট শির্ক কী জিনিস?’ উত্তরে তিনি বললেন,

((الرِّيَاءُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ اذْهَبُوا

إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تَرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا فَاَنْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً)).

“রিয়া (লোকপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আমল)। আল্লাহ আয্যা অজাল্ল যখন (কিয়ামতে) লোকেদের আমলসমূহের বদলা দান করবেন, তখন সকলের উদ্দেশ্যে বলবেন, ‘তোমরা তাদের নিকট যাও, যাদেরকে প্রদর্শন করে দুনিয়াতে তোমরা আমল করেছিলে। অতঃপর দেখ, তাদের নিকট কোন প্রতিদান পাও কি না!’ (আহমাদ ২৩৬৩০, ইবনে আবিদ্দুনয়্যা, বাইহাক্বীর যুহদ, সহীহ তারগীব ২৯ নং)

হ্যাঁ, এ শির্ক ছোট এবং সূক্ষ্ম। অনেক সময় মনোবাগানের গাছে-গাছে ফিরে বেড়াবে অথচ তার টেরও পাওয়া যাবে না। মানুষের মন প্রকৃতিগতভাবে প্রশংসালোভী। সে চায় কাজের মাধ্যমে তার সুনাম হোক, সুখ্যাতি হোক, লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হোক। সে শির্ক চায় না, তবুও তা মনের গহিন কোণে বাসা বাঁধে। সে খেয়াল করতে পারে না, কখন কোন্ ছিদ্র দিয়ে সে অনুপ্রবেশ করে। মনের অজান্তে সেই ‘রিয়া’র ভালোবাসা মনের ভিতরে দানা বেঁধে ওঠে, ফলে সে বাধা দিতেও পারে না, প্রত্যাখ্যানও করতে পারে না। এই জন্য মহানবী সঃ সেই চুরি-ছুপে গোপনচারিণী ‘রিয়া’-প্রিয়া সম্পর্কে সতর্ক ক’রে বলেছেন,

((أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا هَذَا الشَّرْكَ فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَيْبِ النَّمْلِ)).

“হে লোক সকল! এই শির্ক থেকে বাঁচো। যেহেতু তা পিপড়ের চলন

অপেক্ষা গুপ্ত।” (আহমাদ ১৯৬০৬, ত্রাবারানীর কাবীর ১৫৬৭নং)

মহান সৃষ্টিকর্তা বান্দার নিকট থেকে এটা মোটেই চান না যে, তাঁর সাথে তাঁর পাওনায় অন্য কেউ অংশী হোক। মানুষও চায় না। তাই কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তার বিচার করবেন সবার আগে, যার ‘রিয়্য’ ও ‘সুমা’ সুন্দরীদ্বয়ের সাথে গভীর সম্পর্ক ছিল। তাকে সবার আগে জাহান্নামের শাস্তি দেবেন। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(( إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتَشْهَدَ ، فَأُتِيَ بِهِ ، فَعَرَفَهُ نِعْمَهُ ، فَعَرَفَهَا ، قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ : قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتَشْهَدْتُ . قَالَ : كَذَبْتَ ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ : جَرِيءٌ ! فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ . وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ ، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا . قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ : تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ ، وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ ، قَالَ : كَذَبْتَ ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ لِيُقَالَ : عَالِمٌ ! وَقَرَأْتُ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ : هُوَ قَارِئٌ ؛ فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ . وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَفَهُ نِعْمَهُ ، فَعَرَفَهَا . قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ : مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ . قَالَ : كَذَبْتَ ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ : جَوَادٌ ! فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ )) .

“কিয়ামতের দিন অন্যান্য লোকদের পূর্বে যে ব্যক্তির প্রথম বিচার হবে সে হচ্ছে একজন শহীদ। তাকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাকে তাঁর দেওয়া নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সুতরাং সে তা স্মরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, ‘ঐ নেয়ামতের বিনিময়ে তুমি কী আমল ক’রে এসেছ?’ সে বলবে ‘আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য জিহাদ করেছি এবং অবশেষে শহীদ হয়ে গেছি।’ আল্লাহ বলবেন, ‘তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি এই উদ্দেশ্যে জিহাদ করেছ, যাতে লোকেরা তোমাকে বলে, অমুক একজন বীর পুরুষ। সুতরাং তা-ই বলা হয়েছে।’ অতঃপর (ফিরিশ্তাদেরকে) আদেশ করা হবে এবং তাকে উবুড় ক’রে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

দ্বিতীয় হচ্ছে এমন ব্যক্তি, যে ইল্ম শিক্ষা করেছে, অপরকে শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন পাঠ করেছে। তাকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করা হবে।

আল্লাহ তাকে (পৃথিবীতে প্রদত্ত) তাঁর সকল নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেও সব কিছু স্মরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, ‘এই সকল নেয়ামতের বিনিময়ে তুমি কী আমল ক’রে এসেছ?’ সে বলবে, ‘আমি ইল্ম শিখেছি, অপরকে শিখিয়েছি এবং তোমার সন্তুষ্টিলাভের জন্য কুরআন পাঠ করেছি।’ আল্লাহ বলবেন, ‘মিথ্যা বলছ তুমি। বরং তুমি এই উদ্দেশ্যে ইল্ম শিখেছ, যাতে লোকেরা তোমাকে আলেম বলে এবং এই উদ্দেশ্যে কুরআন পড়েছ, যাতে লোকেরা তোমাকে ক্বারী বলে। আর (দুনিয়াতে) তা বলা হয়েছে।’ অতঃপর (ফিরিশ্বাদেরকে) নির্দেশ দেওয়া হবে এবং তাকে উবুড় ক’রে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

তৃতীয় হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার রুযীকে আল্লাহ প্রশস্ত করেছিলেন এবং সকল প্রকার ধন-দৌলত যাকে প্রদান করেছিলেন। তাকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাকে তাঁর দেওয়া সমস্ত নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেও সব কিছু স্মরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ প্রশ্ন করবেন, ‘তুমি ঐ সকল নেয়ামতের বিনিময়ে কী আমল ক’রে এসেছ?’ সে বলবে, ‘যে সকল রাস্তায় দান করলে তুমি খুশী হও সে সকল রাস্তার মধ্যে কোনটিতেও তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে খরচ করতে ছাড়িনি।’ তখন আল্লাহ বলবেন, ‘মিথ্যা বলছ তুমি। বরং তুমি এ জন্যই দান করেছিলে; যাতে লোকে তোমাকে দানবীর বলে। আর তা বলা হয়েছে।’ অতঃপর (ফিরিশ্বাবর্গকে) হুকুম করা হবে এবং তাকে উবুড় ক’রে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম ১৯০৫ নং)

হ্যাঁ, ‘রিয়্যার বোন ‘সুমা’ সুন্দরীও একটি গোপনচারিণী প্রেমিকা, যাকে অনেক আমলকারী মানুষ ভালোবাসে। ‘সুমা’ বা ‘সুমআহ’র অর্থ হল, লোককে শোনাবার জন্য কোন শ্রাব্য আমল করা। যেমন কুরআন তেলাঅত, বক্তৃতা ইত্যাদি। এই জন্য ক্বারী ও বক্তা সাহেবগণের প্রেমিকা হল ‘সুমা’ সুন্দরী। তাঁরা যদি এ প্রেম গোপনে করেন, তাহলে মহান আল্লাহ কিয়ামতে জমায়েত লোকারণ্যে তা প্রকাশ ক’রে দেবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

(( مَنْ سَمِعَ سَمَعَ اللَّهُ بِهِ ، وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللَّهَ بِهِ )) . متفق عليه .

“যে ব্যক্তি শোনাবে, আল্লাহ তা শুনিয়ে দিবেন। আর যে ব্যক্তি দেখাবে, আল্লাহ তা দেখিয়ে দিবেন।” (বুখারী ৬৪৯৯, মুসলিম ৭৬৬৭-৭৬৬৮ নং)

ইমাম নাওয়াবী বলেন, ‘যে ব্যক্তি শোনাবে’ অর্থাৎ, যে তার আমলকে মানুষের সামনে প্রদর্শনের জন্য প্রকাশ করবে। ‘আল্লাহ তা শুনিয়ে দেবেন’ অর্থাৎ, কিয়ামতের দিনে (সৃষ্টির সামনে সে কথা জানিয়ে) তাকে লাঞ্চিত



করবেন। ‘যে ব্যক্তি দেখাবে’ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মানুষের সামনে স্বকৃত নেক আমল প্রকাশ করবে যাতে সে তাদের নিকট সম্মানার্থ হয়। ‘আল্লাহ তা দেখিয়ে দেবেন’ অর্থাৎ, সৃষ্টির সন্মুখে তার গুপ্ত উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত (ক’রে অপমানিত) করবেন। (রিয়াজুস সালাহীন)

এ কথা পরিষ্কার ক’রে আরো এক হাদীসে বলা হয়েছে,

((مَنْ سَمِعَ النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمِعَ اللَّهُ بِهِ سَامِعَ خَلْقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَحَقَرَهُ وَصَغَّرَهُ)).

“যে ব্যক্তি লোককে শোনাবার জন্য (সুনাম নেওয়ার উদ্দেশ্যে) আমল করবে আল্লাহ তার সেই (বদ নিয়তের) কথা সারা সৃষ্টির সামনে (কিয়ামতে) প্রকাশ করে তাকে ছোট ও লাঞ্ছিত করবেন।” (ত্বাবারানীর কাবীর ১৪৯৩, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ২৩ নং)

আপনি দুনিয়াবী জ্ঞান অর্জন ক’রে দুনিয়া কামান, তাতে সমস্যা নেই। কিন্তু দুনিয়া কামানোর উদ্দেশ্যে দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করা বৈধ নয়। মুসলিমদের যাকাত-ওশর খেয়ে মাদ্রাসায় শিক্ষালাভ ক’রে দুনিয়াদার হওয়া, কেবল দুনিয়ার চিন্তা মনে-মগজে রাখা এবং দ্বীন-প্রচারকে প্রধান উদ্দেশ্য না করা, জান্নাত থেকে বঞ্চার কারণ। শুধু জান্নাতই নয়, জান্নাতের সুগন্ধ থেকেও বঞ্চিত হবে এমন মাদ্রাসা-পড়ুয়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

(( مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا ، لَمْ يَجِدْ عَرَفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )).

“যে বিদ্যা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, তা যদি একমাত্র সামান্য পার্থিব স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে কেউ শিক্ষা করে, তাহলে সে কিয়ামতের দিনে জান্নাতের সুগন্ধটুকুও পাবে না।” (আবু দাউদ ৩৬৬৬নং)

পরকালের কোন ভালো অংশ থাকবে না তার। জাহান্নামের অংশ নির্ধারিত থাকবে এমন ধর্মব্যবসায়ী বকধার্মিকদের জন্য। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((بَشِّرْ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِالسَّيِّئِ وَالْتِمَكِينِ فِي الْبِلَادِ وَالنَّصْرِ وَالرَّفْعَةِ فِي الدِّينِ وَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعَمَلِ الْآخِرَةِ لِلدُّنْيَا فَلَيْسَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ نَصِيبٌ)).

“এই উম্মতকে স্বাচ্ছন্দ্য, সমুন্নতি, দ্বীন সহ সুউচ্চ মর্যাদা, দেশসমূহে তাদের ক্ষমতা বিস্তার এবং বিজয়ের সুসংবাদ দাও। কিন্তু যে ব্যক্তি পার্থিব কোন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে পরকালের কর্ম করবে তার জন্য পরকালে প্রাপ্য

কোন অংশ নেই।” (আহমাদ ২১২২৪, ইবনে মাজাহ, হাকেম, বাইহাকীর শুআবুল ইমান ৬৮৩৩ ইবনে হিব্বান ৪০৫,, সহীহ তারগীব ২১নং)

ইবনে মাসউদ রাঃ বলেছেন,

(كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَبَسْتُمْ فِتْنَةً يَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ ، وَيَرْبُو فِيهَا الصَّغِيرُ ، وَيَتَّخِذُهَا النَّاسُ سُنَّةً ، فَإِذَا غَيَّرَتْ يَوْمًا قَالُوا : غَيَّرَتِ السُّنَّةُ) ، قِيلَ : وَمَتَى ذَلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ قَالَ : (إِذَا ذَهَبَتْ عُلَمَاؤُكُمْ وَكَثُرَتْ جُهَلَاؤُكُمْ ، وَكَثُرَتْ قُرَاؤُكُمْ وَقَلَّتْ فُقَهَاؤُكُمْ ، وَكَثُرَتْ أُمَرَاؤُكُمْ ، وَقَلَّتْ أَمَنَّاؤُكُمْ ، وَتَفَقَّهَ لِغَيْرِ الدِّينِ ، وَالتَّمَيَّسَتْ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ) .

‘তোমাদের তখন কী অবস্থা হবে, যখন ফিতনা তোমাদেরকে আচ্ছাদিত ক’রে নেবে? যাতে বড় বৃদ্ধ হবে এবং ছোট প্রতিপালিত (হয়ে বড়) হবে। মানুষ যাকে সুন্নাহ জ্ঞান করবে। যখন তা (ফিতনা বা বিদআত) অপসারিত করা হবে তখন লোকেরা বলবে, ‘সুন্নাত অপসারিত হল।’ একজন জিজ্ঞাসা করল, ‘হে আবু আব্দুর রহমান! এরূপ কখন হবে?’ তিনি বললেন, ‘যখন তোমাদের ক্বারীর সংখ্যা অধিক হবে এবং ফকীহ (অভিজ্ঞ আলেমদের) সংখ্যা কম হবে, তোমাদের নেতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং আমানতদারের সংখ্যা কমে যাবে ও আখেরাতের কর্ম দ্বারা দুনিয়ার সম্পদ অন্বেষণ করা হবে।’ (দারেমী ১৮৫নং)

শুধু পরকালেই নয়, ইহকালেও কারেন্ট শাস্তি আছে এমন দ্বীন-মার্কী দুনিয়াদারদের জন্য, যারা দ্বীনের পিঠে বসে দুনিয়া শিকার করে এবং সেটাই তার আসল চিন্তা হয়। মহানবী সঃ বলেছেন,

«من كانت الدنيا همه ، فرق الله عليه أمره ، وجعل فقره بين عينيه ، ولم يأت به

من الدنيا إلا ما كتب له . ومن كانت الآخرة نيته ، جمع الله له أمره ، وجعل

غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة» .

“যে ব্যক্তির প্রধান চিন্তা (লক্ষ্য) ইহলৌকিক সুখভোগ (দুনিয়াদারীই) হয়, আল্লাহ তার প্রচেষ্টাকে তার প্রতিকূলে বিক্ষিপ্ত করে দেন, তার দারিদ্রকে তার দুই চক্ষুর সামনে করে দেন, আর দুনিয়ার সুখসামগ্রী তার ততটুকুই লাভ হয় যতটুকু তার ভাগ্যে লিখা থাকে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির উদ্দেশ্য (ও পরম লক্ষ্য) পারলৌকিক সুখভোগ (আখেরাতই) হয়, আল্লাহ তার প্রচেষ্টাকে তার অনুকূলে ঐকান্তিক করে দেন। তার অন্তরে অমুখাপেক্ষিতা (ধনবত্তা) ভরে দেন। আর অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুনিয়ার

(সুখসামগ্রী) তার নিকট এসে উপস্থিত হয়।” (ইবনে মাজাহ ৪১০৫, সিলসিলাহ সহীহাহ ৯৫০ নং)

হ্যাঁ, পরকাল আসল উদ্দেশ্য হলে, মুসলিম ইহকালও লাভ করতে পারে। দুনিয়া তার উদ্দেশ্য না হলেও দুনিয়া তার কাছে এসে উপস্থিত হয়। সে অর্থ না চাইলেও অর্থ তাকে চায়। সে প্রশংসা না চাইলেও লোকে তার প্রশংসা করে। ‘রিয়া’ ও ‘সুমা’র মতো নোংরাকে লাথি মারলে মহান আল্লাহ মু’মিনকে পুরস্কৃত করেন দুনিয়াতে ও আখেরাতে।

আবু যার্ব رضي الله عنه বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল; বলুন, ‘যে মানুষ সৎকাজ করে, আর লোকে তার প্রশংসা ক’রে থাকে (তাহলে এরূপ কাজ কি রিয়া বলে গণ্য হবে?)’ তিনি বললেন,

(( تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ ))

“এটা মু’মিনের সত্ত্বর সুসংবাদ।” (মুসলিম ৬৮৯১নং)

অর্থাৎ, আমলকারীর মনে সুনাম নেওয়ার উদ্দেশ্য না থাকলে; লোক-সমাজে তার সুনাম হলেও তা ‘রিয়া’ বলে গণ্য হবে না। বরং তা হবে তার সওয়াবের একটি অংশ সত্ত্বর প্রতিদান, যা সে পরকালের পূর্বে ইহকালেই লাভ করবে। আল্লাহ আকবার!

পূর্বেই বলা হয়েছে, লোককে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে কোন আমল করা যেমন ছোট শির্ক, তেমনি লোককে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে কোন নেক আমল না করাও ছোট শির্ক। যেহেতু গ্রহণ যোগ্য আমলের শর্তই হল ‘ইখলাস’। নেক আমল করতে হবে বিশুদ্ধভাবে কেবল আল্লাহর উদ্দেশ্যে। বদ আমল ছাড়তে হবে খাঁটিভাবে কেবল আল্লাহরই উদ্দেশ্যে। লোককে খোশ করার জন্য কোন আমল করা বা ছাড়া, লোকের ভয়ে কোন আমল করা বা ছাড়াও একই পর্যায়ে। আর তাতে রয়েছে পরকালের আগে ইহকালের বৈয়াক্তিক ও সামাজিক অনেক ক্ষতি।

৩। বিদআত ও খেয়ালখুশির অনুসরণ :

মন যখন এ রোগে পড়ে, তখন সে বিদআতী হয়। আর বিদআতী হলে হিদায়াতীদেরকে ঘৃণা করে, গালমন্দ ও হেয় প্রতিপন্ন করে। নতুনত্ব পছন্দ করে। নতুন কিছু আবিষ্কার ক’রে মানুষের মনে চমক ধরায়। আড়ম্বরপূর্ণ ও আনুষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাস করে। সলফদের ব্যাখ্যা না নিয়ে নিজের খেয়ালখুশি মতো কুরআন-হাদীসের অর্থ গ্রহণ করে। শরীয়তের দলীলে নানা সন্দেহ ও আপত্তি উপস্থাপন করে। নিজেকে ‘জাহির’ করার প্রয়াসে বিরল-বিরল মাসআলায় ‘মুজতাহিদানা’ কথা বলে এবং সেটার প্রচারই

তার প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। মহান আল্লাহ একশ্রেণী মানুষের কথা আল-কুরআনে বলেছেন,

{هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ} (৭) سورة آل عمران

“তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন; যার কিছু আয়াত সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন, এগুলি কিতাবের মূল অংশ; যার অন্যগুলি রূপক; যাদের মনে বক্রতা আছে, তারা ফিতনা (বিশৃংখলা) সৃষ্টি ও ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা রূপক তার অনুসরণ করে। বস্তুতঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা সুবিজ্ঞ তারা বলে, ‘আমরা এ বিশ্বাস করি। সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে আগত।’ বস্তুতঃ বুদ্ধিমান লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে।” (আলে ইমরানঃ ৭)

এমন বাস্তব জিনিস যার বাস্তবতা উপলব্ধি করতে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি অপারগ অথবা যে ব্যাপারে এমন ব্যাখ্যা করার অবকাশ বা তাতে এমন অস্পষ্টতা ও দ্ব্যর্থতা থাকে যে, তার দ্বারা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতায় ফেলা সম্ভব হয়। এই কারণেই বলা হয়েছে যে, যাদের অন্তরে বক্রতা থাকে, তারাই অস্পষ্ট আয়াতগুলোর পিছনে পড়ে থাকে এবং সেগুলোর মাধ্যমে ফিৎনা সৃষ্টি করে।

এমন বিদাতীরা সহীহ হাদীসকে অস্বীকার করে এবং যযীফ ও জাল হাদীসকে ভিত্তি ক’রে নিজেদের জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে চলে।

এরাই তারা, যারা বিদাতাতকে ইবাদত মনে করে এবং সেটাকেই সঠিক দ্বীন ধারণা করে। অনুরূপ এক শ্রেণী মানুষের কথা মহান আল্লাহ তাঁর আল-কুরআনে বলেছেন,

{قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (১০৩) الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا} (১০৪) سورة الكهف

“তুমি বল, ‘আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দেব তাদের, যারা কর্মে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত?’ ওরাই তারা, পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পণ্ড হয়, যদিও তারা মনে ক’রে যে, তারা সংকর্ম করছে।” (কাহফঃ ১০৩-১০৪)

বিদাতাতকে ইবাদত মনে করে বলেই বিদাতীরা তওবার সুযোগ পায় না। আর তার জন্যই বান্দার ভিতরে কাবীরা গোনাহ সংঘটন করার

চাইতে বিদআত সংঘটন করা শয়তানের কাছে বেশি প্রিয়। শয়তান মানুষের আদি ও চির শত্রু। সে চায় মানুষ আল্লাহর ইবাদত বর্জন ক'রে তার পক্ষে যোগ দিক। যখন ইবাদত থেকে তাকে ফিরিয়ে আনতে পারে না, তখন 'রিয়া' দেবীকে প্রবিষ্ট ক'রে তার সেই ইবাদতকেই নষ্ট ক'রে ছাড়ে। তাতেও সক্ষম না হলে এমন ইবাদতকে তার মাঝে সুশোভিত করে, যা আসলে বিদআত। ফলে তাতে তার মেহনত বরবাদ যায় এবং গোনাহ আবাদ হয়। এমন রোগাক্রান্ত মনে নিশ্চিত্তে বাসা বাঁধে। এখানে ডিম পেড়ে তা দেয় এবং বাচ্চার জন্ম দেয়।

### ৪। কামনা-বাসনা :

কুকামনা ও অসৎ বাসনা মানুষের মনের অন্যতম রোগ। এ রোগীও ধরাশায়ী হয়ে পড়ে।

এমন রোগী বড্ড ভোজনবিলাসী হয়। মনে যা আসে তা খায়, জিভে যা মজা লাগে তাই ভক্ষণ করে। তাতে সে কোন বাচবিচার করে না। হালাল-হারামের তমীয করে না। উদরপূর্তি হয় তার অভীষ্ট কর্ম।

এ মনের রোগী বড্ড কামবিলাসী হয়। কাম-চরিতার্থ করা তার নেশা হয়। যৌনচিন্তা তার সার্বক্ষণিক সাথী হয়। গোপনে বীর্যক্ষয় করে। হয়তো-বা ব্যভিচার, সমকাম, হস্তমৈথুন, পশুগমন ও বিরল যৌনাচারের শিকার হয়। এ মনের রোগীর চোরা চাহনি যায় মহিলার গোপনাস্থের দিকে। মহিলার পুরো দেহটাই গোপনাস্থ। মহিলার অন্তর্বাস দেখে দেহে উত্তেজনা অনুভব করে। তার ছবি দেখে তৃপ্তি পায়। আর দেখার মতো কাছে কাউকে পেলে তার দিকে কামনজরে ঢুকপাত করে। আর কামনজর ইবলীসের একটি বিষাক্ত তীর। এই তীর দিয়ে সে অনেককে ঘায়েল করে। নজরবাণে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে যুবকের প্রণয়-নেশা ধরে। হৃদয়ের প্রেম গড়িয়ে মুখে যায়। তারপর প্রেমলীলা শুরু হয় যুবক-যুবতীর মাঝে। প্রেমসাগরে হাবুডুবু খেতে থাকলে হৃদয়ের জ্যোতি বিলুপ্ত হয়ে যায়। চক্ষুর জ্যোতি লয়প্রাপ্ত হয়। পবিত্র হৃদয় অপবিত্র হয়ে যায়। শুরুয়াত হয় নজর থেকে। এ জন্যই শরীয়তের বিধান হল দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করা। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (৩০) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ

فُرُوجَهُنَّ.... } (৩১) سورة النور

“মু'মিনদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের

যৌন অঙ্গকে সাবধানে সংযত রাখে; এটিই তাদের জন্য অধিকতর পবিত্র। ওরা যা করে, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত। বিশ্বাসী নারীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থান রক্ষা করে।--”

(নূরঃ ৩০-৩১)

দৃষ্টি সংযত করতে আদিষ্ট নারী-পুরুষ উভয়ই। পরন্তু বেগানা পুরুষের দৃষ্টিতে নারীকে নিজের সারা দেহাঙ্গ গোপন করতে আদেশ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ পুরুষকেও বলেছেন,

{وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (৫৩) سورة الأحزاب

“তোমরা নবী-পত্নীদের নিকট হতে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল হতে চাও। এ বিধান তোমাদের এবং তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র।”

(আহযাবঃ ৫৩)

দৃষ্টি থেকে সৃষ্টি আকর্ষণীয় অবৈধ প্রেম হৃদয়কে অপবিত্র ও চরিত্রকে ধ্বংসক’রে ফেলে। যে প্রেমের মাঝে থাকে কামনার জ্বালা।

মোহনীয় সুরে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে তাকে, যাতে সেই সুরে প্রেমের বাঁশির বাৎকার না পেয়ে বসে হৃদয়ের ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقَلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا} (৩২) سورة الأحزاب

“হে নবী-পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে পরপুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না, যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয়। আর তোমরা সদালাপ কর। (স্বাভাবিকভাবে কথা বল।)” (আহযাবঃ ৩২)

অবৈধ প্রেম গান-বাজনা শ্রবণে উদ্বুদ্ধ করে, প্রেমের গান, প্রেমিক-প্রেমিকার উদ্বেগজনিত হৃদয়-মনের টান। আর গানও ব্যভিচারের মন্ত্র। গান মানব-মনে মুনাক্ষিকী ও কপটতা সৃষ্টি করে।

গুপ্ত প্রণয়-ঘটিত এই কুপ্রবৃত্তি বড় যন্ত্রণাদায়ক, বড় ভয়ানক পীড়াদায়ক। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((يا نعايا العرب يا نعايا العرب! إن أخوف ما أخاف عليكم الزنا والشهوة

الخفية)).

“আরবের মরণ! আরবের মরণ! আমি তোমাদের উপর আমার সবচেয়ে

অধিক যে জিনিসের ভয় হয়, তা হল ব্যভিচার ও গুপ্ত কুপ্রবৃত্তি।”  
(ত্বাবারানী, সঃ তারগীব ২৩৯০নং)

তিনি আরো বলেছেন,

((إِنَّ مِمَّا أَحْشَىٰ عَلَيْكُمْ شَهَوَاتِ الْغَيِّ فِي بُطُونِكُمْ وَفُرُوجِكُمْ وَمُضْلَاتِ الْفِتَنِ)).

“আমি তোমাদের জন্য যে সকল জিনিস ভয় করি, তার মধ্যে অন্যতম হল তোমাদের উদর ও যৌন-সংক্রান্ত ভ্রষ্টকারী কুপ্রবৃত্তি এবং ভ্রষ্টকারী ফিতনা।” (আহমাদ ১৯৭৭২নং)

এটি মনের এমন একটি রোগ, অনেক ভালো মানুষের জন্যও তার সংক্রমণ থেকে মুক্তি পাওয়া সুকঠিন। মহানবী ﷺ বলেছেন,

« إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَىٰ ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّزْقِ أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَرَزَى الْعَيْنَيْنِ النَّظَرَ وَرَزَى اللِّسَانَ النُّطْقَ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهَى وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ ».

“নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আদম সন্তানের ব্যভিচারের অংশ লিখে দিয়েছেন, যা সে অবশ্যই পেয়ে থাকবে। সুতরাং চক্ষুর ব্যভিচার দর্শন, জিহ্বার ব্যভিচার হল কথন, মন আশা ও কামনা করে এবং জনেন্দ্রিয় তা সত্যায়ন অথবা মিথ্যায়ন করে। (বুখারী ৬২৪৩, ৬৬১২, মুসলিম ৬৯২৪নং)

## ৫। মুনাফিকী বা কপটতা

এটা এমন একটা মারাত্মক হার্দিক ব্যাধি, যার ফলে রোগীর পরকালে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে স্থান হয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا} (১৪০) النساء

“মুনাফিক (কপট) ব্যক্তির অবশ্যই দোষখের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে এবং তাদের জন্য তুমি কখনও কোন সাহায্যকারী পাবে না।” (নিসাঃ ১৪৫)

তাদের কালেমা, নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জ বা জিহাদ কোন কাজে দেবে না, যদিও তা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্যে থেকে সম্পাদন করা হয়েছে।

মুনাফিকদের মুখে এক, বুকে এক। মুখে ঈমান প্রকাশ করে, বুকে কুফর গুপ্ত রাখে। মনে মনে সন্দেহ পোষণ করে। আল্লাহ ও তদীয় রসূল সম্বন্ধে সন্দেহ, কুরআন বিষয়ে সন্দেহ, পরকাল সম্বন্ধে সন্দেহ করে তারা। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَفِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ

أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (৫০) سورة النور

“ওদের অন্তরে কি ব্যাধি আছে, না ওরা সংশয় পোষণ করে? না ওরা ভয় করে যে, আল্লাহও তাঁর রসূল ওদের প্রতি অবিচার করবেন? বরং ওরাই তো সীমালংঘনকারী।” (নূরঃ ৫০)

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا

غُرُورًا} (১২) سورة الأحزاب

“যখন মুনাফিক (কপটচারি)গণ এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি ছিল তারা বলছিল, ‘আল্লাহ এবং তাঁর রসূল আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা প্রতারণা বৈ কিছুই নয়।’ (আহযাবঃ ১২)

{أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ} (২৭) محمد

“যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ তাদের বিদেষ ভাব কখনই প্রকাশ করবেন না?” (মুহাম্মাদঃ ২৯)

মুনাফিকরা যেহেতু ইসলাম পছন্দ করে না, বাধ্য হয়ে ইসলামী নাম ও বেশ ধারণ করে, সেহেতু তারা ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি বিদেষ রাখে, ইসলামের বিজয়ে তারা মনঃক্ষুণ্ণ হয়, ইসলামের পরাজয়ে আনন্দিত হয়, আর জিহাদের নাম শুনলে যেন জীবন থাকতেই মরতে বসে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا

الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَئِي لَهُمْ (২০) طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا

لَهُمْ} (২১) سورة محمد

“বিশ্বাসীরা বলে, একটি সূরা অবতীর্ণ করা হয় না কেন? অতঃপর যদি সুস্পষ্ট মর্মবিশিষ্ট কোন সূরা অবতীর্ণ করা হয় এবং তাতে যুদ্ধের কোন নির্দেশ থাকে, তাহলে তুমি দেখবে, যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তারা মৃত্যুভয়ে বিহ্বল মানুষের মত তোমার দিকে তাকাচ্ছে। সুতরাং তাদের জন্য উত্তম ছিল, আনুগত্য করা ও ন্যায়সঙ্গত কথা বলা। সুতরাং জিহাদের সিদ্ধান্ত হলে যদি তারা আল্লাহকে দেওয়া অঙ্গীকার পূরণ করত, তাহলে তাদের জন্য এটা মঙ্গলজনক হত।” (মুহাম্মাদঃ ২০-২১)

এ মনের রোগীরা যতই রোগ গোপন করার চেষ্টা করুক, তা বৃথা। কারণ রোগের উপসর্গ প্রকাশ লাভ করে, তাদের থলের বিড়াল অকস্মাৎ লাফ



মেয়ে বেরিয়ে পড়ে। তারা মু'মিনদেরকে ধোঁকা দেয়। কিন্তু বড় আজীব যে, তারা অন্তর্যামীকেও ধোঁকা দিতে চায়! মহান আল্লাহ তাদের সে চরিত্রের কথা বলেছেন,

{وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (৪) يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (৫) فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ} (১০) سورة البقرة

“মানুষের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা বলে, ‘আমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী’, কিন্তু তারা বিশ্বাসী নয়। আল্লাহ এবং বিশ্বাসিগণকে তারা প্রতারণিত করতে চায়, অথচ তারা যে নিজেদের ভিন্ন কাউকেও প্রতারণিত করে না। এটা তারা অনুভব করতে পারে না। তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করেছেন ও তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাচারী।” (বাক্বারাহঃ ৪-১০)

এরা অন্তরে যা পোষণ করে, মুখে বলে তার বিপরীত। অন্তর্যামী মহান আল্লাহ সে কথা বলেছেন,

{وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكَفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ} (১৬৭) سورة آل عمران

“তাদেরকে বলা হয়েছিল, এস, তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর অথবা প্রতিরক্ষা কর। তারা বলেছিল, যদি আমরা যুদ্ধ জানতাম, তাহলে নিশ্চিতভাবে তোমাদের অনুসরণ করতাম। সেদিন তারা বিশ্বাস (ইমান) অপেক্ষা অবিশ্বাসের (কুফরীর) অধিক নিকটতম ছিল। যা তাদের অন্তরে নেই, তা তারা মুখে বলে। আর তারা যা গোপন রাখে, আল্লাহ তা বিশেষভাবে অবহিত।” (আলে ইমরানঃ ১৬৭)

{سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} (১১) سورة الفتح

“(যুদ্ধ থেকে) পশ্চাতে থাকা মরুবাসীরা তোমাকে বলবে, ‘আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন আমাদেরকে ব্যস্ত রেখেছিল, অতএব আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা’ তারা মুখে তা বলে, যা তাদের অন্তরে নেই। তাদেরকে বল, ‘আল্লাহ তোমাদের কারো কোন ক্ষতি কিংবা মঙ্গল

চাইলে কে তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারে? বস্তুতঃ তোমরা যা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবহিত।” (ফা/তহঃ ১১)

মুনাফিকরা নিজেদের কপটতার মাধ্যমে মুসলিমদের মাঝে নানা ফিতনা সৃষ্টি করে, ভালো লোকদের কুৎসা ও বদনাম রচনা ও রটনা করে। উপরে আপ্যায়ন করে, ভিতরে ঘৃণায় অতিষ্ঠ হয়? এদের উপরে সালামাঙ্কি, ভিতরে হারাম-জাদকি থাকে।

এরা যতক্ষণ লায়ে থাকে, ততক্ষণ মাঝিকে ‘দাদা’ বলে, অতঃপর নদী পার হলে তাকে ‘গাধা’ বলে!

এই শ্রেণীর মানুষকে যদি প্রশ্ন করা হয়, ‘গোদা বাড়ি ছাঁদন দড়ি এখন তুমি কার?’ তাহলে জবাব মেলে, ‘যখন যার কাছে থাকি তখন আমি তার।’

মুনাফিক বরের ঘরের মাসী, কনের ঘরের পিসী হয়। চোরকে বলে চুরি করতে, গৃহস্থকে বলে সজাগ থাকতে। চোর হয়ে চুরি করে পুলিশ হয়ে ধরে, সাপ হয়ে দংশন করে ওঝা হয়ে ঝাড়ে! সে দেশ গুণে বেশ ধারণ করে। যেখানে যেমন পরিবেশ পায় সেখানে তার অনুকূল কথা বলে। এদের শ্লোগান হল, ‘সুবিধাবাদ, জিন্দাবাদ।’

অবশ্যই তারা ভাল লোক নয়।

‘স্বার্থের বালাই তরে কহিতে উচিত কথা

কুণ্ঠিত যারা তারা সৎলোক নহে,

যেদিকে পেটের সেবা সেই দিকে বলে কথা

যে মত সুবিধা দেখে সেই মত কহে।’

এদের মনোরোগের কতিপয় উপসর্গ সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

(( أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَ فِيهِ

خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا : إِذَا أُؤْتِيَ خَانَ ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا عَاهَدَ

غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ )) . متفق عَلَيْهِ .

“চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকবে সে খাঁটি মুনাফিক্ গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তির মাঝে তার মধ্য হতে একটি স্বভাব থাকবে, তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকদের একটি স্বভাব থেকে যাবে। (সে স্বভাবগুলি হল,) ১। তার কাছে আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে। ২। কথা বললে মিথ্যা বলে। ৩। ওয়াদাহ করলে তা ভঙ্গ করে এবং ৪। ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হলে অশ্লীল ভাষা বলে।” (বুখারী ৩৪, ২৪৫৯, মুসলিম ২১৯নং)

একদা ইবনে উমার ؓ-এর নিকট কিছু লোক নিবেদন করল যে,

‘আমরা আমাদের শাসকদের নিকট যাই এবং তাদেরকে ঐ সব কথা বলি, যার বিপরীত বলি তাদের নিকট থেকে বাইরে আসার পর। (সে সম্বন্ধে আপনার অভিমত কী?)’ ইবনে উমার রাঃ উত্তর দিলেন, ‘রাসূলুল্লাহ সঃ-এর যামানায় এরূপ আচরণকে আমরা ‘মুনফিকী’ আচরণ বলে গণ্য করতাম।’ (বুখারী ৭১৭৮-নং)

## সৌজন্যবোধ ও ভব্যতা

এখানে একটি সুস্মৃ বিষয় বোঝার আছে। কোন দুষ্কৃতি বা অশ্লীল ব্যক্তির অসদাচরণ থেকে রক্ষা পাওয়ার মানসে বুকে ঘৃণা লুকিয়ে রেখে মুখে সৌজন্যমূলক কথা বলা অথবা তার পশ্চাতে গীবত ও সমালোচনা করা এবং সম্মুখে ভদ্রোচিত ব্যবহার প্রদর্শন করা উক্ত পর্যায়ে কপটতা নয়। বরং তা এক প্রকার বৈধ কাজ। মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, এক অভদ্র ব্যক্তি আল্লাহর নবী সঃ-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইল। নবী সঃ-এর কাছে খবর গেলে তিনি বললেন, “বাজে লোক!” তারপর তাকে প্রবেশ করার অনুমতি দিলেন। সে যখন বসল, তখন নবী সঃ তার সামনে খুশী প্রকাশ করলেন এবং নম্রভাবে কথা বলতে লাগলেন। অতঃপর লোকটি চলে গেলে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁকে বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! আপনি তার সম্পর্কে এই এই (কুমত্তব্য) করলেন। তারপর সে যখন ভিতরে এল, তখন তার সামনে খুশী প্রকাশ করলেন এবং নম্রভাবে কথা বলতে লাগলেন!’ আল্লাহর রসূল সঃ বললেন,

« يَا عَائِشَةُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مُنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ وَدَعَهُ أَوْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتَّقَاءً فَحْشِيهِ ».

“হে আয়েশা! কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টমানের ব্যক্তি সেই হবে, যাকে মানুষ তার অশ্লীলতা থেকে বাঁচার জন্য বর্জন ক’রে থাকে।” (বুখারী ৬০৫৪, ৬১৩১, মুসলিম ৬৭৬১নং)

সৌজন্যবোধ ও ভব্যতা হল এমন পল্লবিত বৃক্ষ, যা সামাজিক জীবনকে ছায়াদান করে এবং অসভ্যতা ও রূঢ়তার তাপ থেকে রেহাই দান করে। নিশ্চয় তা সচ্চরিত্রতার একটি অংশ। সাধারণতঃ যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে মানুষের রসনার মাধ্যমে। আর মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَقُلْ لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ

كَانَ لِلنَّاسِ عَدُوًّا مُّبِينًا} (৫৩) سورة الإسراء

অর্থাৎ, আমার দাসদেরকে বল, তারা যেন সেই কথা বলে যা উত্তম। নিশ্চয় শয়তান তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয়; নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (বানী ইস্রাঈলঃ ৫৩)

আর মহানবী ﷺ বলেছেন,

(( اَتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا ، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ )).

“তুমি যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং পাপের পরে পুণ্য কর, যা পাপকে মুছে ফেলবে। আর মানুষের সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর।” (তিরমিযী ১৯৮৭নং)

সুমহান চরিত্রের কর্ম এই ভব্যতা। সুন্দর কথার সাথে যদি ওষ্ঠাধরে মধুর হাসির বিলিক থাকে, তাহলে তো সোনায়ে সোহাগা। আর সবচেয়ে মহান হয়, যদি তার সাথে অন্তরের যোগ থাকে।

অনেক সময় এই সৌজন্যবোধ আন্তরিক নাও হতে পারে, যেহেতু যে কথা বলবেন, তা আপনার অন্তরের কথা নয় অথবা যার জন্য বলবেন, সে পছন্দনীয় ব্যক্তিত্ব নয়। তবুও তা উপকারী।

কিন্তু তা যেন কোন প্রকার এমন ত্যাগ স্বীকার ক’রে না হয়, যাতে আপনার কোন ক্ষতি আছে। বিশেষ ক’রে দীন ও ঈমানে ত্যাগ স্বীকার করলে তা মুনাফিকী হবে। আর নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য করলে তা তোষামদ হবে।

আপনি হয়তো চাইবেন, সকল মানুষ আপনার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুক। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। আর মহান আল্লাহকে অসন্তুষ্ট ক’রে কাউকে সন্তুষ্ট করতে চাইলে তাতে আছে মহা সর্বনাশ। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((مَنْ التَّمَسَّ رِضَاءَ اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَافَاهُ اللَّهُ مُؤَنَّةَ النَّاسِ ، وَمَنْ التَّمَسَّ رِضَاءَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَّهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ)).

“যে ব্যক্তি লোকেদেরকে অসন্তুষ্ট করেও আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে, সে ব্যক্তির জন্য লোকেদের কষ্টদানে আল্লাহই যথেষ্ট হন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে লোকেদের সন্তুষ্টি খোঁজে সে ব্যক্তিকে আল্লাহ লোকেদের প্রতিই সোপর্দ করে দেন।” (তিরমিযী ২৪১৪, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৩১১নং)

আর এ কথাও ভুল যে, আপনাকে ধূপবাতি হয়ে নিজেকে জ্বালিয়ে অপরকে সুগন্ধি বিতরণ করতে হবে অথবা মোমবাতি হয়ে নিজেকে জ্বালিয়ে অপরকে আলো দান করতে হবে। বরং ইসলামের নীতি হল,

অপরের ক্ষতি করবে না এবং নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

‘যার ঘাম ছোট, তার নাম ছোট’ কথা ঠিক। কিন্তু সেই নাম নেওয়ার জন্য আপনি নিজের ক্ষতি ক’রে সৌজন্যবোধ প্রদর্শন করবেন না।

যে ভার বহন করার ক্ষমতা নেই, মন না চাইলেও আপনি সৌজন্যের খাতিরে তা বহন করতে যাবেন না। সাপ মারতে গিয়ে যদি ছিপটাই ভেঙ্গে ফেলেন, তাহলে তাতে লাভ কী হবে?

আপনি যা পারবেন না, তাতে অজুহাত পেশ করুন। স্পষ্টভাবে প্রকাশ করুন যে, আপনি অপারগ। তবে স্পষ্টবাদিতার মানে কিন্তু কর্কষতা বা অশীলতা নয়।

মানুষের মন চায় না, তবুও সৌজন্যবোধের খাতিরে অনেক কিছু ক’রে থাকে।

অযাচিত মেহমান বাড়িতে এলে আপনি তার সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার প্রদর্শন করতে বাধ্য।

অবাঞ্ছিত আত্মীয়ের সাথে সৌজন্যের খাতিরে আপনি যোগাযোগ রাখতে বাধ্য।

অপছন্দনীয় স্বামী বা স্ত্রীর সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করতে বাধ্য।

চরিত্রহীন পিতামাতার সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করতে আপনি বাধ্য।

কিন্তু যেখানে বাধ্য নন, সেখানে আপনার স্পষ্ট কথায় কষ্ট না থাকা উচিত।

আপনার ম্যানেজার বিনা পারিশ্রমিকে অতিরিক্ত সময় আপনার নিকট কর্ম প্রার্থনা করল।

কোন এমন লোক আপনার কাছে ঋণ চাইল, যে পরিশোধে অবহেলা বা টাল-বাহানা করে।

আপনার বন্ধু আপনার সঙ্গ চায়। আর তার ফলে আপনার পড়াশোনা নষ্ট হয়। বাবা-মায়ের কথা শুনতে হয়, স্ত্রী বা ছেলেমেয়ের অধিকার নষ্ট হয়।

আপনার বন্ধু আপনার ব্যক্তিগত কোন জিনিস ব্যবহার করতে চাইল, যা দিলে আপনার কোন ক্ষতি হতে পারে।

আপনার কোন বেগানা আত্মীয় বেপর্দ হতে বলল। আর আপনি বললেন, ‘অমুকের বাপ দেখে ফেলবে বা রাগবে।’ আপনি অমুকের বাপের কথা ভাবলেন। কিন্তু যিনি পর্দার আদেশ দিয়েছেন, তাঁর কথা ভাবলেন না। সৌজন্য বজায় রাখতে গিয়ে নিজের দ্বীনদারীকেও বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হবেন?

তার মানে হচ্ছে, আপনি আসলে পর্দা চান না, অমুকের বাপের কারণে করতে বাধ্য হয়েছেন। নচেৎ স্পষ্ট বলতেন, ‘আল্লাহর বিধান লংঘন করা যাবে না।’

অনুরূপ অনেক ছাত্রী তাদের বোরকা-ওয়ালী সহপাঠিনীকে বোরকা পরার ব্যাপারে নেতিবাচক মন্তব্য করলে সে বলে, ‘কী করব? আমার বাপ বা স্বামী পরতে বলে।’ আর সে ভুলে বসে বিশ্বস্বামীকে অথবা সৌজন্যের খাতিরে বলতে চায়, ‘আমিও তোমাদের মতো। তোমরা যা চাও, আমিও চাই। কিন্তু আমি নিরুপায়।’

বাঘের সাথে সৌজন্য কীসের?

যালেমের সাথে সৌজন্য কীসের?

সমাজবিরোধী চোর-মাতালের সাথে সৌজন্যবোধ কেন?

বিদআতীদের সাথে সৌজন্যবোধ প্রকাশ কেন?

একই রুমে বসবাস করতে গিয়ে, সঙ্গী যদি বলে, ‘আরে আবার টুপী-রুমাল কেন? খুলে ফেল।’

সৌজন্যের খাতিরে তা খুলতে পারেন।

আবার যদি বলে, ‘গরমে জামা-পায়জামা কেন পরে আছ?’

সৌজন্যের খাতিরে আপনি তা মেনে নিতে পারেন।

কিন্তু যদি বলে, ‘আন্ডার প্যান্টটা কেন?’

তাহলে সৌজন্যবোধ বহাল রেখে আপনি নিশ্চয় তা খুলে ফেলতে পারেন না।

অনুরূপ অন্যায় কাজে বাধা দিতে সৌজন্যবোধ প্রকাশ করা বৈধ নয়। বৈধ নয় অন্যায় হতে দেখে তা সৌজন্যের খাতিরে সহ্য ক’রে নিয়ে তৃণসম দলিত হওয়া। ক্ষমতার বাইরে হলে আলাদা কথা।

মহান আল্লাহ এক সুন্দর জাতির কথা বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} (৫৬) المائدة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ ধর্ম হতে ফিরে গেলে আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় আনয়ন করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন ও যারা তাঁকে ভালবাসবে, তারা হবে বিশ্বাসীদের প্রতি কোমল ও অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দায় ভয় করবে না, এ আল্লাহর অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা তিনি দান

করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়। (সূরা মায়েদাহ ৫৪ আয়াত)

উবাদাহ ইবনে স্বামেত রাঃ বলেন, ‘আমরা রাসূলুল্লাহ সঃ-এর কাছে এই মর্মে বাইয়াত করলাম যে, দুঃখে-সুখে, আরামে ও কষ্টে এবং আমাদের উপর (অন্যদেরকে) প্রাধান্য দেওয়ার অবস্থায় আমরা তাঁর পূর্ণ আনুগত্য করব। রাষ্ট্রনেতার বিরুদ্ধে তার নিকট থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার লড়াই করব না; যতক্ষণ না তোমরা (তার মধ্যে) প্রকাশ্য কুফরী দেখ, যে ব্যাপারে তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে দলীল রয়েছে। আর আমরা সর্বদা সত্য কথা বলব এবং আল্লাহর ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করব না।’ (বুখারী ৭২০০, মুসলিম ৪৮৭৪নং)

আবু যার রাঃ বলেন, ‘আমাকে আমার বন্ধু সাতটি কাজের অসিয়ত করে গেছেন; তার মধ্যে (৫) তিক্ত হলেও যেন হক কথা বলি, (৬) আল্লাহর ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দা-ভয় যেন আমাকে না ধরে এবং (৭) লোকেদের কাছে যেন কিছুও না চাই।’ (আহমাদ ২১৪১৫, তাবারানী ১৬২৬, সহীহ তারগীব ৮১১নং)

হ্যাঁ, আমাদের আদর্শ মহানবী সঃ সৌজন্যবোধ প্রকাশ করেছেন। তবে যে সৌজন্যবোধে তাঁর ক্ষতি ছিল, যা তিনি লজ্জাশীলতার কারণে স্পষ্ট করেননি, তাঁর প্রতিপালক তা স্পষ্ট ক’রে দিয়েছেন। তিনি যয়নাবের ওলীমাতে সাহাবায়ে কিরামগণকে দাওয়াত করেছিলেন। খাওয়ার পরেও কিছু লোক সেখানেই বসে আপোসে কথাবার্তায় লিপ্ত ছিল। যাতে রাসূলুল্লাহ সঃ-এর বিশেষ কষ্ট অনুভব হচ্ছিল। তিনি লজ্জা-সংকোচবশতঃ তাদেরকে চলে যাওয়ার জন্য কিছুই বলতে পারেননি। আল্লাহ বললেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَاطِرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ

إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ} (৫৩)

“হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের অনুমতি না দেওয়া হলে তোমরা আহায্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না ক’রে ভোজনের জন্য নবী-গৃহে প্রবেশ করো না। তবে তোমাদেরকে আহ্বান করা হলে তোমরা প্রবেশ কর এবং ভোজন-শেষে তোমরা চলে যাও; তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়ো না। কারণ এ নবীর জন্য কষ্টদায়ক; সে তোমাদেরকে উঠে যাবার জন্য বলতে সংকোচ বোধ করে। কিন্তু আল্লাহ সত্য বলতে সংকোচবোধ করেন না।” (আহযাবঃ ৫৩)

বলা বাহুল্য, সৌজন্যবোধ একটি সচ্চরিত্রতার আচরণ, মন চায় না তবুও পরের মন রাখতে চাওয়া একটি সুন্দর ব্যবহার, আপনি প্রয়োগ করুন। কিন্তু খেয়াল রাখুন, তা যেন মুনাফিকী বা তোষামদ না হয় এবং তাতে আপনার কোন প্রকার বড় ক্ষতি না হয়।

### ৬। নিরাশাবাদিতা ও অশুভ ধারণা

নেতিবাচক মনের এটি একটি মহারোগ। প্রায় সর্বদা এ মন হতাশায় ভোগে, ঋণাত্মক ধারণা করে, নিরাশামূলক ভাবনা ভাবে। এ মনের মানুষকে বনের বাঘে খায় না, মনের বাঘে খায়। ভাবে আল্লাহ তাকে সুখী করবেন না, তিনি তাকে উন্নতি দেবেন না, তিনি তাকে বঞ্চিত করবেন, তিনি তাকে বিপদে ফেলবেন, তিনি তাকে পরকালে মুক্তি দেবেন না ইত্যাদি।

তার কপালে ভাল বউ জুটেবে না, তার ছেলেমেয়েরা ভালো হবে না, সে পড়াশোনায় সফল হবে না, সে ব্যবসায় লাভবান হবে না, তার কপালে তেঁতুল-ঘোলা আছে ইত্যাদি।

সামনের কোন ঘটনা-দুর্ঘটনাকে নিজের ভাগ্য ও প্রাপ্তির কারণ বলে ধারণা করে। কোন কোন মাস, দিন বা কালকে অশুভ বিশ্বাস করে। এমনকি পশু-পক্ষীর আচরণকেও নিজের সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যের হেতু নির্ধারণ করে। তাই শিয়ালকে রাস্তার ডান দিক থেকে বাম দিকে অতিক্রম করতে দেখলে অশুভ ধারণা করে, কাক বা পেঁচার ডাক শুনলে বিপদ হবে মনে করে ইত্যাদি।

এমন মনের রোগীরা সুখ ও সফলতা পেলে দ্বীন পালন করে, নামায পড়ে, রোযা করে। আর রোগ-বালা, কষ্ট ও ক্ষতির শিকার হলে আল্লাহর প্রতি কুধারণা ক’রে দ্বীন মানে না, নামায-রোযা পালন করে না।

ইসলাম গ্রহণ ক’রে কোন কোন লোক মদীনায় হিজরত ক’রে এলে যদি তার স্ত্রী পুত্রসন্তান প্রসব করত অথবা তার ঘোড়ার বংশবৃদ্ধি হতো, তাহলে বলত, ‘এ দ্বীন ভালো।’ পক্ষান্তরে যদি তার স্ত্রী সন্তান প্রসব না করত অথবা তার ঘোড়ার বংশবৃদ্ধি না হতো, তাহলে বলত, ‘এ দ্বীন ভালো নয়।’ এমন লোকের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বললেন,

{وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ

فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ } (১১)

“মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর ইবাদত করে দ্বিধার সাথে; তার



কোন মঙ্গল হলে তাতে সে প্রশান্তি লাভ করে এবং কোন বিপর্যয় ঘটলে সে তার পূর্বাভাস্য ফিরে যায়; সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ইহকালে ও পরকালে; এটাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি।” (হাজ্জঃ ১১)

কোন কিছুতে অশুভ ধারণা রাখা শির্ক। মানুষের মনে এমন অনেক কিছু উদয় হয়, যাতে সে কোন ব্যক্তি, পশু-পক্ষী, জিনিস বা সময়কালকে অশুভ মনে করে। এমন ধারণা এসে গেলেও তাতে ধ্যান বা মনোযোগ দেওয়া উচিত নয়। বরং সে ধারণাকে উপেক্ষা ক’রে নিজের কাজে অগ্রসর হতে হয়। পরন্তু যাদের মনে তাওহীদের পরিপূর্ণ জ্ঞান নেই, যাদের মন দুর্বল, তাদের মনে এই রোগ এসে বাসা বাঁধে। কিন্তু নববী নির্দেশ হল,

((إِذَا ظَنَنْتُمْ فَلَا تَحْقُقُوا وَإِذَا حَسَدْتُمْ فَلَا تَبْغُوا وَإِذَا تَطَيَّرْتُمْ فَأَمْضُوا وَعَلَى اللَّهِ

فَتَوَكَّلُوا وَإِذَا وَرَنْتُمْ فَأَرْجِعُوا)).

“যখন তোমরা কিছু (কু)ধারণা করবে, তখন তা বাস্তবায়ন করো না। যখন হিংসা করবে, তখন সীমালংঘন বা অন্যায়চরণ করো না। যখন অশুভ ধারণা হবে, তখন অতিক্রম কর। আল্লাহর উপরই ভরসা কর। আর ওজন করলে ঝুঁকিয়ে দাও।” (সিঃ সহীহাহ ৩৯৪২নং)

কোন কিছুকে অশুভ বলে মনে হলে, তা মনে স্থান দেওয়া উচিত নয়, তাকে আমল দেওয়া বৈধ নয়। বরং তা উপেক্ষা ক’রে নিজের কাজে মনোযোগী হওয়া উচিত।

মনে করুন, সাইকেল বা গাড়ি নিয়ে কোন গুরুত্বপূর্ণ সফরে বের হলেন। কিছু দূর যেতে না যেতেই টায়ার বাস্ট হয়ে গেল। মনে অশুভ ধারণা উদয় হল, হয়তো সফরটা ভালো হবে না। হতেই পারে। তবে সে ধারণাকে আমল দেবেন না। টায়ার সেরে অথবা চেঞ্জ ক’রে নিয়ে সফর করতে থাকুন। কিন্তু যদি আপনার মনে ঐ রোগ থাকে, তাহলে অবশ্যই পারবেন না। তাওহীদবাদী মু’মিন হলে কোন পরোয়া না ক’রে আল্লাহর উপর নির্ভর ক’রে আপনি সফরে যাবেন।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

« الطَّيْرَةُ شِرْكُ الطَّيْرِ شِرْكُ » . ثَلَاثًا « وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُدْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ » .

“কিছুকে অশুভ লক্ষণ বলে মনে করা শির্ক। কিছুকে কুপয় মনে করা শির্ক, কিছুকে কুলক্ষণ মনে করা শির্ক। কিন্তু আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার মনে কুধারণা জন্মে না। তবে আল্লাহ (তাঁরই উপর) তাওয়াক্কুল (ভরসার) ফলে তা (আমাদের হৃদয় থেকে) দূর করে দেনা।” (আহমাদ ১/৩৮৯, ৪৪০, আবু দাউদ ৩৯১২, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান,

হাকেম প্রমুখ, সিলসিলাহ সহীহাহ ৪৩০নং)

মনে রাখবেন, যাদের মনোভাব ইতিবাচক, তারা বারোমেসে ফলের মতো, তারা সব সময়েই সুস্বাদু ও তাই তাদের জন্য সব সময় স্বাগত।

পক্ষান্তরে নেতিবাচক মনের মানুষ সর্বদা ভীত-পরাজিত। মরবার আগেই সে মরে বসে থাকে।

৭। মহান আল্লাহর করুণা ও ক্ষমা থেকে নিরাশ হওয়া

কিছু হারিয়ে গেলে এবং তা পাওয়ার আশা থাকলেও অনেকে নিরাশ হয়ে মনোরোগী হয়। অথচ মহান আল্লাহ করুণা থেকে নিরাশ হওয়া মু'মিনের কাজ নয়।

অনেকে বিশাল পরিমাণের পাপ ক'রে মহান প্রতিপালকের করুণা ও ক্ষমার ব্যাপারে নৈরাশ হয়ে মানসিক যন্ত্রণায় কষ্ট পেতে থাকে। অথচ পাপের কারণে বিবেকে দংশন ভালো, কিন্তু মহাক্ষমাশীল আল্লাহর ক্ষমা থেকে নৈরাশ হওয়া মোটেই উচিত নয়।

নিখোঁজ হওয়া মানুষ ফিরে আসবে।

পাপ থেকে সঠিকভাবে তওবা করলে আল্লাহ ক্ষমা করবেন।

বয়সের সূর্য ঢলে গেলেও আল্লাহ সন্তান দান করবেন।

আগামীতে ব্যবসায় লাভ হবে।

আগামীতে ক্ষেতের ফসল ভালো হবে।

হালাল চাকরি মিলে যাবে।

সাফল্য আসবে, দুঃখ দূরীভূত হবে।

ইব্রাহীম নবী ﷺ সন্তান লাভের ব্যাপারে নিরাশ না হয়ে বলেছিলেন,

{وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ} (سورة الحجر ৫৬)

‘পথভ্রষ্টরা ব্যতীত আর কে নিজ প্রতিপালকের অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়?’ (হিজরঃ ৫৬)

ইয়াকুব নবী ﷺ হারিয়ে যাওয়া ছেলেদের ব্যাপারে নিরাশ না হয়ে অন্য ছেলেদের বলেছিলেন,

{يَا بَنِي إِدْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيَاسُّوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا

يَيْئَسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ} (سورة يوسف ৮৭)

“হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও, ইউসুফ ও তাঁর সহোদরের অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহর করুণা হতে নিরাশ হয়ো না, কারণ অবিশ্বাসী সম্প্রদায় ব্যতীত কেউই আল্লাহর করুণা হতে নিরাশ হয় না।” (ইউসুফঃ ৮৭)

মহান আল্লাহ গোনাহগার বান্দাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন,  
 {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} (সূরা الزمر ৫৩)

“ঘোষণা করে দাও (আমার এ কথা), হে আমার দাসগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছ, তারা আল্লাহর করুণা হতে নিরাশ হয়ে না; নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত পাপ মাফ ক’রে দেবেন। নিশ্চয় তিনিই চরম ক্ষমশীল, পরম দয়ালু।” (যুমারঃ ৫৩)

৮। মহান আল্লাহর আযাবের ব্যাপারে নিশ্চিত্ততা

বহু মানুষ আছে, যারা পাপকাজ করে অথচ তার শাস্তির ব্যাপারে নিশ্চিত্ত থাকে। ধারণা করে, আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন না। শাস্তিযোগ্য অপরাধীদের নিজেদেরকে এমন নিরাপদ ধারণা করা যথার্থ নয়।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ} (সূরা الأعراف ৭৭)

“তারা কি আল্লাহর চক্রান্তের ভয় রাখে না? বস্তুতঃ ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ব্যতীত কেউই আল্লাহর চক্রান্ত হতে নিরাপদ বোধ করে না।” (আ’রাফঃ ৯৯)

৯। দীর্ঘ প্রত্যাশা, দুরাশা

এ জীবন একটি কঠিন সাধনার সংসার। এখানে কোন মানুষ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, কোন মানুষ সর্বদিক দিয়ে চিরসুখী নয়। জীবনের কত কি চাহিদা থাকে, অনেক পূরণ হয়, অনেক অপূরণ থেকে যায়। অনেক আশার মুকুল দেখা যায় জীবন-বৃক্ষে, কিন্তু সব মুকুল ফুল হয়ে ফোটে না। কোন কোনটা কুঁড়ি অবস্থায় ঝড়ে পড়ে, ফল হয়ে পরিপক্ব হয় না।

জীবন মানেই আশায় আশায় বেঁচে থাকা। আশা এমন একটা জিনিস, যাকে কোনদিন স্পর্শ করা যায় না। মনের মাঝে তা অনুভূত হয় এবং মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য অনুপ্রেরণা দেয়।

রিক্ত-নিঃস্ব হলেও মানুষের মনে আশা থাকলে উদ্যম জন্মে এবং সং হলে তা সফল হয়। তবে তার জন্য চাই নিরন্তর অধ্যবসায়। সুখার্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে ধৈর্যের সাথে কষ্টবরণ করতে হয়।

জীবনটা তো কষ্ট দিয়েই ঘেরা। আশা তা চাপা রাখে। আর কর্ম আশা পূরণ করে।

আশা করা যায়, আশা করতে দোষ নেই। মানুষের আশা পূরণ হওয়া

খুশীর বিষয়, কিন্তু সব আশা পূরণ হওয়া অসম্ভব ব্যাপার। দীর্ঘ আশা করা, অপূরণযোগ্য আশা করা, দুরাশার অন্ধকারে তলিয়ে যাওয়া মনের একটি বড় ব্যাধি। যে আশা পূরণ হবার নয়, সে আশা পোষণ ক’রে নিজেকে ক্ষয় করা জ্ঞানীর কাজ নয়।

‘সূর্য-পানে চেয়ে ভাবে মল্লিকামুকুল,  
‘কখন ফুটিবে মোর অত বড় ফুল!’

গাই বেচে দুধের মালিক হওয়ার আশা করা ভুল।

নিম্ন গাছ থেকে আগুর ফলের আশা করা নেহাতই বোকামি।

সেই প্রকৃত সুখী, যে প্রয়োজনের তুলনায় বেশী আশা করে না।

এমন জিনিস কারো কাছেই চাওয়া উচিত নয়, যা পাওয়ার উপযুক্ত মানুষ নয়। কেউ যদি চায় যে, তার সকল আশাই পূরণ হোক, তাহলে সে যেন অসম্ভব আশা না করে।

কিন্তু বাস্তব এই যে, মানুষ আমরণ আশা করতেই থাকে। জীবন ফুরাতে যায়, কিন্তু তার আশা ফুরায় না। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابًا فِي اثْنَتَيْنِ فِي حُبِّ الدُّنْيَا وَطُولِ الْأَمَلِ)).

“দুটি জিনিসের জন্য বৃদ্ধের হৃদয় সদা যুবকের মতো থাকে; দুনিয়ার মহত্ত্ব এবং সুদীর্ঘ আশা।” (বুখারী ৬৪২০নং)

### ১০। কুখারনা

আল্লাহর প্রতি বা মানুষের প্রতি কুখারনা একটি মনোরোগ। অথচ আল্লাহ বলেন, ‘আমি সেইরূপ, যে রূপ বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখো’ (বুখারী ৭৮০৫ নং, মুসলিম ৭১২৮নং)

আর আল্লাহর রসূল ﷺ ইত্তিকালের তিনদিন পূর্বে বলেছেন,

(( لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ )) . رواه مسلم

“মহান আল্লাহর প্রতি সুখারনা না রেখে তোমাদের কেউ যেন অবশ্যই মৃত্যুবরণ না করে।” (মুসলিম ৭৪১২নং)

কিন্তু তাঁর প্রতি কুখারনা মানুষের একটি মনোরোগ। আল্লাহ তাকে ধ্বংস ক’রে দেবেন, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে দেবেন ইত্যাদি ধারণা সেই রোগেরই পরিণতি। যেমন মুনাফিকদের সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَأَيُّفَةٌ قَدْ أَهْمَتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ} (১০৬)

“একদল ছিল যারা নিজের জান নিয়েই ব্যস্ত ছিল। প্রাগ-ইসলামী

অঙ্গদের ন্যায় আল্লাহ সম্বন্ধে অবান্তর ধারণা পোষণ করেছিল।” (আলে ইমরানঃ ১৫৪)

মুহাম্মাদের সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই মিথ্যা। তিনি যে দ্বীনের প্রতি আহ্বান করেন, তার ভবিষ্যৎ আশঙ্কাজনক। তিনি তো আল্লাহর সহযোগিতা থেকেই বঞ্চিত ইত্যাদি।

এ রোগে পড়লে মানুষ মানুষকে ভুল ধারণা করে। ভুল বুঝে সংসারে আগুন ধরায়। সমাজে বিপত্তি সৃষ্টি করে। এরা কাউকে বড়লোক হতে দেখলে চোখ বুজে বলে, ‘হারাম টাকায় বড়লোক হচ্ছে।’

কাউকে টাকা-পয়সার দায়িত্বে থাকতে দেখলে বলে, ‘মেরে খাচ্ছে।’

কোন যুবক-যুবতীকে একত্রে দেখলেই ভাবে, অবৈধ সম্পর্ক শুরু হয়েছে।

কেউ টেলিফোন না তুললেই গালাগালি করে, কটু কথা বলে।

কারো দ্বীনদারি দেখে বলে, ‘লোককে দেখাচ্ছে।’

কাউকে অসুস্থ বা বিপদগ্রস্ত দেখলে বলে, ‘পাপের প্রতিফল ভুগছে।’

এরা নিজের নাড়ি ধরে পরের চিকিৎসা করে। ব্যাভিচারিণী চায়, জগতের সব মেয়েরাই ব্যাভিচারিণী হোক। ‘আপনি যেমন ঢেমন, জগৎকে দেখি তেমন।’

আলী রা বলেছেন, ‘অসৎ লোক কাউকে সৎ মনে করে না, সকলকেই সে নিজের মত ভাবে।’

পুকুরের একগলা পানিতে নেমে একটি রাখাল পেশাব করছিল। পাড়ে দাঁড়িয়ে অন্য এক রাখাল তাকে বলল, ‘তুই কী করছিস আমি বলতে পারি।’ বলল, ‘কী করছি বল দেখি।’ বলল, ‘তুই মুতছিস।’ বলল, ‘কী করে জানলি তুই?’ বলল, ‘আমিও অমনি করে মুতি।’

এরা আন্দাজে-অনুमानে কেবল কুধারণাই করে। অথচ সুস্থ মনের মু’মিন মানুষ সুধারণা করে। যেহেতু তার প্রতিপালক বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} (১২)

“হে মু’মিনগণ! তোমরা বহুবিধ ধারণা হতে দূরে থাক; কারণ কোন কোন ধারণা পাপ।” (হুজুরাতঃ ১২)

আর তার নবী সা বলেছেন,

((إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ)).

“তোমরা কুধারণা পোষণ করা থেকে বিরত থাক। কারণ কুধারণা সব চাইতে বড় মিথ্যা কথা।” (বুখারী ৫১৪৩, মুসলিম ৬৭০১নং)

কিছু মনোরোগী আছে, তারা অপরের প্রতি কুধারণা করেই ক্ষান্ত হয় না, বরং সে কুধারণার কথা লোকের কাছে বলে বেড়ায়। তার অনুমানকেই বাস্তব বলে বিশ্বাস করে। ফলে তা অপবাদে পরিণত হয়। অথচ মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إِذَا ظَنَنْتُمْ فَلَا تُحَقِّقُوا)).

“যখন তোমরা কিছু (কু)ধারণা করবে, তখন তা বাস্তবায়ন করো না।”  
(সিঃ সহীহাহ ৩৯৪২নং)

### ১১। বিষয়াসক্তি

বিষয়াসক্তি বা দুনিয়াদারি মনের একটা রোগ। বিষয়-সম্পদ থাকা দূষণীয় নয়, দূষণীয় হল তার প্রতি আসক্তি। যে আসক্তি ইবাদতে প্রতিবন্ধকতা আনে। যার ফলে মানুষ কেবল ‘দুনিয়া-দুনিয়া’ ও ‘মাল-মাল’ ক’রে কালতিপাত করে।

এমন আসক্তি, যার ফলে মানুষ ধন উপার্জনে হালাল-হারামের তমীয ভুলে যায়। দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেয়। জিহাদে প্রাণ দিতে মন চায় না। দ্বীনের পথে ধন ব্যয় করতে চায় না। অর্থের প্রতি এত মায়া থাকে যে, দেখে মনে হয়, দুনিয়াতে সে চিরদিন বেঁচে থাকবে। আর এটা একটি বাস্তব আচরণ মানব-মনের। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابًا فِي اثْنَتَيْنِ فِي حُبِّ الدُّنْيَا وَطُولِ الْأَمَلِ)).

“দুটি জিনিসের জন্য বৃদ্ধের হৃদয় সদা যুবকের মতো থাকে; দুনিয়ার মহত্বত এবং সুদীর্ঘ আশা।” (বুখারী ৬৪২০নং)

এমনিতেই পার্থিব-প্রেম মানব-মনে প্রক্ষিপ্ত আছে। কিন্তু সেই সাথে জানতে ও মানতে হবে যে, পৃথিবী তার আসল ঠিকানা নয়। আসল উপভোগ্য সুখ ইহকালে নয়, আছে পরকালে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{رِزْقٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ

حُسْنُ الْمَاَبِ} (১৬) سورة آل عمران

“নারী, সন্তান-সন্ততি, জমাকৃত সোনা-রূপার ভান্ডার, পছন্দসই (চিহ্নিত) ঘোড়া, চতুষ্পদ জন্তু ও ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট লোভনীয় করা হয়েছে। এ সব ইহজীবনের ভোগ্য বস্তু। আর আল্লাহর নিকটেই উত্তম আশ্রয়স্থল রয়েছে।” (আলে ইমরানঃ ১৪)

পৃথিবীর এ জীবন কয়েক দিনকার খেলাঘর। খেলা শেষ হলে ফিরে যেতে হবে আপন ঘরে। এ জীবন মানুষের অভীষ্ট নয়। অভীষ্ট হল পরকালের জীবন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} (৬৪) سورة العنكبوت

“এ পার্থিব জীবন তো খেল-তামাশা ছাড়া কিছুই নয়। আর পারলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন; যদি ওরা জানত।” (আনকাবুতঃ ৬৪)

{يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ} (৩৭) غافر

“হে আমার সম্প্রদায়! এ পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু। আর নিশ্চয় পরকাল হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস।” (মু’মিনঃ ৩৯)

{الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا} (৬১) سورة الكهف

“ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা। আর সংকার্য, যার ফল স্থায়ী ওটা তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং আশা প্রাপ্তির ব্যাপারেও উৎকৃষ্ট।” (কাহফঃ ৪৬)

{وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْثَنَّهُمْ فِيهِ وَرَزَقُ رَبِّكَ رَءُوبٌ وَابْقَى} (১৩১) سورة طه

“আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য-স্বরূপ ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, তার প্রতি তুমি কখনোও তোমার চক্ষুদ্বয় প্রসারিত করো না। তোমার প্রতিপালকের জীবিকাই উৎকৃষ্টতর ও স্থায়ী।” (তা-হাঃ ১৩১)

{فَاعْرِضْ عَنْ مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (২৭) ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ} (৩০) سورة النجم

“অতএব তাকে উপেক্ষা ক’রে চল, যে আমার স্মরণে বিমুখ এবং যে শুধু পার্থিব জীবনই কামনা করে। তাদের জ্ঞানের দৌড় এই পর্যন্ত।” (নাজ্মঃ ২৯-৩০)

{وَمَا أُوتِيتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ} (৬০) سورة القصص

“তোমাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে, তা তো পার্থিব জীবনের ভোগ ও

সৌন্দর্য এবং যা আল্লাহর নিকট আছে, তা উত্তম এবং স্থায়ী। তোমরা কি অনুধাবন করবে না?” (ক্বাস্বাস্বঃ ৬০)

{فَمَا أُوتِيتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} (৩৬) سورة الشورى

“বস্তুতঃ তোমাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে, তা পার্থিব জীবনের ভোগ; কিন্তু আল্লাহর নিকট যা আছে, তা উত্তম ও চিরস্থায়ী তাদের জন্য, যারা বিশ্বাস করে ও তাদের প্রতিপালকের ওপর নির্ভর করে।” (শূরাঃ ৩৬)

{وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُوَ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ}

“পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক বই আর কিছুই নয় এবং যারা সাবধানতা অবলম্বন করে, তাদের জন্য পরকালের আবাসই শ্রেয়, তোমরা কি (তা) অনুধাবন কর না?” (আনআমঃ ৩২)

{اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرَحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي

الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ} (২৬) سورة الرعد

“আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন, তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং সংকুচিত করেন। কিন্তু তারা পার্থিব জীবন নিয়েই উল্লসিত; অথচ ইহজীবন তো পরজীবনের তুলনায় নগণ্য ভোগ মাত্র।” (রা’দঃ ২৬)

কিন্তু এ সব নির্দেশ উল্লংঘন ক’রে রোগা মন ভাবে, এ জীবনই সব কিছু। চাওয়া-পাওয়া সব কিছু এখানে। ফলে এ জীবনকেই সুসজ্জিত ও সুশোভিত করে এবং পরপারের জীবনের কোন গুরুত্বই দেয় না। আর নিশ্চয় তা ভ্রষ্টতা। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا

عُوجًا أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ} (৩) سورة إبراهيم

“যারা ইহজীবনকে পরজীবনের উপর প্রাধান্য দেয়, মানুষকে আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত করে এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করে; তারাই তো ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে।” (ইব্রাহীমঃ ৩)

পরন্তু ভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তি মানেই জাহান্নামের পথ। সেখানে রয়েছে এমন রোগা মনের উপযুক্ত শাস্তি। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأْنَنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ

آيَاتِنَا غَافِلُونَ} (৭) أُولَٰئِكَ مَا لَهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} (৮) سورة يونس

“যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না এবং পার্থিব জীবন



নিয়েই পরিতৃপ্ত থাকে এবং এতেই যারা নিশ্চিত থাকে এবং যারা আমার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে উদাসীন; এই লোকদের নিজেদের কৃতকর্মের ফলে ঠিকানা হবে জাহান্নাম।” (ইউনুসঃ ৭-৮)

## ১২। প্রসিদ্ধি কামনা ও নেতৃত্বলোভ

এক প্রকার মন আছে, সে মনের বড় ব্যাধি হল প্রসিদ্ধি কামনা। সদা সর্বদা যেন খ্যাতি ও যশ লাভের লোভ মনের ভিতরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। যে কোন সামাজিক ও জামাআতী কাজে নেতৃত্বের লোভ থাকে। আমীর বা নেতা না হতে পারলে মনের ভিতরে বড় ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। মোড়ল না মানার দরুন সে অপমানবোধ করে, মনঃকষ্টের শিকার হয়। ফলে কোন অজুহাতে দল বদল করে অথবা নতুন দল গড়ে। ঐক্যবদ্ধ জামাআতে ফাটল সৃষ্টি হয়। দল ভেঙ্গে দুর্বল হয়ে পড়ে। নানা বিশৃঙ্খলা ও বিঘ্ন সৃষ্টি হয় সমাজে। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকট হয় সুসংহত জামাআতে। অথচ দীনদারীর কোন কাজে এমন নেতৃত্বলোভ মানুষের জন্য বড়ই ভয়ংকর, বড়ই ক্ষতিকর।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

(( مَا ذُنْبَانِ جَائِعَانِ أَرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ

وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ))

“ছাগলের পালে দু’টি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে ছেড়ে দিলে ছাগলের যতটা ক্ষতি করে, তার চেয়ে মানুষের সম্পদ ও দ্বীনী সম্মানের প্রতি লোভ-লালসা তার দ্বীনের জন্য বেশী ক্ষতিকারক।” (তিরমিযী ২৩৭৬নং)

## ১৩। আত্মমুগ্ধতা

যে মনে প্রসিদ্ধি লোভ থাকে, সাধারণতঃ সে মনে আত্মমুগ্ধতা থাকে। লোকে না মানলেও নিজেকে বড় ভাবে। নিজের কৃতকর্ম সবার চাইতে শ্রেষ্ঠ অনুভূত হয়। নিজের রূপ-সৌন্দর্য, বিদ্যা-বুদ্ধি, আয়-উপার্জন, দ্বীনদারি-পরহেযগারি ইত্যাদিতে নিজে নিজেই মুগ্ধ হয়। এতে এক প্রকার তৃপ্তি ও গর্ব অনুভব হয়।

অনেক সময় মন্দ কাজ করেও মনে অনুভূত হয়, সে ভালো কাজ করছে। ইবাদত ক’রে সে মনে করে, তার মতো আবেদ আর কেউ নেই। ইল্ম শিক্ষা ক’রে মনে করে, তার মতো আলেম আর কেউ নেই। আর নিশ্চয় এমন আত্মমুগ্ধতা একটা বড় মনোরোগ, যে রোগের পরিণতি ধ্বংস ও সর্বনাশ।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((لَوْ لَمْ تَكُونُوا تُذُنِبُونَ لَخَفْتُ عَلَيْكُمْ مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ الْعُجْبُ الْعُجْبُ)).

“তোমরা যদি পাপ না কর, তাহলে আমি তোমাদের ব্যাপারে তার চাইতে বড় জিনিসের আশঙ্কা করি, আত্মমুগ্ধতা আত্মমুগ্ধতা।” (বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৭২৫৫, সঃ জামে’ ৫৩০৩নং)

তিনি আরো বলেছেন,

((وَأَمَّا الْمُهْلَكَاتُ فَشَحْ مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه)).

“---আর ধ্বংসকারী কর্মাবলী হল; এমন কৃপণতা যার অনুসরণ করা হয়, এমন প্রবৃত্তি যার আনুগত্য করা হয় এবং মানুষের আত্মমুগ্ধতা।” (বায়যার ৬৪৯১, বাইহাক্বী প্রমুখ, সহীহ তারগীব ৫০নং)

কেন পাপাচারিতার চাইতে বেশি খারাপ এই আত্মমুগ্ধতা? যেহেতু, পাপাচারী পাপ করে এবং সে জানে সে পাপ করছে। ফলে তার তওবার আশা থাকে। কিন্তু আত্মমুগ্ধ যা করে, তা নিয়ে পরিতৃপ্ত থাকে এবং সে ধারণা করে, সে খুব ভালো কাজ করছে। ফলে তওবা করার আশা থাকে না।

ইবনে মাসউদ ؓ বলেছেন, “ধ্বংস আছে দুটি কর্মে : নিরাশা ও আত্মমুগ্ধতা।” (শারহ জামিইল কবীর ২/৬০৬)

যেহেতু নিরাশাগ্রস্ত মানুষ নিরাশায় ভুগে সুখ কামনাই করে না। আর আত্মমুগ্ধও তার অন্বেষণ করে না, কারণ, তার ধারণামতে সে তা লাভ ক’রে ফেলেছে।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে জিজ্ঞাসা করা হল, ‘(ভালো) লোক কখন খারাপ হয়?’ উত্তরে তিনি বললেন, ‘যখন সে নিজেকে ভালো মনে করে।’

একদা বিশর হাফীকে এক ব্যক্তি সুন্দর ও সুদীর্ঘ ইবাদতে মগ্ন দেখে মুগ্ধতা প্রকাশ করলে তিনি তাকে বললেন, ‘আমার মধ্যে যা দেখলে, তা দেখে অবশ্যই ধোঁকা খেয়ো না। যেহেতু ইবলীস হাজার-হাজার বছর ইবাদত করার পর শয়তান হয়েছিল।’

এইভাবে নিজের মন থেকে আত্মমুগ্ধতার রোগ দূর করতে হয়। মনের মাঝে সৃষ্ট গর্ব মুছে ফেলতে হয়। অপরকে প্রশংসা করতে দেখলেও এমন আচরণ হওয়া উচিত অপরের সাথে।

আপনার শত্রু আপনাকে কষ্ট দেয়। একদা বদুআ করলে তা লেগে যায়। তখন আপনি আত্মমুগ্ধ হয়ে ভাবতে পারেন, আপনার দুআ কবুল হল এবং এ হল আপনার জন্য ‘কারামত’! না, তা জরুরী নয়। আর হলেও আপনি আত্মমুগ্ধতা থেকে দূরে থাকুন। (এ)

মুতার্হিফ বলেছেন, ‘রাত্রি জেগে ইবাদত ক’রে আত্মমুগ্ধ অবস্থায় সকাল করার চাইতে রাত্রে ঘুমিয়ে থেকে অনুতপ্ত হয়ে সকাল করা আমার নিকট বেশি প্রিয়।’ (শারহু স্মাহীহিল বুখারী, ইবনে বাদ্দাল ৯/২৩৯)

### ১৪। অহংকার

অহংকার, আমিত্ব, হামবড়াই আসে আত্মমুগ্ধতা থেকেই। মানুষ যখন নিজেকে বড় ভাবে এবং ভাবে-ভঙ্গিতে ‘আমি ছাড়া ময়দানে কেউ নেই’ প্রকাশ করে, তখন সে জানে বা না জানে, তার মনে সৃষ্টি হয় অহমিকা-ব্যাপি।

অহংকার উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদে নয়, অহংকার হল হক প্রত্যাখ্যান ও মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করাতে। নিজেকে মহৎ বানাবার জন্য অন্যকে ছোট গণ্য করা অহংকারীর কাজ।

অহংকার হল ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতা। মনের ভিতরে হক জেনেও বাহ্যতঃ তা স্বীকার না করা, যেমন ফিরআউন ও তার অনুগামীরা করেছিল। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

الْمُفْسِدِينَ} (سورة النمل (١٤))

“ওরা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলি প্রত্যাখ্যান করল, যদিও ওদের অন্তর এগুলিকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। দেখ, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কী হয়েছিল?” (নামলঃ ১৪)

অহংবোধ অনুভূতিনাশক ওষুধের মতো, বোকামির যত্নগাকেও অসাড় করে দেয়। আত্মম্ভরিতা মানুষের আহমক হওয়ারই প্রমাণ।

অহংকারী সত্ত্বর শাস্তি পায় তার জীবনেও। সে যখন নিজেকে বড় মনে করে, মানুষ তখন তাকে ছোট ভাবে। হাসান বাসরী বলেন, ‘অহংকারী ব্যক্তি পর্বতের সুউচ্চ শিখরে চড়ে থাকা মানুষের মতো, যে নিচের সকল লোককে ছোট দেখে এবং লোকেরাও তাকে ছোট দেখে।’

অহংকার ও অপমান দুটি জমজ ভাই। অহংকারে পতন আনে। অহংকারে ইবলীস সর্বশ্রেষ্ঠ আবেদ থেকে সর্বনিকৃষ্ট শয়তানে পরিণত হয়েছে। মহামান্য মহান আল্লাহর প্রথম অবাধ্যাচরণ ঘটেছিল এই অহংকারের পরিণতিতে।

অথচ প্রকৃতপক্ষে যে বড়, সে নিজেকে বড় মনে করে না। খুদেরাই বড়াই বেশি করে।

“কত বড় আমি’ কহে নকল হীরাটি,  
তাই তো সন্দেহ করি নহ ঠিক খাটি।”

অহংকার শত্রুতা সৃষ্টি করে, অহংকার হক গ্রহণে বাধা দেয়। বড় হয়েও  
যে অহংকার বর্জন করবে, সে সম্মান অর্জন করবে।

নেতৃত্বের আপদ অহংকার। আত্মগবীর কোন রায় চলে না এবং  
অহংকারীর কোন বন্ধু থাকে না। অহংকারীকে সকল মানুষ বর্জন করে।

সিবাঈ বলেন, ‘স্বৈরাচারী শাসক অহমিকাকে স্ত্রীরূপে বরণ করে, ফলে  
তাদের তিনটি সন্তান জন্ম নেয়; মূর্থতা, বিদ্বেষ ও অপরাধ।’

আর কিয়ামতে অহংকারীদের উদ্দেশ্যে বলা হবে,

{ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ}

‘জাহান্নামে চিরকাল বসবাসের জন্য ওতে প্রবেশ কর, কত নিকৃষ্ট  
উদ্ধতদের আবাসস্থল।’ (নাহলঃ ২৯, যুমারঃ ৭২, মু’মিনঃ ৭৬)

### ১৫। হীনস্মন্যতা

অহংকার ভালো নয়, নিজেকে বড় ভাবা উচিত নয়, তবে নিজেকে ছোট  
ভাবাও সঠিক নয়। নিচতা ও হীনতাও মনের একটা বড় ব্যাধি। মানুষ  
বিনয়ী হবে, তা বলে আত্মসম্মানবোধটুকু হারিয়ে ফেলবে না।

অভাবের সময়ে মানুষের স্বভাব নষ্ট হয়, তখনই অনেক মানুষ  
আত্মমর্যাদা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু আমাদের শরীয়ত আমাদেরকে  
আত্মসম্মান বজায় রাখতে অনুপ্রাণিত করে। কবি বলেন,

‘দৈন্য যদি আসে আসুক লজ্জা কিবা তাহে?

মাথা উচু রাখিস,

সুখের সাথী মুখের পানে যদি নাহি চাহে

ধৈর্য ধরে থাকিস।’

চড়ুই পাখির মতো অট্টালিকায় বাস ক’রে সুখের বড়াই করা সাজে না।  
অপরের করুণা ও দান নিয়ে গৌরবের মাথা তুলে বাঁচা যায় না।

আত্মসম্মানবোধ যার আছে, সে লাঞ্চিত হয় না। আত্মসম্মানবোধ যার  
নেই, তার রাগ হয় না। হীনস্মন্যতা মানুষকে হীন করে তোলে। অপরকে  
বড় দেখে নিজেকে তুচ্ছ ধারণা করে। সব কিছুই অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও  
ভাবে, তার কিছু নেই। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (آل عمران ১৩৭)

“তোমরা হীনবল হয়ো না এবং দুঃখিত হয়ো না, তোমরাই হবে

সর্বোপরি (বিজয়ী); যদি তোমরা মু'মিন হও।” (আলে ইমরানঃ ১৩৯)

এক শ্রেণীর মন আছে, যে সব সময় নিজেকে ছোট ভাবে এবং ছোট কাজ করে। বড় হওয়ার উচ্চ আশা তার মনে জাগে না। এখানেই শেষ নয়, সে যেমন নীচ, অপরকেও নীচ ধারণা করে এবং অপরে তার মতো কাজ না করলে অবাক হয়। অপরে বড় হতে চাইলে সে তার হিংসা করে ও সমালোচনা করে। আসলে যে হীন হয়, সে হীন নিয়ে তুষ্ট হয়। হীনমন্যতা তাকে হীনতার কাদাতেই ডুবিয়ে রাখে।

### লোভ-লালসা

এরই কাছাকাছি ব্যাধি লোভ-লালসা। বাস্তব যে, এ ব্যাধি থেকে মানুষের মন শূন্য নয়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(( لَوْ أَنَّ لَابْنَ آدَمَ وَادِيًّا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ ، وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ )) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“আদম সন্তানের মালিকানায যদি সোনার একটি উপত্যকাও হয়, তবুও সে অনুরূপ আরো একটির মালিক হওয়ার অভিলষী থাকবে। পরন্তু একমাত্র মাটিই আদম সন্তানের মুখ (চোখ বা পেট) পূর্ণ করতে পারে। অবশ্য যে ব্যক্তি তওবা করবে, আল্লাহ তার তওবা গ্রহণ করবেন।” (বুখারী ৬৪৩৭, মুসলিম ২৪৬২নং)

((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ إِنَّا أَنْزَلْنَا الْمَالَ لِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَلَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِ ثَانٍ وَلَوْ كَانَ لَهُ وَادِيَانِ لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِمَا ثَالِثٌ، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ)).

“আমি মাল অবতীর্ণ করেছি নামায আদায় ও যাকাত প্রদান করার জন্য। আদম সন্তানের (ধন-সম্পদের) যদি একটি উপত্যকা হয়ে যায়, তাহলে সে এটাই চাইবে যে, তার নিকট দু’টি উপত্যকা হোক। আর তার যদি দু’টি উপত্যকা হয়ে যায়, তবে সে এটাই চাইবে যে, তার তিনটি উপত্যকা হোক। মাটি ছাড়া অন্য কিছু আদম সন্তানের পেট ভরতে পারবে না। অতঃপর যে তাওবা করবে, মহান আল্লাহ তার তাওবা কবুল করবেন।” (আহমাদ ২ ১৯০৬, সিঃ সহীহাহ ১৬৩৯নং)

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেছেন, “দুইজন লোভী তৃপ্ত হয় না; জ্ঞানলোভী ও ধনলোভী।” (ত্বাবারানী ১০২৩৫, সহীহুল জামে’ ৬৬২৪নং)

« يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَتَشِبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمْرِ . »

“আদম সন্তান বৃদ্ধ হতে থাকে, কিন্তু তার দু’টি জিনিস যুবক হতে থাকে। আর তা হল, মালের প্রতি লোভ ও বয়সের প্রতি লোভ।” (মুসলিম ২৪৫৯নং)

মনের মধ্যে লালসার লালন করতে করতেই তার আয়ু শেষ হয়ে যায়। লালসা পূরণ না হলে জীবনে সে কষ্ট পায়, দুঃখ পায়। অতিরিক্ত লালসায় মান-অপমান ও হারাম-হালালের তমীয় করার কথা সে বিস্মৃত হয়। অনেক সময় লোভে পাপ, আর পাপে তার মৃত্যু ঘটে।

### ১৬। কৃপণতা, ব্যয়কুষ্ঠতা

ধনলোভের কাছাকাছি এটাও একটি হৃদ-রোগ। মনের ভিতরে ধনের এমন লোভ থাকে যে, তার ফলে সে ধনব্যয় করতে চায় না। আয় করতে চায়, ব্যয় করতে চায় না; এমনকি জরুরী ব্যয়ও করে না, আল্লাহর হুকুম আদায় করে না, এমনকি নিজের জন্যও অর্থ ব্যয় করতে কার্পণ্য করে।

আসলে না থাকতে যে খেতে চায়, তার মুখে ছাই। আর থাকতে যে খায় না, তার মুখেও ছাই। ধন থাকতে যে প্রয়োজনে ব্যয় করে না, সে আসলে ধনী নয়, ফকীর।

যে ব্যক্তি মাল জমা করে এবং নিজের উপরেও ব্যয় করতে কার্পণ্য করে, সে তো সেই শিকারী কুকুরের মত, যে প্রভুর জন্য শিকার করে এবং নিজে খেতে পায় না।

হাসান বাসরী বলেন, ‘নিজের মাল থাকা সত্ত্বেও কৃপণের মত হতভাগা আর অন্য কাউকে দেখিনি। কেননা, সে দুনিয়াতে তা জমা করতে বড় যত্নবান হয়, অথচ তা দান না করার জন্য আখেরাতে তাকে হিসাব দিতে হবে। তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দুনিয়ায় দৃষ্টিস্তাগ্রস্ত থাকে, আর আখেরাতে কার্পণ্যের পাপের শাস্তিও ভোগ করবে। সে দুনিয়ায় গরীবের মত বাস করে, অথচ আখেরাতে তাকে ধনীর মতই হিসাব দিতে হবে।’

কৃপণ দুনিয়াতে অসুখী, অসফল। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَنْ يُوقِ شَحْنَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (৯) سورة الحشر

“যারা কার্পণ্য হতে নিজেদেরকে মুক্ত করেছে তারাই সফলকাম।” (সূরা হাশর ৯ আয়াত)

এই জন্য কোন মু’মিনের হৃদয়ে কার্পণ্য থাকে না। মহানবী ﷺ বলেছেন, ((لَا يَجْتَمِعُ غَبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانٌ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ عَبْدٍ أَبَدًا، وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا)).

“কোনও বান্দার পেটে আল্লাহর রাস্তায় ধুলো ও দোযখের ধূয়ো কখনই একত্রিত হবে না। আর কৃপণতা ও ঈমান কোন বান্দার অন্তরে কখনই জমা হতে পারে না।” (আহমাদ ৭৪৮০, নাসাঈ ৩১১০, ইবনে হিব্বান ৩২৫১, হাকেম ২৩৯৫, সহীহুল জামে’ ৭৬১৬নং)

### ১৭। হিংসা, পরশ্রীকাতরতা

মানব-মনের একটি মারাত্মক ব্যাধি হল হিংসা। পরের সুখ-সমৃদ্ধি ও সাফল্য দেখে তার ধ্বংস-কামনা করার চরিত্র প্রায় মানুষের মধ্যে থাকে। হীন মনের মানুষ তা প্রকাশ করে এবং উচ্চ মনের মানুষ তা গোপন করে।

হিংসুক আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ-বন্টনে অভিযোগ আনে, কেন অমুককে তাঁর নিয়ামত প্রদান করা হল?

হিংসা ছিল মানুষের ইতিহাসে প্রথম পাপ। আদমের প্রতি হিংসা ক’রে ইবলীস শয়তান হয়েছিল এবং হাবীলের প্রতি হিংসা ক’রে কাবীল তাঁকে খুন করেছিল।

হিংসা একটি এমন ব্যাধি, যার মাঝে ন্যায়পরায়ণতা আছে; এ ব্যাধি হিংসিতের যত ক্ষতি না করে, তার তুলনায় বেশী ক্ষতি করে হিংসুকের।

হিংসুকের শাস্তির জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে হিংসিতের খুশীর সময় মনে মনে কষ্ট পায়।

হিংসুক অপরের হৃষ্টপুষ্ট দেহ দেখে নিজের দেহকে ক্ষীণ করে।

ফকীহ আবুল লাইস সামারকান্দী বলেন, হিংসুকের হিংসা হিংসিতের কাছে পৌঁছানোর পূর্বে হিংসুকের কাছে ৫টি শাস্তি এসে পৌঁছে;

- (১) সে নিরন্তর দুশ্চিন্তা (ও অন্তরজ্বালায়) দগ্ধ হয়,
- (২) এমন মসীবত আসে যাতে তার কোন সওয়াব হয় না,
- (৩) লোকমাঝে তার এমন বদনাম হয় যার পর সে প্রশংসিত হয় না,
- (৪) আল্লাহর নিকট ক্রোধভাজন হয় এবং
- (৫) তাওফীকের দরজা তার জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়।

আমাদের শরীয়ত আমাদেরকে হিংসা করতে নিষেধ করে। সুতরাং মহানবী ﷺ বলেছেন,

(( إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ، وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا ، وَلَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَدَابَرُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا )) .

“তোমরা কুখারণা পোষণ করা থেকে বিরত থাক। কারণ কুখারণা সব চাইতে বড় মিথ্যা কথা। অপরের গোপনীয় দোষ খুঁজে বেড়ায়ো না, অপরের

জাসূসী করো না, একে অপরের সাথে (অসৎ কাজে) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করো না, পরস্পর হিংসা করো না, পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করো না, একে অপরের বিরুদ্ধে শত্রুভাবাপন্ন হয়ো না। তোমরা আল্লাহর বান্দা, ভাই ভাই হয়ে যাও।” (বুখারী ৬০৬৪, মুসলিম ৬৭০১নং)

তিনি আরো বলেছেন,

((وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي جَوْفِ مُؤْمِنٍ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفَيْحٌ جَهَنَّمَ ، وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي جَوْفِ مُؤْمِنٍ الْإِيمَانُ وَالْحَسَدُ)).

“কোন মু’মিনের অন্তরে আল্লাহর পথের ধূলা এবং জাহান্নামের উত্তাপ একত্রিত হবে না। অনুরূপ কোন বান্দার অন্তরে ঈমান ও হিংসা একত্রিত হতে পারে না।” (নাসাঈ ৩১০৯, ত্বাবারানীর কাবীর ১৪৪, স্বাগীর ৪১০, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৬৬০৯, ইবনে হিষ্মান ৪৬০৬নং)

((أَفْضَلُ النَّاسِ كُلُّ مَخْمُومٍ الْقَلْبِ صَدُوقِ اللِّسَانِ)). قَالَوا صَدُوقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ؟ قَالَ: ((هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ لَا إِثْمَ فِيهِ وَلَا بَغْيَ وَلَا غِلَّ وَلَا حَسَدَ)).

“সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ লোক হল সেই, যার হৃদয় হল পরিষ্কার এবং জিত্ব হল সত্যবাদী।” জিজ্ঞাসা করা হল, ‘পরিষ্কার হৃদয়ের অর্থ কী?’ বললেন, “যে হৃদয় সংযমশীল, নির্মল, যাতে কোন পাপ নেই, অন্যায় নেই, ঈর্ষা ও হিংসা নেই।” (ইবনে মাজাহ ৪২১৬, সহীহুল জামে ৩২৯১নং)

রোগা মনে হিংসা এসে গেলেও তা বাস্তবায়ন করতে নিষেধ করেছেন আমাদের মহানবী ﷺ। আর বাস্তবায়ন ও রূপদান হয় হিংসার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করার মাধ্যমে।

হিংসুক আপনার হিংসা করে বলে, সে আপনার গীবত করে, বদনাম করে। আপনার সুযশ ও সদগুণ ঢেকে রেখে কুযশ ও বদ-গুণ প্রচার করে।

‘সুজনে সুযশ গায় কুযশ ঢাকিয়া,  
কুজনে কুরব করে সুরব নাশিয়া।’

হিংসুক হিংসার জ্বালায় আপনার চুগলী করে, আপনার শত্রুর কাছে, আপনার বিরোধীর কাছে, যার কাছে করলে আপনার ক্ষতি হবে তার কাছে। আপনার গার্জেনের কাছে, ম্যানেজারের কাছে, মালিকের কাছে, শাসক ও সরকারের কাছে।

হিংসুক আপনার আপনজনকে আপনার বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে, উস্কিয়ে দেয়। আপনার ভক্তের কানে বিষ ঢেলে আপনার প্রতি তাকে বীতশ্রদ্ধ



ক’রে তোলে।

হিংসুটে মানুষ আপনার হিংসা করে বলে, সে আপনার দোষ ধরে, ছিদ্রাবেষণ করে, আপনার পদস্থলনের প্রতীক্ষা করে।

আপনার প্রশংসা শুনে হিংসুকের গা জ্বলে, আপনার আয়-উন্নতি দেখে আর জ্বলে, তেলে হাবুডুবু খাওয়া লুচির মতো ফুলে। আপনার সুস্থাস্থ্য দেখে সে নিজের স্বাস্থ্য খারাপ করে।

আপনাকে নিয়ে অন্যের কাছে বিদ্রোপ করে, দুশমন-হাসি হাসে, আপনার দুশমন হাসায়।

আপনার বিরুদ্ধে কটাক্ষ করে, যে কোনভাবে আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করে, মনেপ্রাণে ক্ষতি কামনা করে, পশ্চাতে বদুআ দেয়, লানত করে, গালি দেয়, বিপদের মুখে ঠেলে দেয়, বিপদ দেখে মিষ্টি হাসি হাসে, আনন্দ পায়, হিংসুকের হিংসা প্রতিহিংসায় পরিণত হয়, অতঃপর সে হিংসিতকে খুন করার চেষ্টা করে। অনেক সময় খুনও ক’রে বসে।

হিংসা হিংসুককে উপদেশ দান ও গ্রহণ করতে বাধা দেয়।

হিংসুক অসফল, তাই সে চায় অন্যও সাফল্য লাভে বঞ্চিত হোক। হিংসুকদের অবস্থা বাক্সে আবদ্ধ অনেক কাঁকড়ার মত। যাদের একজন ওপর দিয়ে উঠে পালাতে চেষ্টা করলে নিচে থেকে একজন তার পা ধরে টেনে নিচে নামিয়ে দেয়। ফলে কেউই উঠে পালাতে পারে না। হিংসুকরা নিজেরাও বেশি দূর যেতে পারে না, আর অপরকেও যেতে দেয় না।

পক্ষান্তরে যাদের মনে এ রোগ নেই, তারা তা হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য মহান স্রষ্টার কাছে দুআও করে। তিনি বলেছেন,

{وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ} (১০) سورة الحشر

“যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং বিশ্বাসে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাদেরকে ক্ষমা কর এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিশ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো দয়ালু, পরম দয়ালু।” (হাশ্বঃ ১০)

১৮। ঈর্ষ্যবোধহীনতা

কিছু উচিত হিংসা আছে, তা করা উচিত। কিন্তু এক শ্রেণীর রোগা মন সে হিংসা বা ঈর্ষা থেকে শূন্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

(( لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا ، فَسَلَّطَهُ عَلَىٰ هَلَكَةٍ فِي الْحَقِّ ،

وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً ، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا )) متفقٌ عَلَيْهِ

“কেবলমাত্র দু’টি বিষয়ে ঈর্ষা করা যায় (১) এই ব্যক্তির প্রতি যাকে মহান আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন, অতঃপর তাকে হক পথে অকাতরে দান করার ক্ষমতা দান করেছেন এবং (২) এই ব্যক্তির প্রতি যাকে মহান আল্লাহ হিকমত দান করেছেন, অতঃপর সে তার দ্বারা ফায়সালা করে ও তা শিক্ষা দেয়।” (বুখারী ৭৩, মুসলিম ১৯৩০নং)

আর এক প্রকার ঈর্ষা কোন মনে না থাকলে সে ‘দাইয়ুস’ (মেড়া) হয়, আর তার ফলে সে জাহান্নামের উপযুক্ত হয়। যে পুরুষ তার স্ত্রী-কন্যার ব্যাপারে ঈর্ষাহীন। তারা কোন নোংরামি করলে, কোন পরপুরুষের সাথে নষ্টিফটি করলে তার গায়ে জ্বালা ধরে না। পরপুরুষদের সাথে মোবাইল বা নেটে চ্যাটিং করলে তার মনে ঈর্ষা হয় না, আত্মমর্যাদাবোধ হয় না। সে নাকি আধুনিক ও উদার মানুষ। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِمُ الْجَنَّةُ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُ وَالِدِيُوثُ الَّذِي يُقْرِ فِي أَهْلِهِ الْخُبْتُ)).

“তিন শ্রেণীর লোকের জন্য আল্লাহ তাবারাকা অত্যালা জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। অব্যাহতভাবে মদ পানকারী, পিতা-মাতার অবাধ্যজন এবং এমন বেহায়া, যে তার পরিবারের অশ্লীলতাকে মেনে নেয়।” (আহমাদ ৫৩৭২, ৬১১৩নং)

## ১৯। ঘৃণা ও বিদ্বেষ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

(( لَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَدَابَرُوا ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا ، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ : لَا يَظْلِمُهُ ، وَلَا يَحْقِرُهُ ، وَلَا يَخْذُلُهُ ، التَّقْوَى هَاهُنَا - وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - بِحَسَبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ ، دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ )) . رواه مسلم

“তোমরা এক অপরের প্রতি হিংসা করো না, কেনা-বেচাতে জিনিসের মূল্য বাড়িয়ে এক অপরকে ধোকা দিয়ো না, এক অপরের প্রতি শত্রুতা রেখো না, এক অপার থেকে (ঘৃণাভরে) মুখ ফিরায়ো না এবং এক অপরের (জিনিস) কেনা-বেচার উপর কেনা-বেচা করো না। আর হে আল্লাহর

বান্দারা! তোমরা ভাই-ভাই হয়ে যাও। মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তার প্রতি যুলুম করবে না, তাকে তুচ্ছ ভাববে না এবং তাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবে না। আল্লাহভীতি এখানে রয়েছে। (তিনি নিজ বুকের দিকে ইঙ্গিত করে এ কথা তিনবার বললেন।) কোন মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ ভাবা একটি মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। প্রত্যেক মুসলিমের রক্ত, মাল এবং তার মর্যাদা অপর মুসলিমের উপর হারাম।” (মুসলিম ৬৭০৬নং)

হে মনোরোগা মানুষ! তোমার সুকোমল হৃদয়ে মানুষের প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ, হিংসা, পরিশ্রীকাতরতা প্রভৃতির কয়লার আগুন জ্বালিয়ে নিজের ভিতরে নিজেকে পুড়িয়ে ফেলো না। আগুন নিভিয়ে দাও, শান্তি পাবে।

২০। লোকের ভয়

মুসলিমের উচিত, আল্লাহকে ভয় করা। কিন্তু তা না ক’রে সে ভয় করে লোককে। ফলে সে সৎকার্য বর্জন করে, ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ হয় না।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَمْنَعْنِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ } (البقرة ১৫০)

“সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না, বরং একমাত্র আমাকেই ভয় কর, যাতে আমি আমার অনুগ্রহ তোমাদেরকে পরিপূর্ণরূপে দান করতে পারি এবং যাতে তোমরা সৎপথ পেতে পার।” (বাক্বারাহঃ ১৫০)

{ الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ } (سورة المائدة ৩)

“আজ অবিশ্বাসিগণ তোমাদের ধর্মের বিরুদ্ধাচরণে হতাশ হয়েছে। সুতরাং তাদেরকে ভয় করো না, শুধু আমাকে ভয় করা।” (মায়িদাহঃ ৩)

{ فَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ وَاخْشَوْنَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا

أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } (سورة المائدة ৫৫)

“সুতরাং তোমরা মানুষকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর এবং আমার আয়াত নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করো না। আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই অবিশ্বাসী (কাফের)।” (মায়িদাহঃ ৪৪)

{ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ

وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ } (৩৭)

“স্মরণ কর, আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছ, তুমি তাকে বলেছিলে, ‘তুমি তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ করো না

এবং আল্লাহকে ভয় করা।’ আর তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন করছিলে, আল্লাহ তা প্রকাশ ক’রে দিচ্ছেন; তুমি লোককে ভয় করছিলে, অথচ আল্লাহকেই ভয় করা তোমার পক্ষে অধিকতর সঙ্গত।” (আহযাবঃ ৩৭)

আর এ কথাও বিদিত যে, লোকের ভয়ে কাজ করা যেমন শির্ক, তেমনি লোকের ভয়ে কাজ বর্জন করাটাও শির্ক। যেহেতু সে লোকের ভয়ে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে অনুৎসাহিত হয়।

লোকের ভয়ে কর্তব্য থেকে পিছপা হলে পার্থিব তথা বৈয়াক্তিক ও সামাজিক ক্ষতি আছে তাতে। কবি বলেছেন,

‘করিতে পারি না কাজ সदा ভয়, সदा লাজ,  
সংশয়ে সংকল্প সदा টলে,  
পাছে লোকে কিছু বলে।  
আড়ালে আড়ালে থাকি নীরবে আপনা ঢাকি  
সম্মুখে চরণ নাহি চলে,  
পাছে লোকে কিছু বলে।  
হৃদয়ে বৃদবৃদ-মত উঠে শুভ্র চিন্তা কত  
মিশে যায় হৃদয়ের তলে,  
পাছে লোকে কিছু বলে।  
কাঁদে প্রাণ যবে, আঁখি সযতনে শুষ্ক রাখি  
নির্মল নয়নের জলে,  
পাছে লোকে কিছু বলে।  
একটি স্নেহের কথা প্রশমিতে পারে ব্যথা  
চলে যায় উপেক্ষার ছলে,  
পাছে লোকে কিছু বলে।  
মহৎ উদ্দেশ্যে যবে একসাথে মিলে সবে  
পারি না মিলিতে সেই দলে,  
পাছে লোকে কিছু বলে।  
বিধাতা দিয়েছেন প্রাণ থাকি সदा ব্রিয়মান  
শক্তি মরে ভীতির কবলে,  
পাছে লোকে কিছু বলে।’

মহান আল্লাহ তাঁর ব্যাপারে অকুতোভয় লোককে পছন্দ করেন। তিনি বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ}

وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ { (৫৫) المائدة

“হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ ধর্ম হতে ফিরে গেলে আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় আনয়ন করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন ও যারা তাঁকে ভালবাসবে, তারা হবে বিশ্বাসীদের প্রতি কোমল ও অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দায় ভয় করবে না, এ আল্লাহর অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়।” (মায়িদাহঃ ৫৫)

আবু যারর রাঃ বলেন,

أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ ، بِحُبِّ الْمَسْكِينِ ، وَأَنْ أَذْنُو مِنْهُمْ ، وَأَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنِّي ، وَلَا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي ، وَأَنْ أَصِلَ رَحِمِي وَإِنْ جَفَانِي ، وَأَنْ أَكْثَرَ مِنْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ، وَأَنْ أَتَكَلَّمَ بِمُرِّ الْحَقِّ ، وَلَا تَأْخُذْنِي فِي اللَّهِ لَوْمَةٌ لَائِمٌ ، وَأَنْ لَا أَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا .

আমাকে আমার বন্ধু রাঃ সাতটি কাজের অসিয়ত করে গেছেন;

(১) আমি যেন মিসকীনদেরকে ভালোবাসি এবং তাদের নিকটবর্তী হই (বসি)।

(২) আমার থেকে যারা নিম্নমানের তাদের প্রতি লক্ষ্য (করে উপদেশ বা সাহুনা গ্রহণ) করি ও আমার থেকে যে উর্ধ্ব তার প্রতি লক্ষ্য না করি।

(৩) আমার প্রতি অন্যায় করা হলেও আমি যেন আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখি।

(৪) বেশী বেশী ‘লা হাউলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ বলি।

(৫) তিক্ত হলেও যেন হক কথা বলি।

(৬) আল্লাহর ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দা-ভয় যেন আমাকে না ধরে।

(৭) লোকেদের কাছে যেন কিছুও না চাই। (আহমাদ ২ঃ ১৪১৫, ত্বাবারানী ১৬২৬, সহীহ তারগীব ৮ঃ ১১নং)

উবাদাহ ইবনে স্বামেত রাঃ বলেন,

بَايَعْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَشْطِ وَالْمَكْرِهِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لَا تُنَازَعَ الْأَمْرَ أَهْلُهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ بُرْهَانٌ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ إِيْمًا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ

لَا تُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

‘আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এই মর্মে বাইয়াত করলাম যে, দুঃখে-সুখে, আরামে ও কষ্টে এবং আমাদের উপর (অন্যদেরকে) প্রাধান্য দেওয়ার অবস্থায় আমরা তাঁর পূর্ণ আনুগত্য করব। রাষ্ট্রনেতার বিরুদ্ধে তার নিকট থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার লড়াই করব না; যতক্ষণ না তোমরা (তার মধ্যে) প্রকাশ্য কুফরী দেখ, যে ব্যাপারে তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে দলীল রয়েছে। আর আমরা সর্বদা সত্য কথা বলব এবং আল্লাহর ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করব না।’ (বুখারী ৭২০০, মুসলিম ৪৮৭৪নং)

কিন্তু দ্বীনের ব্যাপারে তো দূরের কথা, বৈধ বা বিধেয় সাংসারিক বিষয়েও মানুষ মানুষকে ভয় করে। লোক-সমাজের ভয়ে কত মানুষ নিজ বৈধ সুখ উপভোগ করা থেকেও নিজেকে বঞ্চিত করে। যে জিনিস মহান সৃষ্টিকর্তা হালাল করেছেন, সে জিনিসকে মূর্খ সমাজের চাপে হারাম করতে বাধ্য হয়। সুতরাং কত বিশাল সে বঞ্চনা!

সামর্থ্য থাকতেও কত বিধবা ও স্ত্রীহারা পুনর্বিবাহে উৎসাহিত না হয়ে, কত সুখবঞ্চিত হতভাগা পুরুষ দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণে উদ্বুদ্ধ না হয়ে সুখের মরণ মরতে পারে না। শুধু লোক-সমাজের ভয়ে। কত নিকৃষ্ট সে ভয়!

## ২১। অজ্ঞতা, মূর্খামি

ইসলাম আসার পূর্ব যুগের নাম ছিল ‘জাহেলী যুগ’। সে যুগের লোকেরা যত বড়ই শিক্ষিত ছিল, প্রকৃতপ্রস্তাবে তারা ছিল জাহেল। সুতরাং ইসলাম আসার পরেও যারা ইসলামী জ্ঞান লাভে আগ্রহ দেখায় না, তারা অন্য বিষয়ে শিক্ষিত হলেও আসলে কিন্ত জাহেল।

সাবালক হওয়ার সাথে সাথে মানুষের উপর যা প্রথম ফরয হয়, তা হল ইল্ম শিক্ষা। আমল ও তবলীগ করার আগে আবশ্যিক হল ইল্ম শিক্ষা করা। আর অজ্ঞতা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা, না জেনে ও না মেনে আল্লাহর ক্ষমালাভের আশা ক’রে বসে থাকা, ‘যত জানব-শিখব, তত মানতে হবে’---এই ভয়ে দ্বীনী শিক্ষায় উদ্দীপিত না হওয়া, ‘যা শিখিছি, তাই যথেষ্ট’ মনে ক’রে ইসলামী শিক্ষায় অনুপ্রাণিত না হওয়া মনের একটি মহা ব্যাধি।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} (১৭) سورة محمد

“সুতরাং তুমি জেনে রাখ, আল্লাহ ছাড়া (সত্য) কোন উপাস্য নেই।”  
(মুহাম্মাদঃ ১৯)

আর মহানবী ﷺ বলেছেন,

((طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ))

“ইলম অনুসন্ধান করা প্রত্যেক (নর-নারী) মুসলিমের জন্য ফরয।” (সঃ জামে’ ২৯ ১৩, সঃ তারগীব ৭২নং)

ইবাদতের আগে তা শিখতে হয়। না জেনে, না শিখে ইবাদত বিদআত হয়। প্রচারের আগে তার বিষয়বস্তু সঠিকভাবে শিখে নিতে হয়। নচেৎ বাতিল প্রচারের অপরাধ ঘাড়ে চাপে।

অজ্ঞ না জেনে কত কথা বলে, কত কুধারণা করে, কত সঠিক কথা বুঝতে ভুল করে, কত ভালো কথার অপব্যাখ্যা করে। আবার সামান্য শিখেই অনেকে হামবড়াই করে। আর তেমন অর্ধ-শিক্ষিত বড় ক্ষতিকর হয়। ‘নিম হাকীম খতরায়ে জান, নিম মোল্লা খতরায়ে ঈমান।’ এবং তাদের ‘অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী’ হয়।

একজন শিক্ষিত চাকরি পেয়ে গেলে অথবা কোন মহিলার বিবাহ হয়ে গেলে নিশ্চিত হয়ে হয়তো তারা ভাবে, মোক্ষলাভ হয়ে গেছে। আর পড়াশোনার প্রয়োজন কী? হয়তো তারা দুনিয়াদারির পড়াও আর পড়তে চায় না। আর দুনিয়ায় সুখ ও সাফল্য লাভ হয়েছে বিধায় তারা পরকালের কথা ভুলে অথবা অবজ্ঞা ক’রে দ্বীনী শিক্ষার পড়াও পড়তে আগ্রহী হয় না। যেহেতু পার্থিব জীবনই তাদের কাছে সব কিছু এবং পরকালের জীবন তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয় অথবা তাতে তেমন বিশ্বাস নেই।

‘এত শিখিয়াছ এটুকু শেখনি কিসে কড়ি আসে দুটো?’ এ তো দুনিয়াদারির শিক্ষা আছেই। এ শিক্ষা না শিখলে হয়তো না খেতে পেয়ে দেহ মারা যায়, কিন্তু দ্বীনী শিক্ষা না শিখলে প্রয়োজনীয় খোরাক না পেয়ে আত্মা মারা যায়। সুতরাং সুশিক্ষিত হয়েও সেই শিক্ষা শেখা আবশ্যিক, যে শিক্ষা না শিখে থাকলে মহাবিজ্ঞানীও কবর-পরীক্ষালয়ে বলবে, ‘হাহ-হাহ লা আদরী’ (হায় হায়! আমি তো জানি না)! আর পরিষ্ক ফিরিশ্তা বলবেন, ‘তুমি না পড়েছ এবং না জেনে নিয়েছ।’

সুতরাং অজ্ঞ অথবা বিজ্ঞ, কারো জন্যও বৈধ নয় দ্বীনী ইলম শিক্ষার ব্যাপারে অনিহা প্রকাশ করা। কারণ অজ্ঞতা একটা বড় মনোরোগ। তার চাইতেও বড় রোগ তাদের, যারা অজ্ঞ হয়েও নিজেদেরকে বিজ্ঞ মনে করে এবং না জেনেও মনে মনে ভাবে, তারা সব কিছু জানে অথবা ভাবে-ভঙ্গিতে প্রকাশ করে, তারা বড় জ্ঞানী।

## ২২। দুঃখ-দুশ্চিন্তা

বিপদগ্রস্ত হলে অথবা দারিদ্র্য বা অভাব-অনটনে পড়লে মানুষ দুঃখ পায়, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়। কিছু হারিয়ে গেলে, ধ্বংস হয়ে গেলে, ক্ষতি হলে সে অর্ধৈর্য হয়, তকদীরের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়, আল্লাহর প্রতি অভিযোগ আনে। কখনো-বা তার ফলে ঈমানই হারিয়ে ফেলে। অনেকে মানসিক বিকার, মস্তিষ্ক-বিকৃতি বা স্নায়ুবিক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। তার ফলে অনেকে আত্মহত্যা বা অন্য কোন অপরাধের শিকার হয়ে যায়।

অথচ এ ক্ষেত্রে তাকে জানতে হয়, সে পাপী হলে মহান আল্লাহ তার পাপের কিছু শাস্তি প্রদান করছেন। পাপী না হলে আল্লাহ তাকে পরীক্ষা করছেন এবং সেই পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি তার মর্যাদা বর্ধন করছেন।

মু'মিন বিপদে বিচলিত হয় না। সবল-দুর্বল সকল মু'মিনের ব্যাপারে মহানবী ﷺ বলেছেন,

«الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٍ احْرَصُ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِزَّ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ».

“সবল মু'মিন আল্লাহর নিকট দুর্বল মু'মিন অপেক্ষা প্রিয়তর ও ভালো। অবশ্য উভয়ের মাঝেই কল্যাণ রয়েছে। তোমার যাতে উপকার আছে তাতে তুমি যত্নবান হও। আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর, আর অক্ষম হয়ে বসে পড়ো না। কোন মসীবত এলে এ কথা বলো না যে, ‘(হায়) যদি আমি এরূপ করতাম, তাহলে এরূপ হতো। (বা যদি আমি এরূপ না করতাম, তাহলে এরূপ হতো না।)’ বরং বলো, ‘আল্লাহ তকদীরে লিখেছিলেন। তিনি যা চেয়েছেন তাই করেছেন।’ (আর তিনি যা করেন, তা বান্দার মঙ্গলের জন্যই করেন; যদিও তুমি তা বুঝতে না পার।) পক্ষান্তরে ‘যদি-যদি না’ (বলে আক্ষেপ) করায় শয়তানের কর্মদ্বার খুলে যায়।” (আহমাদ ৮৭৯১, ৮৮-২৯, মুসলিম ৬৯৪৫, ইবনে মাজাহ ৭৯, সহীহুল জামে' ৬৬৫০ নং)

## ২৩। মুসলিমদের পরাজয়ে আনন্দ

রোগা মনের একটি পরিচয় এই যে, মুসলিমদের পরাজয়ে আনন্দিত হয়, তাদের কষ্ট দেখে সুখানুভব করে এবং তাদের ক্ষয়-ক্ষতি দেখে দুশমন-হাসি হাসে। বিপরীত দিকে মুসলিমদের ঋদ্ধি-বৃদ্ধি-সমৃদ্ধি দেখে এমন



কষ্টানুভব করে।

এমন রোগা মন চায়, মুসলিমদের খ্যাতি মলিন হোক, তাদের গর্ব খর্ব হোক, তাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হোক, তাদের মাঝে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক; যেমন বেশ্যা চায়, সারা দুনিয়ার নারীজাত বেশ্যা হোক।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (سورة النور ১৭)

“যারা বিশ্বাসীদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, তাদের জন্য আছে ইহলোকে ও পরলোকে মর্মস্তুদ শাস্তি। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।” (নূর : ১৯)

## ২৪। হৃদয়ের কঠিনতা

এ সংসার জগতে বসবাস করার মাঝে আমরা লক্ষ্য করি, মানুষের মন কত কঠিন! মানুষ কত শতভাবে নিষ্ঠুর মনের পরিচয় দেয়। মন যে কত কঠোর হতে পারে, আমরা তার নমুনা পাই। অবশ্য প্রত্যেক মানুষের এই কঠোরতার পিছনে কোন না কোন কারণ আছে। কিন্তু আমরা অনুভব করি, আমরা আমাদের ইবাদতে ও নামায়ে বিনয়-নম্রতা থাকে না।

কুরআন তেলাঅতের সময় আমাদের ক্রন্দন আসে না বা ক্রন্দনের ভাবও প্রকাশ পায় না।

দুঃখের সময় অথবা দুঃখ দেখে বা শুনে আমাদের চোখে পানি আসে না।

আচরণে ও পানাহারে হারাম ও সন্দিগ্ধ বিষয়ে আমরা সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করি না।

পরের হক নষ্ট করতে মন সন্তুষ্ট হয় না।

অন্যায় ও অত্যাচার করতে মনে ভয় হয় না।

মানুষের সাথে ব্যবহারে পরুষতা ও কর্কশতা বর্জন করি না।

আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নভিন্ন করি।

ছোটদের প্রতি স্নেহ নেই, মায়া-মমতা ও করুণা নেই।

স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনে মধুরতা নেই, প্রেম-ভালোবাসা নেই।

অভাবীর অভাব পূরণে বা ঋণদানে উদ্বুদ্ধ হই না।

পিতা বা শিক্ষক নিষ্ঠুরভাবে ছাত্রকে মারধর করে।

হাসপাতালে রোগী না দেখে ডাক্তার ও নার্স নিজেদের ডিউটি পালন করে!

প্রসূতিকে প্রসব করাতে করাতেও গান গায় নার্স! প্রসব-বেদনায় কাতর হয়ে মা কাঁদলে ধমক দেয় তাকে!

অসুখ-যন্ত্রণায় মুমূর্ষু দেখে রোগীর আত্মীয় ডাক্তারকে ভালো ক’রে দেখতে বললে, তিনি বলেন, ‘আমাকে কি ডাক্তারি শিখাতে এসেছ?’ সহায়িকা নার্স বলে, ‘উনি ভগবান! উনি সব জানেন। উনাকে শিখাতে হবে না।’

শিশুকে কোলে নিয়ে চোখের পানি ফেলে পরিচিত মুসলিম ডাক্তারকে অনুরোধ করেছি, ‘এর খিচুনি বন্ধ হওয়ার জন্য কিছু করুন।’ ওয়াদা দেওয়ার পরেও কিছু করার তো দূরের কথা, দেখা হলে জিজ্ঞাসাও করেন না, ‘বাচ্চাটা কেমন আছে?’

মালিক চাকরের প্রতি দয়া দেখায় না। বাড়ির গিল্লী পরিচারিকার উপর অকথ্য অত্যাচার চালায়।

শ্বাশুড়ী-মাতা মা ও নারী হয়েও বধূর উপর অবাধে নির্যাতন চালায়।

কুসুম-হৃদয়ে প্রেম সঞ্চিত হয়ে প্রেমিক নাগরকে ভালোবাসে। সেই হৃদয়ই কত নিষ্ঠুর হয়ে স্বামীকে হত্যা করে!

সমাজ-দেহে আজ মারাত্মক ভাইরাস ছড়িয়ে রয়েছে, আর তা হল নিষ্ঠুরতা। মানুষের অন্তর কঠিন হয়েছে বলেই সে নির্দয়। তার মনে যেন কোন দয়া নেই, মায়া নেই, ভালোবাসা নেই, স্নেহ নেই, বিনয়-নম্রতা নেই। এ মারাত্মক ব্যাধি পূর্ববর্তী জাতির মধ্যে ছিল। তাদেরকে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা হতে দূরে থাকার ফলে তাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গিয়েছিল। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাদের মতো হতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন,

{أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ}

“যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদের সময় কি আসেনি যে, আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তাদের হৃদয় ভক্তি-বিগলিত হবে? এবং পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের মত তারা হবে না? বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের অন্তর কঠিন হয়ে পড়েছিল। আর তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী।” (হাদীদঃ ১৬)

তিনি আরো বলেছেন,

{ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسَوَةً وَإِنَّ مِنْ الْحِجَارَةِ}

لَمَّا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَشَقُّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَهْبِطُ  
مِنْ حَشِيَّةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ { (سورة البقرة ٧٤)

“এর পরও তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেল; তা পাষণ কিংবা তার থেকেও কঠিনতর, অথচ কিছু পাথর এমন আছে যে, তা থেকে নদী-নালা প্রবাহিত হয় এবং কিছু পাথর এমন আছে যে, বিদীর্ণ হওয়ার পর তা থেকে পানি নির্গত হয়। আবার কিছু পাথর এমন আছে, যা আল্লাহর ভয়ে ধসে পড়ে। বস্তুতঃ তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে আল্লাহ উদাসীন নন।” (বাক্বারাহঃ ৭৪)

তাদের হৃদয় পাথর অপেক্ষা বেশি কঠিন হয়ে গিয়েছিল। ফলে তারা কোন উপদেশ গ্রহণ করত না। কোন মন-গলানো উপদেশ তাদের মনকে গলাতে পারত না। কোন নিদর্শন বা মু’জিয়া তাদের মনের পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম ছিল না। হক-বাতিরের মাঝে তাদের হৃদয়ে কোন পার্থক্য ছিল না।

কঠিন হৃদয় এক প্রকার মৃত হৃদয়, বিকল হৃদয়। সে হৃদয়ে ঈমান থাকে না, কপটতা থাকে। গ্রহণ থাকে না, প্রত্যাখ্যান থাকে। এই কারণে কাফের ও মুনাফিকদের জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এটা এক প্রকার শাস্তি।

মালেক বিন দীনার বলেছেন, ‘(ইহকালে বান্দার) দেহ-মনে মহান আল্লাহর শাস্তি আছে। জীবনে সংকীর্ণতা, ইবাদতে দুর্বলতা। আর কোন বান্দা হৃদয় কঠিন হয়ে যাওয়ার চাইতে বড় শাস্তি অন্য কিছু পায়নি।’ (হিলয়াহ ৬/২৮৭)

বানী ইস্রাঈলকে মহান আল্লাহ কত নেয়ামত দিয়েছিলেন, কত নিদর্শন দিয়েছিলেন, কত উপদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু তারা তা গ্রহণ করেনি, তার কদর করেনি। তাদের হৃদয় আসলে পাথর হয়ে গিয়েছিল। “কিংবা তার থেকেও কঠিনতর, অথচ কিছু পাথর এমন আছে যে, তা থেকে নদী-নালা প্রবাহিত হয় এবং কিছু পাথর এমন আছে যে, বিদীর্ণ হওয়ার পর তা থেকে পানি নির্গত হয়। আবার কিছু পাথর এমন আছে, যা আল্লাহর ভয়ে ধসে পড়ে।” আসলে তাদের হৃদয়ে আল্লাহর ভয় ছিল না।

যাদের অন্তর কঠিন, যাদের অন্তরে সন্দিহান ও বাসনার ব্যাধি আছে, তারা বেশি ফিতনাগ্রস্ত হয়। ফিতনার সময় তারা নিজেরাই খাল কেটে কুমীর আনে। ঘটনাপ্রবাহে সন্দিহান হয়ে ফিতনাকে হাতে লুফে নেয়। দ্বীনের কোন একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ পেলে সেই প্রবেশ-পথ দিয়ে প্রবেশ ক’রে ফিতনা সৃষ্টি করে। তখনই প্রকাশ পায় তাদের গোপন পরিচয়।

যখনই আল্লাহর রসূল ও নবীগণ অহীলক্ব কথা পড়ে শুনান, তখনই

শয়তান উক্ত অহীর কথার সাথে নিজের কিছু কথা মিলিয়ে দিতে চেষ্টা করে বা লোকেদের মনে সংশয় সৃষ্টি করে। মহান আল্লাহ শয়তানের সমস্ত বাধা দূর ক’রে অথবা তেলাঅতে তার কিছু মিলিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টাকে ব্যর্থ ক’রে অথবা শয়তানের প্রক্ষিপ্ত সন্দেহ ও সংশয় নিরসন ক’রে নিজের কথা বা আয়াতকে সুদৃঢ় করেন। তিনি বলেছেন, “আমি তোমার পূর্বে যে সব রসূল কিংবা নবী প্রেরণ করেছি, তাদের কেউ যখনই আকাঙ্ক্ষা করেছে, তখনই শয়তান তার আকাঙ্ক্ষায় কিছু প্রক্ষিপ্ত করেছে। কিন্তু শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে, আল্লাহ তা বিদূরিত করেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহকে সুদৃঢ় করেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (হাঙ্কঃ ৫২)

এর মাধ্যমে রসূল ﷺ-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, এই শ্রেণীর কর্মকাণ্ড শয়তান শুধুমাত্র তোমার সাথেই করেনি; বরং তোমার পূর্ববর্তী সকল নবীদের সাথেই করেছে। সুতরাং তুমি কিছুমাত্র বিচলিত হবে না। শয়তানের ঐ সমস্ত চক্রান্ত ও দুরভিসন্ধি হতে যেমন আমি পূর্বের নবীদেরকে রক্ষা করেছি, তেমনি তুমিও সুরক্ষিত থাকবে এবং শয়তানের অনিচ্ছা সত্ত্বেও মহান আল্লাহ নিজের বাণীকে পাকাপোক্ত ও সুদৃঢ় করবেন।

কিন্তু রোগা মনের মানুষরা তা মানবে কেন? আল্লাহ তাদেরকে পরীক্ষায় ফেলেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ

الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ} (সূরা الحج ৫৩)

“এটা এ জন্য যে, শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে তিনি তা পরীক্ষা স্বরূপ করেন তাদের জন্য যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে এবং যারা পাষণ-হৃদয়। নিশ্চয় অত্যাচারীরা চরম বিরোধিতায় রয়েছে।” (হাঙ্কঃ ৫৩)

পক্ষান্তরে এসব ব্যাপারে লাভ হয় জ্ঞানী ও খাঁটি মু’মিনদের। এই জন্য তিনি তার পরেই বলেছেন, “আর এ জন্যও যে, যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তারা যেন জানতে পারে যে, এটা তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে প্রেরিত সত্য; অতঃপর তারা যেন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর যেন তার প্রতি অনুগত হয়। যারা বিশ্বাস করেছে তাদেরকে আল্লাহ অবশ্যই সরল পথে পরিচালিত করেন। (হাঙ্কঃ ৫৪)

সন্দিহান ও পাষণ মনে কত রকমের সন্দেহ, অবিশ্বাস ও মুনাফিকী থাকে, তার কি ইয়ত্তা আছে। তারা কি মু’মিনদের ব্যাপারে নিষ্ঠুরতা বর্জন করবে? আল্লাহ না চাইলে কোন দিনই না। তিনি বলেছেন, “যারা অবিশ্বাস করেছে তারা ওতে সন্দেহ পোষণ করা হতে বিরত হবে না; যতক্ষণ না

তাদের নিকট কিয়ামত এসে পড়বে আকস্মিকভাবে অথবা এসে পড়বে এক বক্ষ্যা (অশুভ) দিনের শাস্তি। সে দিন আল্লাহরই আধিপত্য হবে; তিনিই তাদের বিচার করবেন; যারা বিশ্বাস করে ও সংকর্ম করে তারা অবস্থান করবে সুখময় জান্নাতে। আর যারা অবিশ্বাস করে ও আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যাঞ্জন করে, তাদেরই জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। (হাঙ্ক ৪ ৫৫-৫৭)

কঠোর হৃদয়ের মানুষেরা ফিতনার আগে আগে ছোটো। যেখানে ফিতনা সেখানে রাগে রাগে জোটে। পরিবেশ তাদেরকে রুঢ় বানায়। পরিমন্ডলের পারিপার্শ্বিকতা তাদেরকে রুক্ষ বানায়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((الْإِيمَانُ يَمَانٌ هَذَا هُنَا أَلَا إِنَّ الْقَسْوَةَ وَغَلَطَ الْقُلُوبِ فِي الْفِدَائِينَ عِنْدَ أَصُولِ أَذْنَابِ الْإِبِلِ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ فِي رَبِيعَةٍ وَمُضَرٍّ)).

“ঈমান ইয়ামানী সেখানে (ইয়ামানে)। হৃদয়ের কঠিনতা ও নিষ্ঠুরতা আছে উটের লেজের গোড়ায় হাঁকডাক-ওয়ালাদের ভিতরে, যেখানে শয়তানের দুই শিঙা উদয় হয় রবীআহ ও মুযার গোত্রো।” (বুখারী ৩৩০২, মুসলিম ১৯০নং)

তিনি আরো বলেছেন,

((غَلَطَ الْقُلُوبِ وَالْجَفَاءُ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْإِيمَانُ وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ)).

“হৃদয়ের কঠোরতা ও রুক্ষ ব্যবহার আছে পূর্ব দিকে এবং ঈমান ও প্রশান্তি আছে হিজাযবাসীদের ভিতরে।” (আহমাদ ১৪৭১৫, মুসলিম ২০২নং)

নম্র হৃদয়ের অধিকারী বিনম্র-ভদ্র। অমায়িক তার ব্যবহার। আল্লাহর ইবাদতে বিনয়ী। কুরআন তিলাঅতে কাঁদে, সৃষ্টির ব্যথায় ব্যথিত হয়, সমবেদনায় তার মন টনটন করে, সহমর্মিতায় পীড়িত হয়, সহযোগিতায় আগ্রহী হয়, পরোপকারে উৎসাহী হয়, পরার্থপরতায় ব্রতী হয়।

পক্ষান্তরে পাষণ হৃদয়ের মানুষ অহংকারী ও উদ্ধত হয়। ব্যবহারে রুঢ় হয়, অত্যাচারী ও নির্দয় হয়, কান্নার কথাতেও তার কান্না আসে না, পরের ব্যথায় সমব্যথী হয় না। নিশ্চয়ই কঠোর-চিন্তের মানুষ শান্ত-চিত্ত ও সুখী হয় না।

## হৃদয় কঠিন হওয়ার কারণসমূহ

কিছু কাজ এমন আছে, যা করলে হৃদয় কঠিন হয়, মনে নিষ্ঠুরতা সৃষ্টি হয়। এই অবসরে আমরা কিছু কাজের কথা উল্লেখ করব, যাতে সাবধানী মানুষ সাবধান হতে পারে।

## (১) আল্লাহর যিক্র থেকে বিমুখতা

মহান আল্লাহর যিক্র হৃদয় প্রশান্ত হয়। তাঁর দরবারে গড়াগড়ি দিলে হৃদয়-মন চাঙ্গা থাকে। ঠিক তার বিপরীত কর্ম করলে; আল্লাহর যিক্র থেকে উদাসীন হলে, আল্লাহর স্মরণে বিমুখ হলে হৃদয় কঠিন হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى}

“যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ হবে, অবশ্যই তার হবে সংকীর্ণতাময় জীবন এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।” (ত্বা-হাঃ ১২৪)

আর মহানবী ﷺ বলেছেন,

(( مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ )) .

“যে আল্লাহর যিক্র করে আর যে যিক্র করে না, উভয়ের উদাহরণ মৃত ও জীবন্ত মানুষের মত।” (বুখারী ৬৪০৭নং)

হ্যাঁ, আল্লাহকে স্মরণকারী হৃদয় সতেজ, সঞ্জীবিত, তরতাজা ও আলোকপ্রাপ্ত। পক্ষান্তরে যিক্রহীন অন্তর তেপান্তর, নির্জলা মরুভূমি, তিমিরাম্বুজ, কঠিন ও বিভ্রান্ত। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ

ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ} (২২) سورة الزمر

“আল্লাহ ইসলামের জন্য যার বক্ষ উন্মুক্ত ক’রে দিয়েছেন ফলে সে তার প্রতিপালক হতে (আগত) আলোর মধ্যে আছে, সে কি তার সমান--যে এরূপ নয়? দুর্ভোগ তাদের জন্য, যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে কঠিন, ওরাই স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।” (যুমারঃ ২২)

তিনি মু’মিনদের উদ্দেশ্যে বলেছেন,

{أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا

يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ

مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ} (১৬) سورة الحديد

“যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদের সময় কি আসেনি যে, আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তাদের হৃদয় ভক্তি-বিগলিত হবে? এবং পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের মত তারা হবে না? বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের অন্তর কঠিন হয়ে পড়েছিল। আর তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী।” (হাদীদঃ ১৬)

আহলে কিতাব (ইয়াহুদী-খ্রিস্টান)রা আল্লাহর কিতাবে পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। এর বিনিময়ে দুনিয়ার সামান্য ও তুচ্ছ সম্পদ সঞ্চয় করাকে তারা নিজেদের পেশায় পরিণত করেছিল। তার (কিতাবের) বিধি-বিধানকে তারা পশ্চাতে ফেলে দিয়েছিল। আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে বড়দের অন্ধ অনুকরণ আরম্ভ করেছিল এবং তাদেরকেই নিজেদের প্রভু বানিয়ে নিয়েছিল। উক্ত আয়াতে মুসলিমদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, তোমরা এ রকম কাজ করো না। নচেৎ তোমাদের অন্তরও শক্ত হয়ে যাবে এবং তার ফলে ঐ কাজগুলো যা তাদের জন্য আল্লাহর অভিশাপের কারণ হয়েছিল, তোমাদেরকেও ভাল লাগবে।

## (২) ফরয পালনে অবহেলা করা

আল্লাহর ফরয পালনে অবহেলা করলে, তাঁর সাথে কৃত ওয়াদার খিলাপ করলে, তাঁর চুক্তি ভঙ্গ করলে, তাঁকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করলে তাঁর পক্ষ থেকে শাস্তি স্বরূপ অন্তর কঠিন হয়ে যায়। মহান আল্লাহ উক্ত আহলে কিতাবদের এক শ্রেণী লোকের ব্যাপারে বলেছেন,

{فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} (১৩) سورة المائدة

“তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের দরুন আমি তাদেরকে অভিসম্পাত করেছি ও তাদের হৃদয় কঠোর ক’রে দিয়েছি, তারা (তাওরাতের) বাক্যাবলীর পরিবর্তন সাধন ক’রে থাকে এবং তারা যা উপদেষ্টা হয়েছিল তার একাংশ ভুলে গেছে। তুমি সর্বদা ওদের অল্পসংখ্যক ব্যতীত সকলেরই তরফ হতে বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ পেতে থাকবে। সুতরাং তুমি ওদেরকে ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন।” (মায়িদাহঃ ১৩)

## (৩) আল্লাহর অবাধ্যাচরণ করা বা পাপ করা

মহান আল্লাহ বলেন,

{كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} (১৪) سورة المطففين

অর্থাৎ, না এটা সত্য নয়; বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের হৃদয়ে জং ধরিয়ে দিয়েছে। (মুতাফ্‌ফিফীনঃ ১৪)

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نَكِثَتْ فِي قَلْبِهِ نَكْتَةً سَوْدَاءَ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ

وَتَابَ سَقْلَ قَلْبِهِ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُو قَلْبُهُ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ كَلَّا  
بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ)).

“মু’মিন যখন কোন পাপ করে, তখন তার হৃদয়ে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। অতঃপর সে যদি তওবা করে, পাপ থেকে বিরত হয় এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে তার হৃদয় পরিষ্কার হয়ে যায়। আর যদি আরো বেশি পাপ করে, তাহলে সেই দাগ তার হৃদয়কে গ্রাস ক’রে নেয়। এই হল সেই জং, যার কথা আল্লাহ তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন।” (আহমাদ ৭৮৯২, তিরমিযী ৩৩৩৪, সহীহ ইবনে মাজাহ ৩৪২২নং)

অতি মহাপাপ যেমন, কুফরী, শির্ক, মুনাফিকী, সন্দেহ, গায়রুল্লাহর ভয়, গায়রুল্লাহর উপর ভরসা, খেয়াল-খুশীর অনুসরণ ইত্যাদি এবং মহাপাপ যেমন, অহংকার, কার্পণ্য, কাপুরুষতা, হিংসা, বিদ্বেষ, পদ-লোভ, গদির লোভ, যুবক-যুবতীর অবৈধ প্রেম-ভালবাসা, পার্থিব প্রেম, অর্থপ্রেম ইত্যাদি মানুষের হৃদয়কে কঠিন ক’রে তোলে। অর্থের মোহ হৃদয়কে অন্ধ ক’রে তোলে। যে হৃদয়ে এই শ্রেণীর পাপ থাকে, সে হৃদয়ের আকাশ থেকে বৃষ্টির আশা করা ভুল। সে হৃদয়-ওয়ালার চক্ষু আল্লাহর ভয়ে অশ্রু-বর্ষণ করতে পারে না।

মাকহুল বলেছেন, ‘যার পাপ সবার চেয়ে কম, তার হৃদয় সবার চেয়ে নরম।’ (ইবনে আবিদ দুনয়া ৬৬নং)

ইবনে আক্বাস রাঃ বলেছেন, ‘নিশ্চয় পুণ্য কাজের ফলে চেহারায়ে জ্যোতি আসে, হৃদয়ে আলো আসে, রুযীতে বরকত আসে, দেহে শক্তি আসে, সৃষ্টির মনে ভালবাসা আসে। আর পাপ কাজের ফলে চেহারায়ে কালিমা আসে, হৃদয়ে অন্ধকার আসে, রুযীতে কমতি আসে, দেহে দুর্বলতা আসে, সৃষ্টির মনে বিদ্বেষ আসে।’ (আল-ওয়াবিলুস সুইয়িব ১/৪৩)

পাপের ফলে মনের প্রদীপের কাঁচে কালি পড়ে যায়, মরিচা পড়ে যায়। আরো পাপ করতে থাকলে তার উপর আবরণ চড়ে। তারপরে তার উপর তালা পড়ে যায়। তাহলে সে মন কি কঠোর না হয়ে থাকে?

### (৪) পাপ প্রকাশ করা বা প্রকাশ্যে পাপ করা

((كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنْ الْمُجَاهِرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ)).

“আমার প্রত্যেক উম্মতের পাপ মাফ করে দেওয়া হবে, তবে যে



প্রকাশ্যে পাপ করে (অথবা পাপ করে বলে বেড়ায়) তার পাপ মাফ করা হবে না। আর পাপ প্রকাশ করার এক ধরন এও যে, একজন লোক রাতে কোন পাপ করে ফেলে, অতঃপর আল্লাহ তা গোপন করে নেন। (অর্থাৎ, কেউ তা জানতে পারে না।) কিন্তু সকাল বেলায় উঠে সে লোকের কাছে বলে বেড়ায়, ‘হে অমুক! গত রাতে আমি এই এই কাজ করেছি।’

রাতের বেলায় আল্লাহ তার পাপকে গোপন রেখে দেন; কিন্তু সে সকাল বেলায় আল্লাহর সে গোপনীয়তাকে নিজে নিজেই ফাঁস করে ফেলে।” (বুখারী ৬০৬৯নং, মুসলিম ৭৬৭৬নং)

উলামাগণ বলেন, কোন বান্দা যখন পাপ প্রকাশ করে, তখন সে যেন আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং তাঁর শাস্তিকে অবজ্ঞা করে। তাই তিনি তার হৃদয়কে কঠিন ও মৃত বানিয়ে তাকে শাস্তি দেন। পক্ষান্তরে যে পাপী নিজেকে গোপন করে, সে আসলে ভয় করে, তার হৃদয় অপেক্ষাকৃত নরম।

যারা পাপ প্রকাশ করে বা প্রকাশ্যে পাপ করে, তাদের বুকের পাটা খুব বেশি। তারা না আল্লাহকে ভয় করে, না মানুষকে। তাহলে সে বুকের ভিতরে হৃদয় তো কঠোর হবেই।

### (৫) মুখ্‌তায় তুষ্ট থাকা এবং ইল্ম অনুসন্ধান না করা

যে হৃদয়ে আল্লাহর ভয় নেই, সে হৃদয় কঠোর। আর যে হৃদয়ে ইল্ম নেই, তাওহীদের জ্ঞান নেই, শরীয়তের শিক্ষা নেই, ইল্ম অনুযায়ী আমল নেই, সে হৃদয় আল্লাহর ভয়শূন্য। তাই মুখ্‌তা বা শরয়ী জ্ঞানহীনতা হৃদয়ের কঠিনতার একটা হেতু। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ} (সূরা ফাটর ২৮)

“আল্লাহর দাসদের মধ্যে জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় ক’রে থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, বড় ক্ষমাশীল।” (ফাতিরঃ ২৮)

### (৬) খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করা ও হক প্রত্যাখ্যান করা

এটা এক শ্রেণীর মন-পূজরী মানুষদের অভ্যাস। তারা ভাবে, তারা বেশি বোঝে, অন্যে বোঝে না, যদিও দলীল থাকে তাদের প্রতিপক্ষের কাছে। তারা নিজের বুঝকে প্রাধান্য দিয়ে হককে প্রত্যাখ্যান করে। আর সেটা এক প্রকার অহংকার। যেহেতু অহংকারের সংজ্ঞা হল, ‘হক প্রত্যাখ্যান করা ও মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা।’

নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করা, হক গ্রহণ না করা এবং সেই অনুযায়ী আমল না করা এক প্রকার ঔদ্ধত্য, হঠকারিতা, অবিমূশ্যকারিতা, গৌড়ামি ও টেরামি। আর মহান আল্লাহর এক চিরন্তন নীতি, কেউ টেরামি করলে,

তার অন্তরকে তিনি টেরা করে দেন। তিনি বলেছেন,

{ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ } (৫) سورة الصف

“অতঃপর তারা যখন বক্রপথ অবলম্বন করল, তখন আল্লাহ তাদের হৃদয়কে বক্র ক’রে দিলেন। আর আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।” (স্বাফঃ ৫)

তিনি আরো বলেছেন,

{ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاهُمْ مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بَأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ } (১২৭) سورة التوبة

“যখন কোন সূরা অবতীর্ণ করা হয়, তখন তারা একে অপরের দিকে তাকাতে থাকে (এবং ইঙ্গিতে বলে); ‘তোমাদেরকে কেউ দেখছে না তো?’ অতঃপর তারা ফিরে যায়; আল্লাহ তাদের অন্তরকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। কারণ, তারা এমন এক সম্প্রদায় যাদের বোধশক্তি নেই।” (তাওবাহঃ ১২৭)

বরং এই শ্রেণীর দাস্তিক মানুষরা আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তিপ্ৰাপ্ত হয়ে পথভ্রষ্ট হয়। তিনি বলেছেন,

{ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كَلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ } (১৬৬) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءَ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } (১৬৭) الأعراف

“পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে গর্ব করে বেড়ায় তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী হতে ফিরিয়ে দেব; তারা আমার প্রত্যেকটি নিদর্শন দেখলেও ওতে বিশ্বাস করবে না। তারা সৎপথ দেখলেও ওকে পথ বলে গ্রহণ করবে না, কিন্তু তারা ভ্রান্ত পথ দেখলে তাকেই পথ হিসাবে গ্রহণ করবে। এটি এ কারণে যে, তারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা মনে করেছে এবং সে সম্বন্ধে তারা উদাসীন ছিল। যারা আমার নিদর্শনসমূহ ও পরকালের সাক্ষাৎকে মিথ্যা বলে, তাদের কার্য নিষ্ফল হবে। তারা যা করবে তদনুযায়ীই তাদেরকে প্রতিফল দেওয়া হবে।” (আ’রাফঃ ১৪৬-১৪৭)

শরীয়তের নীতি হল, কুরআন ও (সহীহ) সুন্নাহ মানতে হবে। আর তা বুঝার জন্য সলফদের বুঝ ব্যবহার করতে হবে। তা না ক’রে কিছু মানুষ সরাসরি নিজ জ্ঞান ও বিবেক দ্বারা কুরআন-হাদীস বুঝতে চায় এবং বড় বড় আলেমদেরকেও চ্যালেঞ্জ করে ও তুচ্ছ করে। অন্য দিকে কিছু মানুষ

নির্দিষ্ট কোন এক আলেম বা ইমামের বুঝের অন্ধানুকরণ করে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে তাঁর রায়কে কুরআন বা সহীহ সুন্নাহর উপর প্রাধান্য দেয়, কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর স্পষ্ট নির্দেশ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও ইজমা-কিয়াসের দোহাই দেয়। এর ফলশ্রুতি স্বরূপ তাদের হৃদয় কঠোর হয়ে যায়, আর তখন তারা বিরোধীকে গালাগালি করে, প্রতিপক্ষকে মূর্খ ভাবে, তাকে নানা অপবাদ দিয়ে কলঙ্কিত করে। তাদের মন হয়ে যায় গোঁড়া। উদারতা তাদের হৃদয় থেকে বিদায় গ্রহণ করে। আর তারই পরিণতিতে তৈরি হয় নতুন নতুন দল। সৃষ্টি হয় তর্ক-বিতর্ক ও সংঘাত। সুতরাং আল্লাহই সাহায্যস্থল।

### (৭) প্রয়োজনের তুলনায় অধিক করা

অতিরিক্ত কিছু ভালো নয়, যদিও সেটা বৈধ কিছু হয়। অতিতে ক্ষতি হয়। সমাজে মেশা ভালো, কিন্তু বেশি মেশা ভালো নয়। প্রয়োজনানুযায়ী খাওয়া ভালো, কিন্তু ভোজন-বিলাসী হওয়া ভালো নয়। যৌনক্ষুধা হালাল উপায়ে নিবারণ ভালো, কিন্তু অতিরিক্ত ভালো নয়। প্রয়োজন অনুপাতে কথা বলা ভালো, কিন্তু গপে হওয়া ভালো নয়। যেহেতু হৃদয়ে ফাটল ধরে, জং পড়ে, তার মিষ্টতা চলে যায়, তার ঈমানে দুর্বলতা ও কমতি আসে।

### ক। বেশি কথা বলা।

ইসলামী নীতি হল মুসলিম কথা বলবে অল্প। মহানবী ﷺ বলেন, “তোমাদের মধ্যে আমার নিকট অধিক প্রিয়তম ও কিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে নিকটে অবস্থানকারী সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সদাচরণে সবচেয়ে উত্তম। তোমাদের মধ্যে আমার নিকট অধিক ঘৃণ্যতম ও কিয়ামতের দিন আমার থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী অবস্থানকারী তারা, যারা অতিভাষী গপে, অতিবাদী---যারা অত্যাক্তি দ্বারা অপরকে খোঁচা মেরে থাকে এবং যারা অহংকারের সাথে মুখভর্তি লম্বা লম্বা কথা বলে থাকে।”

(সহীহুল জামে' ২: ১৯৭নং)

যারা বেশি কথা বলে তাদের বাজে ও মিথ্যা বকা স্বাভাবিক। সুতরাং তাতে হৃদয়ের কঠিনতা সৃষ্টি হতেই পারে।

ফুয়াইল বিন ইয়ায (রঃ) ও বিশর বিন হারেস (রঃ) বলেছেন, ‘দু’টি আচরণ হৃদয়কে কঠিন করে দেয়, বেশি কথা বলা ও বেশি খাওয়া।’

(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' ৮/৪৪, হিল্যাতুল আওলিয়া ৮/৩৫০)

বেশি কথা বললে হৃদয় কঠিন হয়ে যায়---এ ব্যাপারে একটি হাদীসও বর্ণিত আছে। কিন্তু সেটি সহীহ নয়।

বেশি কথা বলার পর্যায়ে দ্বীনের বিষয়ে তর্ক-বিতর্কও পড়ে। আর ইমাম

শাফেয়ী বলেছেন, ‘দ্বীনের ব্যাপারে তর্ক-বিতর্ক অন্তরকে কঠিন ক’রে দেয় এবং বিদ্বেষ সৃষ্টি করে।’ (সিয়ারু আ’লামিন নুবালা’ ১০/২৮)

### খ। অধিক খাওয়া

অধিক খাওয়া ও ভোজন-বিলাসে হৃদয় কঠিন হয়ে যায়। যেমন পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

### গ। অধিক হাসা

অধিক হাসার ফলে অন্তর শুধু কঠিনই হয় না, বরং মারা যায়। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “তোমরা বেশী বেশী হেসো না। কারণ, বেশী হাসার ফলে হৃদয় মারা যায়।” (আহমাদ, তিরমিযী, ২৩০৫, ইবনে মাজাহ ৪১৯৩, সহীহুল জামে’ ৭৪৩৫নং)

### (৮) কুসঙ্গীর সংসর্গ

নিজে ভাল হলেও অনেক সময় খারাপ বন্ধুর সংসর্গে থেকে হৃদয় নষ্ট হয়ে যায়, চরিত্র ভষ্ট হয়ে যায়। এই জন্য মহানবী ﷺ মন্দ সাথীকে কামারের সাথে তুলনা করেছেন, যার পাশে বসলে কাপড় পুড়ে যায় অথবা খারাপ গন্ধ পাওয়া যায় অথবা ধোঁয়ায় শ্বাসরোধ হওয়ার উপক্রম হয়।

ভষ্ট বন্ধু যে ভাল বন্ধুকেও নষ্ট করে, সে কথা মহান আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

{وَيَوْمَ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا . يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا . لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا } [الفرقان ২৭-২৯]

অর্থাৎ, সীমালংঘনকারী সেদিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, ‘হায়! আমি যদি রসূলের সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম। হায় দুর্ভোগ আমার! আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। আমাকে অবশ্যই সে বিভ্রান্ত করেছিল আমার নিকট কুরআন পৌছানোর পর। আর শয়তান তো মানুষকে বিপদকালে পরিত্যাগই করে।’ (ফুরক্বানঃ ২৭-২৯)

সঙ্গী বা সঙ্গিনীর সাথে অতিরিক্ত বৈধ প্রেমও হৃদয়কে কঠিন করে দিতে পারে। তাহলে গোপনভাবে অবৈধ প্রেম কী করতে পারে তা অনুমেয়।



## হৃদয় নরম করার উপায়

কতিপয় আমল আছে, তা করলে কঠোর হৃদয়ের মানুষ নরম হৃদয়ের হয়ে যেতে পারে। আর তার ফলে---আল্লাহর তওফীকে---তার চোখে পানি আসতে পারে। সেই আমলগুলি নিম্নরূপ :-

### (১) আল্লাহর সুন্দরতম নাম ও গুণাবলী এবং তাঁর কর্মাবলীর জ্ঞান

পূর্বে বলা হয়েছে যে, যে তার সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও রুযীদাতাকে চিনবে, সে তাঁকে ভয় করবে এবং তাঁর কাছে আশা রাখবে। সে তাঁর তরফ থেকে দুঃখের ভয় করবে ও সুখের আশা রাখবে। আর বিপরীত আশঙ্কায় তার বুক বেদনায় টনটন করবে এবং তার চোখ বেয়ে ঝরঝর ক’রে অশ্রু ঝরবে।

সুলাইমান দারানী বলেছেন, ‘প্রত্যেক জিনিসের প্রতীক আছে। আর আল্লাহর ভালবাসা ও সাহায্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার প্রতীক হল আল্লাহর ভয়ে কান্না বর্জন করা।’ (আল-বিদায়াহ অন-নিহায়াহ ১০/২৫৬)

সুতরাং আল্লাহ যখন বান্দাকে তাঁর ভালবাসা ও সাহায্য থেকে বঞ্চিত করেন, তখন বান্দার হৃদয় কঠোর হয়ে যায় এবং তার চোখে পানি আসে না।

প্রেমিক প্রেমিকের সাথে সাক্ষাতের আশায় কান্না করে, তার বিরহের ভয়ে কান্না করে। সুতরাং বান্দা যদি আল্লাহকে ভালবাসে, তাহলে সে তাঁর সাক্ষাতের আগ্রহে কান্না করবে, তাঁর শাস্তির ভয়ে কান্না করবে এবং তাঁর সমৃদ্ধি ও পুরস্কারের আশায় কান্না করবে।

এই তো সেই যিকরকারী বান্দা, যে হৃদয়ে ভয়, ভালবাসা ও আশা রেখে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ ক’রে অশ্রু বিসর্জন করে। এই বান্দাই তো তাঁর আরশের নিচে ছায়া পাবে।

আল্লাহর শাস্তি, আযাব ও জাহান্নামকে ভয় করা, আল্লাহকে ভয় করার পর্যায়ভুক্ত। যেমন আমল কবুল না হওয়ার ভয়ও সেই শ্রেণীর ভয়। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ} (৭০)

অর্থাৎ, যারা তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে, এই বিশ্বাসে তাদের যা দান করবার তা দান করে ভীত-কম্পিত হৃদয়ে। (মু’মিনুনঃ ৬০)

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এ (ভীত-কম্পিত) কি সেই ব্যক্তি, যে ব্যভিচার করে, চুরি করে ও মদ

পান করে?’ উত্তরে তিনি বললেন, “না, হে সিদ্দীকের বেটি! সে হল সেই ব্যক্তি, যে রোযা রাখে, দান করে ও নামায পড়ে, কিন্তু ভয় করে যে, তা হয়তো কবুল হবে না।” (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, হাকেম)

## (২) অর্থ বুঝে কুরআন পাঠ

অর্থ বুঝে কুরআন তিলাঅত করলে হৃদয় নরম হতে বাধ্য। যেহেতু কুরআনে রয়েছে আল্লাহর পরিচয়, নানা ইতিহাস, আদেশ ও উপদেশ। তাছাড়া আল্লাহর কিতাব পাঠ ক’রে নরম হওয়া মু’মিন বান্দাদের খাস গুণ। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا . وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبَّنَا إِن كَان وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا . وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا} [الإسراء: ১০৭-১০৯]

অর্থাৎ, যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের নিকট যখন এটা পাঠ করা হয়, তখনই তারা চেহারা লুটিয়ে সিজদায় পড়ে এবং বলে, আমাদের প্রতিপালক পবিত্র, মহান! অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয়েই থাকে। আর তারা কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে (সিজদা) দেয় এবং এ (কুরআন) তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে।’ (বানী ইস্রাঈলঃ ১০৭-১০৯)

{اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ} (২৩) سورة الزمر

“আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত এমন এক গ্রন্থ, যাতে পারস্পরিক সাদৃশ্যপূর্ণ একই কথা নানাভাবে বার বার বলা হয়েছে। এতে যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের চামড়ার (লোম) খাড়া হয়, অতঃপর তাদের দেহ-মন আল্লাহর স্মরণের প্রতি নরম হয়ে যায়। এটিই আল্লাহর পথনির্দেশ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দিয়ে পথপ্রদর্শন করেন। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই।” (যুমারঃ ২৩)

এক রাতে মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির কাঁদতে লাগলেন। তাঁর বাড়ির লোক জমা হয়ে তাঁর কান্নার কারণ জানতে চাইল। কিন্তু কান্নায় তাঁর জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কিছু বলতে পারলেন না। তাই তারা আবু হাযেমকে ডেকে পাঠাল। তিনি এসে তাঁকে কিছু পরিমাণ ক্ষান্ত ক’রে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। মুহাম্মাদ বললেন, ‘আমি নামাযে আল্লাহর এই বাণী পাঠ

করলাম তাই,

{وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ

الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ} (৬৭) الزمر

অর্থাৎ, যারা সীমালংঘন করেছে; যদি তাদের পৃথিবীর সমস্ত কিছু এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরও কিছু থাকত, তাহলে কিয়ামতের দিন নিকৃষ্ট শাস্তি হতে মুক্তির জন্য পণ স্বরূপ তা প্রদান করত। তাদের সামনে আল্লাহর নিকট হতে এমন কিছু প্রকাশ হবে, যা ওরা কল্পনাও করেনি। (যুমারঃ ৪৭)

এ কথা শুনে আবু হাযেমও কাঁদতে লাগলেন। মুহাম্মাদ বিন মুনকাদিরও পুনরায় কাঁদতে শুরু করলেন। বাড়ির লোকেরা বলল, ‘আমরা আপনাকে উনার কান্না বন্ধ করার জন্য ডেকে পাঠালাম, আর আপনি উনার কান্না আরো বাড়িয়ে দিলেন!’ (সিয়ারু আ’লামিন নুবাল্লা’ ৫/৩৫৫)

### (৩) আল্লাহর যিক্র করা

আল্লাহকে স্মরণ করলে হৃদয় নরম থাকে, আল্লাহর যিক্রের মন প্রশান্ত থাকে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ} (২৮)

“যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের হৃদয় প্রশান্ত হয়। জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণেই হৃদয় প্রশান্ত হয়।” (রা’দঃ ২৮)

একদা এক ব্যক্তি হাসান বাসরী (রাহিমাহুল্লাহ)র নিকট নিজ হৃদয়ের কঠোরতার অভিযোগ করলে তিনি তাকে বললেন, ‘ওকে যিক্রের নিকটবর্তী করা।’

ইবনুল কাইয়েম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, ‘দুটি জিনিসের কারণে হৃদয়ে জং পড়ে : উদাসীনতা ও পাপাচারিতা। আর দুটি জিনিসে তার জেল্লা আসে : ইস্তিগফার (ক্ষমাপ্রার্থনা) ও যিক্র।’

### (৪) হৃদয়-গলানো বক্তাদের ওয়ায-নসীহত শোনা।

যিক্রের মজলিস তথা হকপন্থী উলামাদের ওয়ায-মাহফিলে বসা অথবা যন্ত্রের সাহায্যে তা শোনার মাধ্যমে অন্তর নরম হয়। হাসান বাসরী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, ‘যিক্রের মজলিস ইল্ম উজ্জীবিত করে এবং হৃদয়ে বিনয়-নম্রতা সৃষ্টি করে।’

### (৫) মরণকে স্মরণ করা

মরণকে স্মরণ করলে এবং সংসারের প্রতি মায়া কম করলে হৃদয় নরম হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((أَكْثَرُوا ذِكْرَ هَادِمِ اللَّذَاتِ)) - يَعْني الْمَوْتَ - ((فَإِنَّهُ مَا ذَكَرَهُ أَحَدٌ فِي ضَيْقٍ إِلَّا وَسَّعَهُ اللَّهُ ، وَلَا ذَكَرَهُ فِي سَعَةٍ إِلَّا ضَيَّقَهَا عَلَيْهِ)).

“তোমরা আনন্দনাশক বস্তু (অর্থাৎ, মৃত্যু)কে বেশি বেশি স্মরণ কর। কারণ, যে ব্যক্তি কোন সঙ্কটে তা স্মরণ করবে, সে ব্যক্তির জন্য সে সঙ্কট সহজ হয়ে যাবে এবং যে ব্যক্তি তা কোন সুখের সময়ে স্মরণ করবে, সে ব্যক্তির জন্য সুখ তিক্ত হয়ে উঠবে।” (বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ১০৫৬০, ইবনে হিব্বান ২৯৯৩, সহীহুল জামে’ ১২ ১০- ১২ ১১নং)

আবু দার্দা রাঃ বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি মরণকে স্মরণ করবে, তার আনন্দ কম হয়ে যাবে এবং হিংসাও কমে যাবে।’

সঈদ বিন জুবাইর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, ‘আমার হৃদয় যদি মরণকে স্মরণ করা হতে বিরত হয়, তাহলে আমার আশঙ্কা হয় যে, আমার হৃদয় নষ্ট হয়ে যাবে।’ (নুযহাতুল ফুয়লা ৫০৬পৃঃ)

(৬) রোগী দেখতে যাওয়া।

(৭) মরণাপন্ন রোগীর জান কবয় দর্শন করা।

(৮) লাশ লোয়ানো ও কাফনানো দেখা ও জানাযার নামাযে ও দাফনকার্যে অংশগ্রহণ করা।

(৯) কবর যিয়ারত করা।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,

((كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنه يرق القلب و تدمع العين و تذكر الآخرة و لا تقولوا هجرا)).

“আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। শোনো! এখন তোমরা যিয়ারত করতে পার। কারণ, কবর যিয়ারত হৃদয় নম্র করে, চক্ষু অশ্রুসিক্ত করে এবং পরকাল স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে (যিয়ারতে গিয়ে) বাজে কথা বলো না।” (হাকেম ১৩৯৩নং)

(১০) নিজের জন্য কাফন প্রস্তুত রাখা।

সাহাবাগণের অনেকেই নিজের কাফন নিজেই প্রস্তুত ক’রে রেখেছিলেন। (বুখারী) খাফাব রাঃ নিজের কাফন দেখে কাঁদতেন। (হিল্যাতুল আউলিয়া ১/১৪৫)



(১১) মৃত্যু ও কবর বিষয়ক বই পড়া, ওয়ায ও গজল শোনা।

(১২) নবী ﷺ ও দরিদ্র সাহাবা ﷺ-দের অভাব-অনটনের জীবনী পড়া।

(১৩) এতীম, মিসকীন ও অভাবী লোকেদের অভাব-অভিযোগ শোনা।

নবী ﷺ আবুদ দারদা ﷺ-কে বলেছিলেন,

((أَتُحِبُّ أَنْ يَلِينَ قَلْبُكَ وَتُذْرِكَ حَاجَتَكَ؟ أَرْحَمَ الْيَتِيمَ وَأَمْسَحَ رَأْسَهُ وَأُطْعِمَهُ مِنْ طَعَامِكَ يَلِينُ قَلْبُكَ وَتُذْرِكُ حَاجَتَكَ)).

“তুমি কি পছন্দ কর, তোমার হৃদয় নরম হোক এবং তোমার প্রয়োজন পূরণ হোক? এতীমের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর, তার মাথায় (সস্নেহে) হাত বুলাও, তাকে তোমার নিজের খাবার খাওয়াও, তাহলে তোমার হৃদয় নরম হবে এবং তোমার প্রয়োজন পূরণ হবে।” (ত্বাবারানী, সহীহুল জামে’ ৮০নং)

(১৪) নরম মনের মানুষদের সাথে উঠা-বসা করা।

জা’ফর বিন সুলাইমান বলেন, ‘যখন আমি হৃদয়ে কঠোরতা অনুভব করতাম, তখন মুহাম্মাদ বিন ওয়াসে’র নিকট গিয়ে তাঁর চেহারার দিকে তাকাতাম।’ তিনি ছিলেন বড় একজন আবেদ ও নেক লোক। তার চেহারা ছিল সন্তানহারা শোক-সন্তপ্ত মায়ের চেহারার মতো। (নুযহাতুল ফুয়াল্লা ৬৩৮পৃঃ)

(১৫) তাহাজ্জুদের নামায পড়া।

সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন নির্জনে মহান আল্লাহকে নামাযের মাধ্যমে স্মরণ করলে অবশ্যই অন্তর নরম হবে।

(১৬) আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দুআ করা।

মনকে নরম করার জন্য দুআ করা উচিত। নরম হৃদয়ের অধিকারী এই বলে দুআ করতেন,

اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا.

“হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট সেই ইল্ম থেকে পানাহ চাচ্ছি, যা কোন উপকারে আসে না। সেই হৃদয় থেকে পানাহ চাচ্ছি, যা বিনম্র হয় না। সেই মন থেকে পানাহ চাচ্ছি, যা তৃপ্ত হয় না এবং সেই দুআ থেকে পানাহ চাচ্ছি, যা কবুল হয় না।” (মুসলিম ৭০৮১নং)

পরিশেষে জেনে রাখা ভালো যে, স্ত্রীর সাথে প্রেম-রসিকতা করা, ছেলে-

মেয়ে বা বন্ধুদের সাথে হাসি-আমোদ করা এবং চাষ, ব্যবসা বা চাকরি করা হৃদয় কঠিন হওয়ার কারণ নয়। এ সবে অতিরঞ্জন করায় হৃদয় কঠিন হতে পারে। হৃদয় নরম করার জন্য সংসার ত্যাগ করার প্রয়োজন নেই। মনের অবস্থা পরকালের দিকে থাকবে, ইহকালের অংশ বিস্মৃত হলে চলবে না। ইহকালে মন লাগবে, তবে তাতে বিভোল হলে হবে না। ঠিক ৩ প্রকার মাছির মতো, মিষ্টির ঝোলে এসে বসে মিষ্টি পানীয় খাওয়ার মতো। এক প্রকার মাছি ঝোলে আটকে যাবার ভয়ে তাতে বসেই না, ফলে খেতেও পায় না। আর এক প্রকার মাছি অতি লোভে একেবারে ঝোলের মাঝে বসে, ফলে সে ফেঁসে যায় এবং আর উঠতে পারে না। কিন্তু তৃতীয় প্রকার মাছি পাত্রের কিনারায় বসে প্রয়োজন মতো শুঁড় বাড়িয়ে খায় এবং সময়ে উড়ে যায়।

মানুষের মনের অবস্থা কাল-পাত্র-ভেদে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। সংসারের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেই মন কঠোর হয় না।

আবু রিব্বী হানযালাহ বিন রাবী' উসাইয়িদী ؓ বলেন, একদা আবু বাকর ؓ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে বললেন, 'হে হানযালাহ! তুমি কেমন আছ?' আমি বললাম, 'হানযালাহ মুনাফিক হয়ে গেছে।' তিনি (আশ্চর্য হয়ে) বললেন, 'সুবহানাল্লাহ! এ কী কথা বলছ?' আমি বললাম, '(কথা এই যে, যখন) আমরা রাসূলুল্লাহ ؐ-এর নিকটে থাকি, তিনি আমাদের সামনে এমন ভঙ্গিমায় জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা করেন, যেন আমরা তা স্বচক্ষে দেখছি। অতঃপর যখন আমরা রাসূলুল্লাহ ؐ-এর নিকট থেকে বের হয়ে আসি, তখন স্ত্রী সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য (পার্থিব) কারবারে ব্যস্ত হয়ে অনেক কিছু ভুলে যাই।' আবু বাকর ؓ বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমাদেরও তো এই অবস্থা হয়।' সুতরাং আমি ও আবু বাকর গিয়ে রাসূলুল্লাহ ؐ-এর খিদমতে হাজির হলাম। অতঃপর আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! হানযালাহ মুনাফিক হয়ে গেছে।' রাসূলুল্লাহ ؐ বললেন, "সে কী কথা?" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা যখন আপনার নিকটে থাকি, তখন আপনি আমাদেরকে জান্নাত-জাহান্নামের কথা এমনভাবে শুনান; যেমন নাকি আমরা তা প্রত্যক্ষভাবে দেখছি। অতঃপর আমরা যখন আপনার নিকট থেকে বের হয়ে যাই এবং স্ত্রী সন্তান-সন্ততিও কারবারে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, তখন অনেক কথা ভুলে যাই। (এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ ؐ বললেন,

(( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ تَدْرُمُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي ، وَفِي الذِّكْرِ ، لَصَافَحْتُكُمُ الْمَلَائِكَةَ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ ، لَكِنَّ يَا حَنْظَلَةَ سَاعَةً وَسَاعَةً ))

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

“সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ আছে! যদি তোমরা সর্বদা এই অবস্থায় থাকতে, যে অবস্থাতে তোমরা আমার নিকটে থাক এবং সর্বদা আল্লাহর স্মরণে মগ্ন থাকতে, তাহলে ফিরিশ্তাগণ তোমাদের বিছানায় ও তোমাদের পথে তোমাদের সঙ্গে মুসাফাহ করতেন। কিন্তু ওহে হানযালাহ! (সর্বদা মানুষের এক অবস্থা থাকে না।) কিছু সময় (ইবাদতের জন্য) ও কিছু সময় (সাংসারিক কাজের জন্য)।” তিনি এ কথা তিনবার বললেন। (মুসলিম ৭১৪২-৭১৪৩নং)

অনুরূপ আনাস বিন মালেক رضي الله عنه বলেন, একদা কিছু সাহাবা মহানবী ﷺ-এর নিকটে উপস্থিত হয়ে বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! কা’বার রবের কসম! আমরা ধ্বংস হয়ে যাব।’ তিনি বললেন, “তা কেন?” তাঁরা বললেন, ‘মুনাফিকীর আশঙ্কা হয়, মুনাফিকীর!’ তিনি বললেন, “তোমরা কি সাক্ষ্য দাও না যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই এবং আমি তাঁর রসূল?” তাঁরা বললেন, ‘অবশ্যই।’ তিনি বললেন, “এটা মুনাফিকী নয়।” অতঃপর তাঁরা দ্বিতীয়বার তাঁকে একই কথা বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! কা’বার রবের কসম! আমরা ধ্বংস হয়ে যাব।’ তিনি বললেন, “তা কেন?” তাঁরা বললেন, ‘মুনাফিকীর আশঙ্কা হয়, মুনাফিকীর!’ তিনি বললেন, “তোমরা কি সাক্ষ্য দাও না যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই এবং আমি তাঁর রসূল?” তাঁরা বললেন, ‘অবশ্যই।’ তিনি বললেন, “এটা মুনাফিকী নয়।” অতঃপর তাঁরা তৃতীয়বার তাঁকে একই কথা বললেন। তিনি বললেন, “এটা মুনাফিকী নয়।” তাঁরা বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমরা যখন আপনার কাছে থাকি, তখন এক অবস্থায় থাকি। আর যখন আপনার নিকট থেকে বের হয়ে যাই, তখন সংসার ও পরিবার আমাদেরকে ব্যস্ত ক’রে তোলে।’ আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, “যখন তোমরা আমার নিকট থেকে বের হয়ে যাও, তখন যদি সেই অবস্থায় থাকতে, যে অবস্থাতে তোমরা আমার নিকটে থাক, তাহলে ফিরিশ্তাগণ মদীনার পথে তোমাদের সঙ্গে মুসাফাহ করতেন।” (আবু য়া’লা ৩৩০৪, সিলসিলাহ সহীহাহ ২২৩৫নং)

## ২৫। হৃদয়ের অন্ধত্ব

যে চোখ দিয়ে দুনিয়া দেখা যায়, সে চোখ যদি অন্ধ হয়, তাহলে কোন জিনিসকেই তার আসল বা নকল কোন রূপেই দেখা সম্ভব হয় না। অনুরূপ যে হৃদয় দিয়ে হক-নাহকের পার্থক্য সূচিত হয়, ভালো-মন্দের তফাৎ করা

যায়, সত্য-অসত্যের বিচার করা যায়, মানুষের দুঃখ-ব্যথা অনুভব করা যায়, সে হৃদয় যদি অন্ধ হয়ে যায়, তাহলে মানুষের মাঝে ও পশুর মাঝে পার্থক্য থাকে আর কতটুকু?

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ} (سورة الأعراف ١٧٩)

“আমি তো বহু জ্বিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি; তাদের হৃদয় আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চক্ষু আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা দর্শন করে না এবং তাদের কর্ণ আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা শ্রবণ করে না। এরা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়; বরং তা অপেক্ষাও অধিক বিভ্রান্ত! তারাই হল উদাসীন।” (আ’রাফঃ ১৭৯)

এ জীবনের কিছু রহস্য উদ্ঘাটন ক’রে মানুষ ধরাকে সরাঞ্জান করে, স্রষ্টার সন্ধান পায় না।

সৃষ্ট এত নিদর্শন দেখেও সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে অনুভব করতে পারে না।

এত স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও স্রষ্টার প্রেরিত দূতকে চিনতে পারে না।

তাঁর অবতীর্ণ গ্রন্থ সম্বন্ধে বিশ্বাস আনয়ন করতে পারে না।

তাঁর পাঠানো একমাত্র সত্য দ্বীনকে সত্যরূপে অনুধাবন করতে পারে না।

অহংকারের ফলে মানুষ ঔদাস্য ও বোধশক্তিহীনতার শিকার হয়।

সে মানুষ প্রতিপালকের অনুগ্রহলাভে ধন্য হয় না। আল্লাহ তাকে সত্য দেখা ও গ্রহণ করার তওফীক দেন না। তিনি বলেছেন,

{سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ} (سورة الأعراف ١٤٦)

“পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে গর্ব করে বেড়ায় তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী হতে ফিরিয়ে দেব; তারা আমার প্রত্যেকটি নিদর্শন দেখলেও ওতে বিশ্বাস করবে না। তারা সৎপথ দেখলেও ওকে পথ বলে গ্রহণ করবে না, কিন্তু তারা ভ্রান্ত পথ দেখলে তাকেই পথ হিসাবে গ্রহণ করবে। এটি এ কারণে যে, তারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা মনে করেছে এবং সে সম্বন্ধে তারা উদাসীন ছিল।” (আ’রাফঃ ১৪৬)

{وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤْنَ} (২৬) سورة الأحقاف

“নিশ্চয় আমি তাদেরকে (আদ সম্প্রদায়কে) যে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম তোমাদেরকে তা দিইনি; আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়; কিন্তু তাদের কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় তাদের কোন কাজে আসেনি, কেননা তারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করেছিল। আর যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তাই তাদেরকে পরিবেষ্টন করল।” (আহক্বাফঃ ২৬)

অনেক সময় মানুষ চোখে দেখে এবং কানে শোনে, কিন্তু হৃদয় দিয়ে না দেখা ও শোনার ফলে এবং দেখা ও শোনার আগ্রহ ও ইচ্ছা না থাকার ফলে সে কিছুই দেখে না, কিছুই শোনে না।

‘আজ তুমি দেখেও দেখ না

সব কথা শুনিতে না পাও।

কাছে আস আশা ক’রে আছি সারা দিন ধরে,

আনমনে পাশ দিয়ে তুমি চলে যাও।’

ইন্দ্রিয়ের সাথে মনের যোগ না হলে কর্ম সম্পাদন হয় না, মনোযোগ না থাকলে কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা উপকার সাধিত হয় না। তাই চক্ষুমান হয়েও মানুষ যদি হৃদয়বান না হয়, তাহলে তার দ্বারা সত্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব হয় না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا}

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ} (৬১) سورة الحج

“তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতি-শক্তিসম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হতে পারত। বস্তুতঃ চক্ষু তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বন্ধস্থিত হৃদয়।” (হাজ্জঃ ৪৬)

২৬। হৃদয় মোহরাস্কিত হওয়া

হৃদয়ে তালা লেগে যাওয়া বা মোহর লেগে যাওয়া হৃদয়ের সবচেয়ে বড় ব্যাধি। যে হৃদয়-গৃহে সত্যের আপ্যায়ন হয়, ভালোবাসার অনুভূতি হয়, সে হৃদয়-গৃহের দরজা যদি বন্ধ থাকে, তাহলে আর পথ কোথায়?

‘দ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমটাকে রুখি,

সত্য বলে, আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি?’

যে অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, সে অন্তর অনুভূতিহীন ও

নির্বোধ হয়ে পড়ে। তখন সে সহজ বিষয়ও বুঝতে পারে না, অনুধাবন করার জিনিস অনুধাবন করে না। শোনার জিনিস শুনতে পায় না। ফলে তারা সত্যকে সত্য রূপে চিনতে পারে না, তারা হিদায়াতের পথপ্রাপ্ত হয় না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصْبَأْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ} (سورة الأعراف (১০০))

“কোন দেশের অধিবাসীর ধ্বংসের পর যারা ওর উত্তরাধিকারী হয়েছে, তাদের নিকট এটা কি প্রতীয়মান হয়নি যে, আমি ইচ্ছা করলে তাদের পাপের দরুন তাদেরকে শাস্তি দিতে পারি এবং তাদের হৃদয় মোহর ক’রে দিতে পারি; ফলে তারা শুনবে না।” (আ’রাফঃ ১০০)

{وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ} (১৬) محمد

“তাদের মধ্যে কতক তোমার কথা মন দিয়ে শোনে, অতঃপর তোমার নিকট হতে বের হয়ে জ্ঞানবানদেরকে বলে, এই মাত্র সে কী বলল? ওরাই তারা, যাদের অন্তরে আল্লাহ মোহর মেরে দেন এবং তারা নিজেদের খেয়াল-খুশীরই অনুসরণ করে।” (মুহাম্মাদঃ ১৬)

{رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ} (৮৭)

“তারা অন্তঃপুরবাসিনী নারীদের সাথে থাকতে পছন্দ করল এবং তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেওয়া হল। সুতরাং তারা বুঝতে অক্ষম।” (তাওবাহঃ ৮৭)

{أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَفْئَالُهَا} (সورة محمد (২৬))

“তবে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা-ভাবনা করে না? নাকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?” (মুহাম্মাদঃ ২৬)

{أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ

وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ} (الجاثية (২৩))

“তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে তার খেয়াল-খুশীকে নিজের উপাস্য ক’রে নিয়েছে? আল্লাহ জেনেশুনেই ওকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং ওর কর্ণ ও হৃদয় মোহর ক’রে দিয়েছেন এবং ওর চোখের ওপর রেখেছেন পর্দা। অতএব, আল্লাহ মানুষকে বিভ্রান্ত করার পর কে তাকে পথনির্দেশ করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?” (জাযিয়াহঃ ২৩)

## হৃদরোগের চিকিৎসা

রোগা মন নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করলে নিশ্চয় তা বান্দার জন্য সর্বনাশিতার কারণ। ইব্রাহীম নবী عليه السلام মহান আল্লাহকে বলেছিলেন,  
 {وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ (৮৭) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (৮৮) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} (৮৯) سورة الشعراء

“(হে আল্লাহ!) তুমি আমাকে পুনরুত্থান-দিবসে লাঞ্ছিত করো না। যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না; সেদিন উপকৃত হবে কেবল সেই; যে আল্লাহর নিকট সুস্থ অন্তঃকরণ নিয়ে উপস্থিত হবে।’ (শুআ’রাঃ ৮৭-৮৯)

মানুষের শরীর যেমন রোগগ্রস্ত হয়, তেমনি রোগগ্রস্ত হয় তার মন, তার হৃদয়। রোগ সৃষ্টিকারী হেতুসমূহ থেকে সতর্ক ও সাবধান থাকতে পারলে যেমন দেহে রোগ আসে না, তেমনি মনও; মনের রোগ সৃষ্টিকারী সমূহ কারণ থেকে দূরে থাকতে পারলে মন সুস্থ থাকে, চিত্ত ব্যাধিশূন্য হয়।

হৃদয়ে জং পড়ে, যেমন লোহায় জং ধরে। অলংকারে মরিচা পড়ে, মনেরও মরিচা আছে। আয়নায় দাগ-ধাক্কা পড়ে, তেমনি মানুষের অন্তরেও কালিমা এসে থাকে। আর পরিষ্কার ক’রে জেল্লা আনতে হয় মহান আল্লাহর যিকরের মাধ্যমে।

মানুষের দেহ উলঙ্গ হয়, তাকে লেবাস দিয়ে ঢাকতে হয়। তেমনি মনও উলঙ্গ হয়, তাকে ‘তাক্বওয়া’ দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়, পরহেযগারি দিয়ে সুসজ্জিত করতে হয়।

মানুষের দেহ যেমন ক্ষুধা-পিড়িত হয়, পিপাসিত হয়, তেমনি তার হৃদয়ও হয়। আর তার পানাহার হল মহান আল্লাহর মরিফাত, তাঁর প্রতি মহব্বত, তাঁর উপর ভরসা, তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষিতা ইত্যাদি।

রোগা মনের চিকিৎসা করতে হলে সৃষ্টিকর্তার চিকিৎসা-পথ্য গ্রহণ করতে হবে। সত্যনিষ্ঠার সাথে তাঁর প্রতি অভিমুখ করতে হবে, তাঁর কাছেই শরণার্থী হতে হবে, বেশি বেশি নফল নামায, রোযা, হজ্জ-উমরাহ ও দান-খয়রাত করতে হবে, নিযুতি রাতে যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে, তখন চোখের পানি ফেলে তাহাজ্জুদ পড়তে হবে, আল্লাহর স্মরণে মনকে মশগুল রাখতে হবে, নেক লোকদের সাহচর্য গ্রহণ করতে হবে, কারণ পরহেযগার আলেম হৃদয় রোগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا } (سورة الكهف ٢٨)

“তুমি নিজেকে তাদেরই সংসর্গে রাখ, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে তাঁর মুখমণ্ডল (দর্শন বা সন্তুষ্টি) লাভের উদ্দেশ্যে আহ্বান করে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে, তাদের দিক হতে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না। আর তুমি তার আনুগত্য করো না, যার হৃদয়কে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী ক’রে দিয়েছি, যে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে।” (কাহফঃ ২৮)

ইবনুল কাইয়েম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, “হৃদয়কে জীবিত রাখার কিছু কারণ হল : আল্লাহর প্রতি আগ্রহী হওয়া, তাঁর তায়ীম করা, তাঁর অহী কুরআন ও সুন্নাহ নিয়ে চিন্তাভাবনার সাথে অধ্যয়ন করা, তাঁর প্রতি আসক্তি রাখা, তাঁর অভিমুখী হওয়া, তাঁর অবাধ্যাচরণে অনুতপ্ত হওয়া, তাঁর অবাধ্যাচরণে পতিত হওয়ার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা, মনের খেয়াল-খুশীর বিরুদ্ধাচরণ করা, পরকালের জন্য প্রস্তুত থাকা এবং নেক লোকদের সাহচর্য গ্রহণ করা।” (ইগাযাতুল লাহফান)

অর্থ বুঝে কুরআন তিলাঅত মনোরোগের বড় চিকিৎসা। কুরআনের আদেশ-উপদেশ সেই রোগ চিকিৎসার মহা পথ্য। সৃষ্টিকর্তাই বেশি জানেন হৃদরোগের অব্যর্থ ওষুধ। তিনিই রোগের সৃষ্টিকর্তা, তিনিই তার আরোগ্যদাতা। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ } (سورة يونس ٥٧)

“হে মানব জাতি! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের তরফ হতে উপদেশ ও অন্তরের রোগের নিরাময় এবং বিশ্বাসীদের জন্য পথপ্রদর্শক ও করুণা সমাগত হয়েছে।” (ইউনুসঃ ৫৭)

{وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا }

“আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য আরোগ্য ও করুণা, কিন্তু তা সীমানাংঘনকারীদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।” (বানী ইস্রাঈলঃ ৮২)

{وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَبِيَّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَبِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ



لِّلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادُونَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۝ (৬৬) سورة فصلت

“আমি যদি অনারবী ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ করতাম, তাহলে ওরা অবশ্যই বলত, ‘এর আয়াতগুলি (বোধগম্য ভাষায়) বিবৃত হয়নি কেন? কী আশ্চর্য যে, এর ভাষা অনারবী অথচ রসূল আরবী!’ বল, বিশ্বাসীদের জন্য এ পথনির্দেশক ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন হবে এদের জন্য অন্ধকারস্বরূপ। এরা এমন যে, যেন এদের বহু দূর হতে আহ্বান করা হয়।” (হা-মীম সাজদাহঃ ৪৪)

মনে বিশ্বাস রেখে আন্তরিকতার সাথে কুরআন তিলাঅত করলে অন্তরের রোগ নিরাময় হয়। অবশ্য বিশ্বাসই যদি না থাকে, তাহলে তা হবে সেই চিকিৎসার মতো, যার ওষুধ মুখে নেওয়া হয়, কিন্তু গলাধঃকরণ করা হয় না।

সুলাইমান আল-খাওয়াস (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, ‘অন্তরের জন্য যিকর (কুরআন) দেহের জন্য খোরাকের মতো। যেমন দেহ অসুস্থ থাকলে খাবারের স্বাদ পাওয়া যায় না, তেমনি বিষয়াসক্তি থাকলে অন্তরে যিকর (বা কুরআনের) মিষ্টতা অনুভূত হয় না।’ (ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়াহ ৯/৩১২)

রোগা মনে অনেক কিছু উদয় হয়। কত বাজে ধারণা, বাজে কল্পনা এসে মনের দরজায় উকি দেয়। ইবনুল কাইয়েম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, “মনে কোন মন্দ কল্পনা এলে তা দূর ক’রে ফেল। যদি তা না কর, তাহলে তা চিন্তায় পরিণত হবে। চিন্তাকে মনে স্থান দিয়ে না, নচেৎ তা কামনা ও বাসনায় পরিণত হবে। এই কামনাকে নিবৃত্ত কর, নচেৎ তা দৃঢ়-সংকল্পে পরিণত হবে। এই পরিকল্পনাকেও প্রতিহত কর, নচেৎ তা কর্মে পরিণত হবে। এই কর্মকেও ব্যাহত কর, নচেৎ তা অভ্যাসে পরিণত হবে। আর অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেলে তুমি তা আর বর্জন করতে পারবে না। (আল-ফাওয়াইদ)

যা কার্যতঃ মানুষের নিকট প্রকাশ করা উচিত নয়, তার কথা মনে মনে কল্পনা করাও উচিত নয়। কিন্তু রোগা মনে তা স্থান পায়। শুধু স্থান পায় তা নয়, বরং বাসা বেঁধে জেঁকে বসে। ফলে সে কল্পনা মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

শূন্য মন শয়তানের বাসা। আসলে মন কোন সময় শূন্য থাকে না। এটা একটা পেষণযন্ত্র, যা সদাসর্বদা কিছু না কিছু পিষতেই থাকে। তাতে ধান দিলে ধান পিষে, গম দিলে গম। ইট দিলে ইট পিষে, লোহা দিলে লোহা।

ভালো-মন্দ সব পেষণ ক’রে থাকে এই যন্ত্র। কিন্তু ধান-গমের জায়গায় ইট-পাথর বা লোহা পিষলে পিষাই-কল সহসায় নষ্ট ও বিকল হয়ে যায়। এই জন্য মনের কলকে পিষাইয়ের জন্য ভালো কিছু দিতে হয়, নচেৎ মন্দ কিছু পিষে বিকল হয়ে পড়বে। মন্দ কিছু দিতে হয় না, ভালো কিছু না দিলে মন্দ আপনা-আপনি এসে যায় সে কলে এবং মনের অজানতেই তা পেষণ হতে শুরু করে।

কোন প্রকারে যদি পাথর-লোহা পিষে সে কল বিকল হয়ে যায়, তাহলে বিশুদ্ধ তওবার মাধ্যমে মেরামত করতে হয়। তা না করলে পোড়ো যন্ত্রে জং পড়ে, মরিচা ধরে, আরো কত কি।

মেরামত করার আরো একটি পদ্ধতি হল যথা সময়ে নেক আমল করা। নেক আমলের মাধ্যমে মন চাঙ্গা হয়, তরতাজা, প্রাণবন্ত ও সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(( يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ ، إِذَا هُوَ نَامَ ، ثَلَاثَ عُقَدٍ ، يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ : عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ ، فَإِنْ اسْتَيْقَظَ ، فَذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، فَإِنْ تَوَضَّأَ ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، فَإِنْ صَلَّى ، انْحَلَّتْ عُقْدَةُ كُلِّهَا ، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ ، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسَلَانَ )) . متفقٌ عَلَيْهِ

“যখন তোমাদের কেউ নিদ্রা যায়, তখন তার গ্রীবাদেশে শয়তান তিনটি করে গাঁট বেঁধে দেয়; প্রত্যেক গাঁটে সে এই বলে মন্ত্র পড়ে যে, ‘তোমার সামনে রয়েছে দীর্ঘ রাত, অতএব তুমি ঘুমাতে থাকা।’ অতঃপর যদি সে জেগে উঠে আল্লাহর যিক্র করে, তাহলে একটি গাঁট খুলে যায়। তারপর যদি ওযু করে, তবে তার আর একটি গাঁট খুলে যায়। তারপর যদি নামায পড়ে, তাহলে সমস্ত গাঁট খুলে যায়। আর তার প্রভাত হয় স্ফূর্তিভরা ভালো মনে। নচেৎ সে সকালে ওঠে কলুষিত মনে ও অলসতা নিয়ে।” (বুখারী ১১৪২, ৩২৬৯, মুসলিম ১৮৫৫নং আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

## হৃদয়-বিনাশী কর্মাবলী

যে সকল কর্মের কারণে হৃদয় কঠিন বা মৃত হয়, প্রায় সেই সকল কর্মের কারণেই হৃদয় ধ্বংস ও নাশপ্রাপ্ত হয়। তবুও হৃদয়স্থ করার লক্ষ্যে পুনর্বীর নতুন শিরোনামে সংক্ষেপে তা উল্লিখিত হল।

১। গায়রুন্নাহর প্রতি হৃদয়ের আকর্ষণ ও ভরসা

বান্দার হৃদয় যখনই সৃষ্টির সাথে আবদ্ধ করবে এবং তার কাছে এই

আশা ও ভরসা করবে যে, সে তাকে সাহায্য করবে, রুখী দান করবে, হিদায়াত করবে, তখনই সে হৃদয় তার প্রতি বিনয়ী হবে, তার দাসে পরিণত হবে। যদিও বাহ্যতঃ সে ঐ সৃষ্টির নেতা বা আমীর।

হৃদয়ের দাসত্ব ও বন্দিদশার উপরে ভিত্তি করেই প্রতিদান ও প্রতিফল নির্ধারণ হয়, দেহের দাসত্ব ও বন্দিদশার ভিত্তিতে নয়। যেমন যদি কোন মুসলিম কাফেরের হাদে বন্দী হয় অথবা কোন পাপাচারীর দাসে পরিণত হয়, তাহলে তার কোন ক্ষতি হয় না; যদি সে সাধ্যমতো নিজের আবশ্যিক কর্তব্য পালন করে।

পক্ষান্তরে যদি কারো হৃদয়ই গায়রুল্লাহর দাসে পরিণত হয় অথবা তার হাতে বন্দী হয়ে যায়, তাহলে সেই দাসত্ব ও বন্দিদশা তার জন্য ক্ষতিকর হয়, যদিও সে বাহ্যতঃ একজন জননেতা বা রাজা। সুতরাং আসল স্বাধীনতা হল মনের স্বাধীনতা এবং আসল দাসত্ব হল মনের দাসত্ব। যেমন ধনের ধনী প্রকৃত ধনী নয়, বরং মনের ধনীই প্রকৃত ধনী। (ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়াহ ১০/ ১৮৫- ১৮৭ দ্রঃ)

## ২। সব কিছুর অপরিমিত ব্যবহার

পানাহার, ঘুম, কথাবার্তা, বন্ধুত্ব, ওঠা-বসা, মেলামিশা, হাসি-তামাশা ইত্যাদি মাত্রাতিরিক্তভাবে হলেই হৃদয় নষ্ট হয়ে যায়।

ফুযাইল বিন ইয়ায বলেছেন, ‘দুটি আচরণ হৃদয়কে কঠোর ক’রে দেয় : বেশি কথা বলা ও বেশি খাওয়া।’ (নুযহাতুল ফুয়লা ৭৭৯পৃঃ)

আবু সুলাইমান দারানী বলেন, ‘প্রত্যেক জিনিসের মরিচা আছে, হৃদয়ের মরিচা হল ভরপেট আহার করা।’ (ঐ ৮৬৪পৃঃ)

## ৩। সকল প্রকার পাপাচার।

যে কোনও পাপাচারিতায় হৃদয় নাশপ্রাপ্ত হয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ} (سورة المطففين (১৪))

“না এটা সত্য নয়; বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের হৃদয়ে জং ধরিয়ে দিয়েছে।” (মুতাব্বিফিফীন : ১৪)

সুতরাং মহান আল্লাহ যা কিছু হারাম করেছেন, তা খাওয়া বা করাই হল হৃদয়-বিধ্বংসী কর্ম। যা দেখা, বলা, শোনা, খাওয়া, স্পর্শ করা বা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ, তাই মানুষের সুন্দর হৃদয়কে বিনষ্ট করে দিতে পারে।



## হৃদয়ের মৃত্যু

যেমন দেহের জীবন আছে, তেমনি হৃদয়ের জীবন আছে, উভয়ের মৃত্যুও আছে। অবশ্য দেহের মৃত্যু হলে তার পাপপুণ্য বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু হৃদয়ের মৃত্যু হলে পুণ্য বন্ধ হয়ে যায়, চালু থাকে পাপের স্রোতধারা।

কী কারণে হৃদয় মারা যায়?

ব্যধিগ্রস্ত হয়ে মারা যায়। ব্যধি আসার পর তার সুচিকিৎসা হয় না। অবহেলা ক’রে তাকে ফেলে রাখা হয়। ফলে এক সময় সে নিথর হয়ে যায়।

১। ওষুধ ব্যবহার না করা

রোগ ধরা পড়া সত্ত্বেও যদি কেউ চিকিৎসা না করায়, ওষুধ নেওয়ার পরেও যদি তা ব্যবহার না করা হয়, তাহলে মরণ আপনা-আপনি এসে উপস্থিত হয়। রোগা হৃদয়ের চিকিৎসা হল :

(ক) আল্লাহর যিক্র করা। তাঁর স্মরণে উদাসীন না হওয়া।

যে হৃদয় নিজ রবকে স্মরণ করে না, সে হৃদয়ের মৃত্যু আসবেই আসবে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(( مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ )) .

“যে আল্লাহর যিক্র করে আর যে যিক্র করে না, উভয়ের উদাহরণ মৃত ও জীবন্ত মানুষের মত।” (বুখারী ৬৪০৭নং)

কথা, কাজে ও জীবনের প্রতি পদক্ষেপে মহান প্রতিপালককে স্মরণ করা, কাজের শুরুতে তাঁর নাম নেওয়া, যেখানে যে দুআ পড়তে হয়, সে দুআ পড়া, তাঁর ও তাঁর রসুলের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা। ইলম ও যিক্রের মজলিসে অংশগ্রহণ করা---এ সব কিছু ফলে হৃদয় সজীব থাকে। এর অন্যথাচরণে হৃদয় মৃত্যুবরণ করে।

আর তার ফলে শয়তান সে হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করে। যেমন শাশানে ভূতের বাস বলে ধারণা করা হয়, তেমনি সে যিক্রশূন্য হৃদয়ে শয়তানের বাসা হয়।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ ثَقِيَضٌ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (৩৬) وَإِنَّهُمْ

لَيَصْذُقُونَهُمُ مِنَ السَّيْلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ} (৩৭) سورة الزخرف

“যে ব্যক্তি পরম দয়াময় আল্লাহর স্মরণে উদাসীন হয়, তিনি তার জন্য

এক শয়তানকে নিয়োজিত করেন, অতঃপর সে হয় তার সহচর। শয়তানেরাই মানুষকে সৎপথ হতে বিরত রাখে। আর মানুষ মনে করে, তারা সৎপথপ্রাপ্ত।” (যুখারুফঃ ৩৬-৩৭)

যিক্রহারা হয়ে হৃদয় মারা গেলে জীবনও সংকীর্ণময় হয়ে ওঠে। আর কিয়ামতে যা হবার তা তো হবেই। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى}

“যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ হবে, অবশ্যই তার হবে সংকীর্ণতাময় জীবন এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।” (ত্বা-হাঃ ১২৪)

(খ) অর্থ বুঝে কুরআন তিলাঅত করা, তার আদেশ-উপদেশ অনুযায়ী আমল করা।

কুরআন এসেছে হৃদরোগের ঔষধ স্বরূপ। সে ঔষধ ব্যবহার না করলে হৃদয় মারা যায়, এটাই স্বাভাবিক। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى

وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ } (সূরা য়ুনসঃ ৫৭)

“হে মানব জাতি! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের তরফ হতে উপদেশ ও অন্তরের রোগের নিরাময় এবং বিশ্বাসীদের জন্য পথপ্রদর্শক ও করুণা সমাগত হয়েছে।” (ইউনুসঃ ৫৭)

২। মহান আল্লাহর অবাধ্যাচরণ করা

মহান আল্লাহর অবাধ্যাচরণ করলে শাস্তি স্বরূপ হৃদয়ের বিনাশ আসে। পাপের পর পাপ করার ফলে হৃদয়ের জং বাড়তে থাকে। আর তার ফলে এক সময় হৃদয় অসাড় হয়ে যায়।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ حَظِيئَةً نُّكُتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْةٌ سَوَاءٌ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ صُقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبُهُ وَهُوَ الرَّأْنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ))، {كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ}.

অর্থাৎ, মু’মিন যখন কোন পাপ করে, তখন তার হৃদয়ে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। অতঃপর সে যদি তওবা করে, পাপ থেকে বিরত হয় এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে তার হৃদয় পরিষ্কার হয়ে যায়। আর যদি আরো বেশি পাপ করে, তাহলে সেই দাগ তার হৃদয়কে গ্রাস ক’রে নেয়। এই হল সেই জং, যার কথা আল্লাহ তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন, “না এটা সত্য

নয়; বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের হৃদয়ে জং ধরিয়ে দিয়েছে।”  
(মুত্‌আফিফীন : ১৪, আহমাদ ৭৮৯২, তিরমিযী ৩৩৩৪, সহীহ ইবনে মাজাহ ৩৪২২নং)

হৃদরোগের চিকিৎসক আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেছেন,  
رَأَيْتُ الذُّنُوبَ تُثَبِّتُ الْقُلُوبَ وَقَدْ يُورِثُ الذُّلَّ إِذْمَانُهَا  
وَتَرَكْتُ الذُّنُوبَ حَيَاةَ الْقُلُوبِ وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ عَصْيَانُهَا

অর্থাৎ, আমি দেখেছি, পাপরাজি হৃদয়কে বধ করে এবং  
অভ্যাসগতভাবে আচরিত পাপ লাঞ্ছনা আনে।

পাপ বর্জন করাতে হৃদয়ের জীবন আছে এবং মনের জন্য মঙ্গল আছে  
তার বিরুদ্ধাচরণ করাতে।

আমিও দেখেছি, আপনিও দেখেছেন, পাপিষ্ঠ দুষ্কৃতিরা কেমন হৃদয়হীন  
হয়। তাদেরকে দেখেই মনে হয়, তাদের হৃদয়ে যেন প্রাণ নেই। ভদ্র  
সমাজে তাদের কোন মান নেই। তাদের চেহারা যেন কোন জেল্লা নেই।  
তাদেরকে দেখলেই মনে ঘৃণা জাগে। কোন ব্যাপারে তারা সঙ্গ নিলে অন্তরে  
আতঙ্ক লাগে। সমাজে চোর, ডাকাত, গুন্ডা, বদমাশ, লম্পট, সন্ত্রাসী, বেশ্যা  
প্রভৃতিদেরকে দেখলেই তা বুঝা অতি সহজ।

### ৩। অধিকাধিক হাসা

এ ব্যাপারে মহানবী ﷺ বলেছেন,

((اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَعْنَى النَّاسِ وَأَحْسِنَ  
إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ  
فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُثَبِّتُ الْقَلْبَ))

“নিষিদ্ধ ও হারাম জিনিস থেকে বেঁচে থাক, তাহলে তুমি মানুষের মধ্যে সব  
চেয়ে বড় আবেদ (ইবাদতকারী) গণ্য হবে। আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন,  
তাতেই পরিতুষ্ট থাক, তবে তুমিই মানুষের মধ্যে সব চেয়ে বড় ধনী হবে।  
প্রতিবেশীর প্রতি অনুগ্রহ কর, তাহলে তুমি একজন (খাঁটি) মু’মিন বিবেচিত  
হবে। মানুষের জন্যও তা-ই পছন্দ কর, যা তুমি নিজের জন্য পছন্দ কর,  
তাহলে তুমি একজন (খাঁটি) মুসলিম গণ্য হবে। আর খুব বেশী হাসবে না,  
কারণ, অধিক হাসি অন্তরকে মেরে দেয়।” (আহমাদ ৮০৯৫, তিরমিযী  
২৩০৫নং, সহীহুল জামে ৪৫৮০, ৭৮৩৩নং)

((كُنْ وَرِعًا تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ ، وَكُنْ قَنِعًا تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ ، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا

تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا ، وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا ، وَأَقِلَّ الضَّحِكَ ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمَيِّتُ الْقَلْبَ)).

“তুমি নিজের মধ্যে আল্লাহভীরুতা নিয়ে এস, তাহলে তুমি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় আবেদ হয়ে যাবে। আর অল্পে পরিতুষ্ট হও, তাহলে তুমি মানুষের মধ্যে সব থেকে বেশী কৃতজ্ঞ হয়ে যাবে। মানুষের জন্যও তা-ই পছন্দ কর, যা তুমি নিজের জন্য পছন্দ কর, তাহলে তুমি একজন (খাঁটি) মু’মিন গণ্য হবে। তোমার প্রতিবেশীর প্রতি সদ্যবহার কর, তাহলে তুমি একজন (খাঁটি) মুসলিম বিবেচিত হবে। আর হাসি কম কর, কারণ, অধিক হাসি অন্তরকে মেরে ফেলো।” (বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ ২৫২, ইবনে মাজা ৪২১৭নং)

কিছু মানুষ আছে, যারা কথায় কথায় ‘হাঃ-হাঃ, ফ্যাক্-ফ্যাক্’ ক’রে হাসতে থাকে। স্থান-কাল-পাত্র কোন কিছুর খেয়াল করে না, করতে জানে না। অনেক সময় অকারণেও হাসে। না, তারা পাগল নয়। তবে হয়তো তার কাছাকাছি। অনেক সময় তারা কারো বিপদের খবর শুনেও হাসে। মনে আনন্দ থাকলে হাসি ওষ্ঠাধরে ঝিলিক মারে, তাতে দোষ নেই, দোষ হল অটুতাস্যে।

এক মজলিসে ছিলাম। সেখানে এক ম্যানেজার একজনকে জিজ্ঞাসা করল, ‘তুমি কোথায় কাজ কর?’ সে বলল, ‘মাগসালাতুল আমওয়াতো। (মৃতকে গোসল-কাফন দেয় সেই অফিসে)।’ সাথে সাথে ম্যানেজার ‘লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ বলে হো-হো ক’রে হেসে উঠল। তা দেখে তার ‘ইয়েস-ম্যান’ হাসকুটে অফিস-বয়ও হো-হো শব্দে কক্ষ মুখরিত ক’রে তুলল। আমরা তাদের কাণ্ড দেখে একে-অন্যের মুখ তাকাতাকি করতে লাগলাম।

হ্যাঁ, অধিক হাস্যে অন্তর মারা যায়, মান-সম্মানের অনুভূতি ভোঁতা হয়ে যায়। গান্ধিভর্য ও মাহাত্ম্য নষ্ট হয়ে যায়। আত্মমর্যাদাবোধ নষ্ট হয়। মানুষের কাছে ছোট হতে হয়।

উমার বিন খাত্তাব বলেন, ‘হে আহনাফ! যে বেশী হাসে তার প্রতি মানুষের সমীহ কমে যায়। যে বেশী মজাক-ঠাট্টা করে, লোকের কাছে তার ওজন কমে যায়। যে বেশী কথা বলে, তার বেশী পদস্খলন ঘটে। যার বেশী পদস্খলন ঘটে তার লজ্জা কমে যায়। যার লজ্জা কমে যায়, তার সংযম কমে যায়। আর যার সংযম কমে যায়, তার হৃদয় মারা যায়।’

অন্য দিকে হাসির ভিতর ফাঁসি। হেসেছে কি ফেঁসেছে। মিষ্টি হাসিতে

সৃষ্টিনাশ। হাসির ভূমিকায় যুবক-যুবতীর মাঝে সৃষ্টি হয় অবৈধ প্রেম, অসম প্রণয়, অসম্পর্কের ভালোবাসা। যা নিয়ে যায় অজানা অন্ধকার ও দুঃখময় পরিণতির দিকে।

কোন কোন হাসির পরে বিপদ আসে। এই জন্য বলা হয়, ‘যত হাসি তত কান্না, বলে গেছেন কবি মান্না।’

‘বুড়ায়-বুড়ায় কথা হয়, কথায় কথায় কাশি, যুবায়-যুবায় কথা হয় কথায় কথায় হাসি।’ এটা তো খারাপ নয়। খারাপ হল উচ্চ ও বিকট হাসি। অযথা ও অকারণে হাসি।

মুচকি হাসি ভালো। বিদ্রোহের হাসি, দুশমন-হাসি নিশ্চয়ই ভালো নয়।

এক যুবক কোন এক মজলিসে বসে অট্টহাসি হাসছিল। হাসান বাসরী সেদিকে পার হওয়ার সময় তা দেখে তাকে বললেন, ‘ওহে যুবক! পুলসিরাত কি পার হয়ে গেছে?’

সে বলল, ‘না।’

তিনি বললেন, ‘তাহলে তুমি কি জানো, তুমি জান্নাতে যাবে, না জাহান্নামে?’

সে বলল, ‘না।’

তিনি বললেন, ‘তাহলে এ হাসি কীসের?’

এর পর থেকে যুবককে আর হাসতে দেখা যায়নি।

হাসান বাসরী বলতেন, ‘যে জানে যে, তাকে মরতেই হবে, কিয়ামত অবশ্যই কায়েম হবে এবং মহান আল্লাহর সামনে তাকে দাঁড়াতেই হবে, তার দীর্ঘ দৃষ্টিভঙ্গা করাই সমীচীন।’ (হিল্যা/তুল আওলিয়া ২/১৩৩)

৪। ফিতনায় পতিত হওয়া

সন্দেহ ও কুপ্রবৃত্তির নানা ফিতনায় জড়িত হয়ে পড়লে অন্তর মারা যায়।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

« تَعْرِضُ الْفِتْنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُوْدًا عُوْدًا فَأَيُّ قَلْبٍ أَشْرَبَهَا نُكِبَتْ فِيهِ نُكْتَةُ سَوْدَاءٍ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِبَتْ فِيهِ نُكْتَةُ بَيَاضٍ حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ عَلَى أَبْيَضٍ مِثْلَ الصَّفَا فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْآخِرُ أَسْوَدُ مُرَبَّادًا كَالْكُوْزِ مُجْحِيًّا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أَشْرَبَ مِنْ هَوَاهُ » .

“মানুষের হৃদয়ে চাটাইয়ের পাতা (বা ছিলকার) মত একটির পর একটি করে ক্রমান্বয়ে ফিতনা প্রাদুর্ভূত হবে। সুতরাং যে হৃদয়ে সে ফিতনা সঞ্চারিত হবে সে হৃদয়ে একটি কালো দাগ পড়ে যাবে এবং যে হৃদয় তার



নিন্দা ও প্রতিবাদ করবে সে হৃদয়ে একটি সাদা দাগ অঙ্কিত হবে। পরিশেষে (সকল মানুষের) হৃদয়গুলি দুই শ্রেণীর হৃদয়ে পরিণত হবে। প্রথম শ্রেণীর হৃদয় হবে মসৃণ পাথরের ন্যায় সাদা; এমন হৃদয় আকাশ-পৃথিবী অবশিষ্ট থাকে অবধি-কাল পর্যন্ত কোন ফিতনা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর হৃদয় হবে উবুড় করা কলসীর মত ছাই রঙের; এমন হৃদয় তার সঞ্চারিত ধারণা ছাড়া কোন ভালোকে ভালো বলে জানবে না এবং মন্দকে মন্দ মনে করবে না (তার প্রতিবাদও করবে না)।” (মুসলিম ৩৮-৬৭৭)

যে মন অবৈধ নারী-প্রেমে জড়িয়ে যায়, পদ ও গদির ফিতনায় জড়িত হয়, সে মন মারা যায়, তার পুণ্য কাজের অনুভূতিটুকু, ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার আলোটুকু, অন্যায় দেখে প্রতিবাদ করার স্পৃহাটুকুও নষ্ট হয়ে যায়।

৫। আল্লাহর ভয় ও তাক্বওয়া তথা পরহেযগারি হারিয়ে বসা

যে হৃদয়ে আল্লাহর ভয় নেই, তাক্বওয়া নেই, হারাম-হালালের তমীয নেই, সন্দ্বিদ্ধ বস্তু থেকে সতর্কতা নেই, সে হৃদয় আসলে মৃত। কিন্তু যে হৃদয়ে এ সব আছে, সে হৃদয় জীবিত এবং সে হৃদয় হক-বাতিলের মাঝে পার্থক্যকারী জ্ঞান পায়, চলার পথে অন্ধকারে আলো পায় এবং করুণা ও ক্ষমা পায়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ } (سورة الأنفال (২৭))

“হে বিশ্বাসিগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে তিনি তোমাদেরকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্যকারী শক্তি দেবেন, তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ অতিশয় অনুগ্রহশীল।” (আনফাল ২৭)

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ

لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ } (سورة الحديد (২৮))

“হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর; তিনি তোমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ দ্বিগুণ দান করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে দেবেন আলো, যার সাহায্যে তোমরা চলাফেরা করবে এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (হাদীদ ২৮)

তারাই হয় সেই উদার বান্দা, যাদেরকে মহান আল্লাহ সুসংবাদ দিয়েছেন

এবং জ্ঞানী হওয়ার সার্টিফিকেট দিয়েছেন।

{الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ

أُولُوا الْأَلْبَابِ} (۱۸) سورة الزمر

“যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং যা উত্তম তার অনুসরণ করে। ওরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং ওরাই বুদ্ধিমান।” (যুমারঃ ১৮)

## আত্মবিচার, আত্মসমীক্ষা

এ সংসারে মানুষ সুখী হোক বা দুঃখী, নিজের দুনিয়া-চিন্তা নিয়েই ব্যস্ত থাকে। কখনো পাপ-পুণ্যের আলোচনা এলে পরের সমালোচনা নিয়েই মগ্ন থাকে। নিজের দোষ বিচার করার সুযোগ নেয় না। পরের বিচার করার আগে নিজের বিচার যে করা বেশি জরুরী সে কথা তার মাথায়ও আসে না।

সংসারে তার কালাতিপাত হতে থাকে। এক সময় কালের গাড়ি থেমে যায়। জীবনের সূর্য অস্তাচলে ঢলে পড়ে। তখন আর কী? সে ভাবে না যে, ভবের বাজারে এসে ফিরে গিয়ে হিসাব লাগবে। ভাটার টানে নৌকা বেয়ে অনায়াসে গিয়ে ফিরার পথে তাকে উঝিয়ে আসতে হবে। সে জানে না যে, ‘পুঁজি ভেঙ্গে খেতে ভাল, ভেটেন গাঙে যেতে ভাল। যত কষ্ট বুঝতে আর উজুতো।’

প্রত্যেক মানুষের উচিত, আত্মবিচার করা, নিজের হিসাব নেওয়া। ভেবে দেখা উচিত, সে যা করছে, তার ফলে সে কোন্ দলের হবে? কিয়ামতে ডান-ওয়ালা হবে, নাকি বাম-ওয়ালা? জান্নাতী হবে, নাকি জাহান্নামী। ভেবে দেখা উচিত, যে আমল সে করছে, তা সঠিক হচ্ছে কি না, কবুল হচ্ছে কি না, যথেষ্ট কি না?

### আত্মবিচারের গুরুত্ব

নিজের হিসাব নেওয়ার বড় গুরুত্ব রয়েছে ইসলামে। হিসাব দেওয়ার পূর্বে নিজে নিজে হিসাব মিলিয়ে দেখে নেওয়ার মাহাত্ম্য আছে।

১। আত্মবিচারের ফলে মানুষ দ্বীনের পথে অবিচল থাকার প্রয়াস পায় এবং আত্মশুদ্ধির সুযোগ লাভ করে। হিসাব গ্রহণ না করলে হৃদয় পবিত্রতা অর্জন করতে পারে না, হৃদয়ের বাঞ্ছনীয় উন্নয়ন সাধন হয় না।

২। আত্মবিচার এ কথার প্রমাণ যে, মানুষটি সৎশীল, সে তার প্রতিপালককে ভয় করে। যেহেতু আল্লাহকে যে ভয় করে না, সে নিজের

হিসাব গ্রহণে তৎপর হয় না।

৩। আত্মবিচার তাওবার দিকে পথপ্রদর্শন করে। যেহেতু মানুষ যখনই নিজের জীবনের উন্নতি-অবনতির হিসাব নেবে, তখনই তার নিকট মহান প্রতিপালকের ব্যাপারে অবহেলা ও ত্রুটি প্রকাশ পাবে। আর সে অবস্থায় সে অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করতে উদ্বুদ্ধ হবে।

৪। আত্মবিচার করলে মানুষ ইহ-পরকালে উপকৃত হবে।

৫। আত্মবিচার না করলে সে ইহ-পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

### আত্মবিচারের দলীল

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} (১৮) سورة الحشر

“হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক যে, আগামীকালের (কিয়ামতের) জন্য সে কি অগ্রিম পাঠিয়েছে। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।” (হাশরঃ ১৮)

তিনি আত্মশুদ্ধির প্রতি উদ্বুদ্ধ ক’রে বলেছেন,

{قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا (৭) وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا} (১০) سورة الشمس

“সে সফলকাম হবে, যে আত্মকে পরিশুদ্ধ করবে এবং সে ব্যর্থ হবে, যে তাকে কলুষিত করবে।” (শামসঃ ৯-১০)

সাহাবাগণ আত্মবিচারে উৎসাহিত ছিলেন। হানযালাহ বিন রাবী’ উসাইয়িদী রাঃ বলেন, একদা আবু বাকর রাঃ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক’রে বললেন, ‘হে হানযালাহ! তুমি কেমন আছ?’ আমি বললাম, ‘হানযালাহ মুনাফিক হয়ে গেছে!’ তিনি (আশ্চর্য হয়ে) বললেন, ‘সুবহানাল্লাহ! এ কী কথা বলছ?’ আমি বললাম, ‘(কথা এই যে, যখন) আমরা রাসূলুল্লাহ সঃ-এর নিকটে থাকি, তিনি আমাদের সামনে এমন ভঙ্গিমায়ে জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা করেন, যেন আমরা তা স্বচক্ষে দেখছি। অতঃপর যখন আমরা রাসূলুল্লাহ সঃ-এর নিকট থেকে বের হয়ে আসি, তখন স্ত্রী সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য (পার্শ্ব) কারবারে ব্যস্ত হয়ে অনেক কিছু ভুলে যাই।’ আবু বাকর রাঃ বললেন, ‘আল্লাহর কসম! আমাদেরও তো এই অবস্থা হয়।’ সুতরাং আমি ও আবু বাকর গিয়ে রাসূলুল্লাহ সঃ-এর খিদমতে হাজির হলাম। অতঃপর আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল!

হানযালাহ মুনাফিক হয়ে গেছে।’ রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “সে কী কথা?” আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমরা যখন আপনার নিকটে থাকি, তখন আপনি আমাদেরকে জান্নাত-জাহান্নামের কথা এমনভাবে শুনান; যেমন নাকি আমরা তা প্রত্যক্ষভাবে দেখছি। অতঃপর আমরা যখন আপনার নিকট থেকে বের হয়ে যাই এবং স্ত্রী সন্তান-সন্ততিও কারবারে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, তখন অনেক কথা ভুলে যাই। (এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

(( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ تَدْرُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي ، وَفِي الذُّكْرِ ، لَصَافَحْتُمْ الْمَلَائِكَةَ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ ، لَكِنْ يَا حَنْظَلَةَ سَاعَةً وَسَاعَةً )) .

“সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ আছে! যদি তোমরা সর্বদা এই অবস্থায় থাকতে, যে অবস্থাতে তোমরা আমার নিকটে থাক এবং সর্বদা আল্লাহর স্মরণে মগ্ন থাকতে, তাহলে ফিরিশ্তাগণ তোমাদের বিছানায় ও তোমাদের পথে তোমাদের সঙ্গে মুসাফাহা করতেন। কিন্তু ওহে হানযালাহ! (সর্বদা মানুষের এক অবস্থা থাকে না।) কিছু সময় (ইবাদতের জন্য) ও কিছু সময় (সাংসারিক কাজের জন্য)।” তিনি এ কথা তিনবার বললেন। (মুসলিম ৭১৪২-৭১৪৩নং)

লক্ষণীয় যে, হানযালাহ নিজের হিসাব নিয়েই উক্ত আচরণ করেছিলেন।

প্রকাশ থাকে যে, উক্ত হানযালাহ তিনি নন, যাকে শহীদ হওয়ার পর ফিরিশ্তা গোসল দিয়েছিলেন। সেটা ছিল উহুদের দিন। আর তাঁর নাম ছিল হানযালাহ বিন আবী আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)।

উমার বিন খাত্তাব রাঃ বলেছেন, “(মরণের পর) তোমাদের হিসাব নেওয়ার পূর্বে তোমরা নিজেদের হিসাব নাও। তোমাদের আমল ওজন করার পূর্বে তোমরা নিজেরা ওজন ক’রে দেখে নাও। কারণ যে ব্যক্তি দুনিয়ায় নিজের হিসাব নিজে নেবে, তার জন্য কিয়ামতের হিসাব হাল্কা হয়ে যাবে। যেদিন তোমাদেরকে পেশ করা হবে এবং তোমাদের কিছুই গোপন থাকবে না, সেদিনকার জন্য তোমরা সুসজ্জিত হও।” (তিরমিযী ২৪৫৯, ইবনে আবী শাইবা ৩৪৪৫৯নং)

মাইমুন বিন মিহরান বলেছেন, ‘বান্দা পরহেযগার হতে পারে না, যতক্ষণ না সে নিজের হিসাব গ্রহণ করেছে; যেমন সে তার শরীকের হিসাবের গ্রহণ ক’রে থাকে, তার খাদ্য কোথা হতে আসছে, তার পোশাক কোথা হতে পাচ্ছে?’ (তিরমিযী ২৪৫৯নং)

আমরা আত্মসমীক্ষায় বৈমুখ কেন?

আমরা আত্মসমীক্ষায় আগ্রহী নই কেন? কেন আমরা তাতে অবহেলা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করি? তার বিভিন্ন কারণ আছে :-

### ১। পাপাচারিতা

আমরা মহাপাপে লিপ্ত থাকি অথবা লঘুপাপ অব্যাহতভাবে করেই যাই। আর পাপ করতে থাকার ফলে হৃদয়ে জং বা কালো দাগ পড়ে যায়। অতঃপর হিসাব নিয়ে তাওবা না করলে সেই জং ও দাগ প্রগাঢ় হতে থাকে। আর যখন সে জং বা দাগ পুরু হয়ে ওঠে, তখন আর হিসাব নেওয়ার প্রেরণা সৃষ্টি হয় না এবং সে হৃদয় তখন ভালোকে ভালো ও মন্দকে মন্দ রূপে পার্থক্য করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

### ২। বিলাসিতা

আমরা দুনিয়ার সুখসম্ভোগ ও বিলাসিতায় মত্ত থাকি। ফলে পরকালের চিন্তা কম ক'রে দিই। আর পরকালের চিন্তা না থাকলে অথবা তার প্রতি ভাবনা কমে গেলে আত্মবিচার করার প্রয়াস লাভ হয় না।

৩। আমরা আমাদের মনে মহান আল্লাহর তা'যীম অনুভব করি না

সেই মহান প্রতিপালকের জন্য কত পরিমাণের দাসত্ব, আনুগত্য, বিনয়, মুখাপেক্ষিতা ইত্যাদি আবশ্যিক, আমরা তা অনুমান করি না। তা করলে আমরা আল্লাহর অধিকার জানতাম এবং আত্মসমীক্ষা করতাম। তাঁর দেওয়া নিয়ামত ও আমাদের অবাধ্যাচরণের মাঝে তুলনা করতাম। বুঝতে পারতাম আমরা আগামী কালের জন্য কী প্রস্তুতি নিচ্ছি এবং তা সঠিক ও যথেষ্ট কি না।

### ৪। আত্মমুগ্ধতা

আমরা আত্মমুগ্ধ যে, আমরা ঈমানদার ও ভালো লোক। নিজের প্রতি এই সুধারণা আমাদেরকে নিজেদের দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে অবগত হতে বিরত রাখে।

### ৫। পরকাল সম্বন্ধে উদাসীনতা

যখন আমরা দুনিয়া ও বিষয়-বিভব নিয়ে মশগুল হয়ে পড়ি, তখন হিসাব সম্বন্ধে উদাসীন হওয়াই স্বাভাবিক। পরকালে কী হবে---এই চিন্তা থাকলে আমরা হিসাবটা অবশ্যই ঠিক রাখতে পারতাম।

আত্মবিচার না থাকার প্রভাব

মানুষ যদি আত্মবিচার মোটেই না করে, অথবা আংশিকভাবে বর্জন করে, তাহলে তার জীবনে নানা প্রভাব-প্রতিক্রিয়া পরিদৃষ্ট হয়। তার মধ্যে কতিপয় নিম্নরূপ :-

১। নিজের হিসাব নেওয়ার আগ্রহ না থাকলে মানুষ অতি সহজে পাপাচরণে লিপ্ত হবে। যেহেতু হিসাব নিলে পাপ ক'রে সে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হবে, ফলে পুনর্বীর পাপের দিকে পা বাড়াতেও কুণ্ঠিত হবে। পক্ষান্তরে আত্মবিচার ও তাওবা না থাকলে পাপের ধারাবাহিকতা বন্ধ হবে না।

২। হিসাব না থাকলে পাপ বর্জন করাও দুরূহ কাজ হবে। যেহেতু সে তখন পাপে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে এবং পাপাচরণই তার স্বাভাবিক আচরণে পরিণত হবে। সুতরাং তা বর্জন করার কথা তার মনে উদয়ই হবে না।

৩। আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদত তাকে ভারী লাগবে। যেহেতু তাতে সদৃষ্টি, যত্ন ও কষ্ট-স্বীকারের প্রয়োজন হয়। আর হিসাব গ্রহণে আগ্রহী সজাগ মন ছাড়া সে সব অন্য কারো মনে স্থান পায় না।

আত্মসমীক্ষার সহায়ক কর্মাবলী

আপনি যদি সঠিকভাবে আত্মসমীক্ষা করতে উদ্যোগী হতে চান, তাহলে নিম্নে উল্লিখিত কর্মাবলীর সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারেন।

১। এ কথা জানা যে, আপনি দুনিয়াতে নিজের হিসাব নিজে গ্রহণ ক'রে থাকলে আখেরাতে আল্লাহর নিকট হিসাব দেওয়া আপনার জন্য সহজ হবে। পক্ষান্তরে আজ আত্মসমীক্ষায় অবহেলা করলে কাল হিসাব দেওয়া কঠিন হবে।

২। এ কথা জানা যে, নিজের হিসাব নিজে নিয়ে রাখলে ফল স্বরূপ জ্ঞান হতে আপনার বাসস্থান। মহান আল্লাহর দীদারলাভ হবে আপনার পুরস্কার। অন্যথা ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর সেখানে দীদার লাভের সৌভাগ্য নেই।

৩। সলফে সালেহীনের ইতিহাস পড়া। যাঁরা আত্মসমীক্ষা ক'রে পরকালের মহাপুরস্কারের অধিকারী হয়েছেন।

৪। উচ্চ মনের আত্মবিচারকারী মানুষের সাহচর্য গ্রহণ করা। তাতে আপনি তার অনুসরণ ক'রে সে কাজে অনুপ্রাণিত হতে পারেন।

৫। মনের প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা। মন বড় মন্দপ্রবণ। শরীয়তে যা নিষিদ্ধ, মনের কাছে তা লোভনীয়। সুতরাং সে বিষয়ে সতর্ক থেকে তার

লাগাম ধরতে ও হিসাব নিতে হবে।

৬। নিজের প্রতি সুধারণা না রাখা। কারণ নিজের প্রতি সুধারণা রাখলে নিজের দোষ ধরা পড়বে না। বরং অনেক সময় এমন হতে পারে যে, নিজের কোন কোন মন্দ গুণগুলিকে সদগুণ ধারণা করে তার লালন করতে থাকবে। কারণ,

وَعَيْنُ الرَّضَا عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَلِيلَةٌ ... وَلَكِنْ عَيْنُ السُّخْطِ تُبْذِرُ الْمَسَاوِي

অর্থাৎ, সন্তোষের দৃষ্টি প্রত্যেক ত্রুটি অনুভব করতে দুর্বলতার শিকার হয়, কিন্তু অসন্তোষের দৃষ্টি প্রকাশ করে বহু ত্রুটি।

বলা বাহুল্য, যে ব্যক্তি সত্যিকারে নিজের মনকে চিনবে, সে তার প্রতি সুধারণা রাখবে। আর যে ব্যক্তি নিজের মনের প্রতি সুধারণা রাখবে, সে আসলে তার ব্যাপারে সবচেয়ে বড় অজ্ঞ।

৭। আপনি মহান আল্লাহর যে নিয়ামতে প্রতিপালিত হচ্ছেন এবং তার বিনিময়ে আপনি যে কৃতজ্ঞতা ও ইবাদত আদায় করছেন, এই উভয়ের মাঝে তুলনা করে দেখবেন। মাথার চুল থেকে নিয়ে পায়ের নখ পর্যন্ত, আত্মীয়-স্বজন, খাদ্য-পানীয়, মাটি, আগুন, আলো, বাতাস, পানি, অক্সিজেন ইত্যাদি অগণিত নিয়ামত আপনি ব্যবহার করছেন এবং তার বিনিময়ে আপনি তাঁর কী করছেন? যখন জানতে পারবেন যে, তাঁর ক্ষমা ও দয়া ছাড়া আপনি ধ্বংস হয়ে যাবেন, তখন অবশ্যই নিজের হিসাব নিতে উৎসাহিত হবেন।

৮। আপনি আপনার পাপ ও পুণ্যের মাঝে তুলনা করে দেখবেন, কোনটা বেশি? যে পাপ করেছেন, ইহ-পরকালে তার শাস্তি কী? আল্লাহ আপনার সে অপরাধ হয়তো এখন গোপন রেখেছেন, ফলে সে শাস্তি আপনাকে তিনি বা দুনিয়ার কেউ এখন দিচ্ছেন না, কিন্তু অনিবার্য দিন আসার আগে নিজের বিচার যদি নিজেই না করেন, তাহলে ‘হিসাবের দিন হিসাব’---এ কথা অবশ্যই বিশ্বাস করুন।

### আত্মসমীক্ষার সুফল

মানুষ আত্মসমীক্ষা করলে নানা সুফল লাভ করতে পারে। কতিপয় নিম্নরূপ :-

১। ইহ-পরকালের সুখলাভ এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন হয়। যেহেতু মনের হিসাব নিলেই তার দোষ-ত্রুটি অবশ্যই ধরা পড়বে। সে যে যথার্থ আনুগত্য করতে সক্ষম হচ্ছে না, সে কথা অনুধাবন করতে পারবে। তখন সে অধিক আমল করতে এবং পাপাচরণ বর্জন করতে উদ্বুদ্ধ হবে।

মহান প্রতিপালকের প্রতি অধিক কৃতজ্ঞ হবে। নিজেকে সংশোধন ক’রে আসল হিসাবের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। আর এতে ইন শাআল্লাহ সে প্রতিপালকের সম্বৃষ্টি ও তাঁর পুরস্কার লাভে ধন্য হবে।

২। নিজের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ পাবে। নিজ কর্মের হিসাব নিলে অবশ্যই দেখা যাবে কোন না কোন খামতি রয়েছেই। তখন মানুষ সতর্ক হবে এবং তার সংশোধনে প্রয়াসী হবে। সেই সাথে অপরের দোষ-কীর্তন হতে নিজেকে দূরে রাখতে পারবে। নচেৎ নিজের দোষকে ক্ষুদ্রজ্ঞান ক’রে পরের দোষকে বিশালজ্ঞান করবে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((يَبْصُرُ أَحَدُكُمْ الْقَذَى فِي عَيْنِ أَخِيهِ وَيَنْسَى الْجُدْعَ فِي عَيْنِهِ))

“তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের চোখে কুটা দেখতে পায়, কিন্তু নিজের চোখে গাছের গুঁড়ি দেখতে ভুলে যায়!” (ইবনে হিব্বান ৫৭৬১, সহীহুল জামে ৮০১৩নং)

৩। মহান আল্লাহর জন্য বিশুদ্ধচিত্ত হবে। কারণ, মনের হিসাব গুপ্ত জিনিস। বান্দার মনের সাথে গোপন বোঝাপড়া। মহান আল্লাহ ছাড়া সে খবর কেউ জানে না। কেবল মনে জানে পাপ এবং মায়ে জানে বাপ। মন জানে কোন কাজ খাঁটি আল্লাহর জন্য হয় এবং কোন কাজে শিকের ভেজাল অনুপ্রবেশ করে। সঠিকভাবে হিসাব নিলে বান্দা সব কাজে আন্তরিক হতে সচেষ্ট হবে। আর তাতেই সে নিজ মনকে আল্লাহর জন্য বিশুদ্ধ করতে সক্ষম হবে।

৪। জীবনের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হবে। যখনই মানুষ নিজের হিসাব গ্রহণ করবে, তখনই সে বুঝতে পারবে যে, তাকে খামোখা সৃষ্টি করা হয়নি। সে এ দুনিয়াতে আসেনি, তাকে পাঠানো হয়েছে। তাকে নিরর্থক ছেড়ে দেওয়া হবে না। তাকে দুনিয়াতে কেবল পানাহার, যৌনাচার ও সম্পদ সংগ্রহ এবং তাতে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য পাঠানো হয়নি। নিজের হিসাব নিলেই মন বুঝতে পারবে এ জীবনের লক্ষ্য কী? কোন্ সাধনায় তাকে সিদ্ধিলাভ করতে হবে?

৫। ইবাদতে যত্নবান হবে। অধিক ও সঠিক আমলে মনোনিবেশ করবে। যেহেতু প্রত্যেক রোযাদার নিজের হিসাব গ্রহণ করে বলেই এত কষ্ট ক’রে নিরম্ব উপবাস ক’রে রোযা রাখে। তাহাজ্জুদগুয়ার ঘুম ছেড়ে এত কষ্ট ক’রে নামায়ে দাঁড়ায়, কুরআন তেলাঅত করে, কষ্টার্জিত ধন আল্লাহর রাস্তায় দান করে। হিসাবে লাভ-নোকসান খতিয়ে না দেখে এ সব কেউ করে না।

৬। ছোট-বড় সকল গোনাহ থেকে দূরে থাকার তওফীক লাভ হবে।



যেহেতু হিসাবে তার অপকারিতা ধরা পড়বে এবং নিজের জন্য যা অপকারী, তা হতে দূরে থাকতে প্রয়াসী হবে।

৭। দুনিয়ার মায়া ও আসক্তি দূর হয়ে যাবে। যেহেতু হিসাব গ্রহণে বান্দা বুঝতে পারবে যে, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। তার জীবনের চলার পথে একটি মুসাফিরখানা মাত্র। দুনিয়া হল আখেরাতের ক্ষেত স্বরূপ। এখানে ফসল বপন করতে হবে, কাটা হবে আখেরাতে। আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার কোনই মূল্য নেই। আর তখনই বান্দা দুনিয়াদারির প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি বর্জন করবে এবং দুনিয়ার ওপর আখেরাতকে প্রাধান্য দেবে।

৮। মহান আল্লাহর প্রতি ধ্যান বৃদ্ধি পাবে। এতে আছে ইসলাম ও ঈমানের পর বান্দার তৃতীয় ধাপ ‘ইহসান’। “এমনভাবে ইবাদত করবে, যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ, তা মনে করতে না পারলে এটা অবশ্যই মনে রাখবে যে, আল্লাহ তোমাকে দেখছেন।” হিসাব গ্রহণের ফলে বান্দা দ্বীনের এই পর্যায়ে পৌছতে সক্ষম হবে। আর এ হল আল্লাহর অলীর মর্যাদা।

### আত্মসমীক্ষার শ্রেণী-বিভেদ

সাধারণভাবে আত্মসমীক্ষাকে ২ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে : অনির্দিষ্ট ও নির্দিষ্ট।

অনির্দিষ্টভাবে যে কোন সময় নিজের হিসাব গ্রহণ করা যায়।

অথবা নির্দিষ্টভাবে বিশেষ বিশেষ অবস্থা ও সময়ে কাজের হিসাব নেওয়া যায়। এটিকে আবার ৪ শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

### প্রথম শ্রেণী : কোন কাজ করার পূর্বে হিসাব

কোন কাজ করার পূর্বে মনের সাথে একবার হিসাব ক’রে নেওয়া যে, এ কাজ করা উচিত কি না? সে এ কাজ করতে পারবে কি না? এটা করা ভালো, না ছাড়া ভালো? এ কাজের পশ্চাতে তার উদ্দেশ্য কী? লোকপ্রদর্শন, নাকি আল্লাহর সন্তুষ্টি? দুনিয়া, নাকি দ্বীন?

হাসান বাসরী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, ‘আল্লাহ সেই বান্দার প্রতি রহম করেন, যে কোন কাজের সংকল্প করার পূর্বে চিন্তা-ভাবনা করে। অতঃপর তা আল্লাহর জন্য হলে সম্পাদন করে, নচেৎ বিরত থাকে।’

### দ্বিতীয় শ্রেণী : কাজ করার পর হিসাব

এই শ্রেণীর হিসাব ৪ ভাগে বিভক্ত :

১। মহান আল্লাহর কোন অধিকার আদায় ও আনুগত্য করার পর কোন ত্রুটি হয়েছে কি না, তার হিসাব নেওয়া। নিজেকে প্রশ্ন করা, ‘সে কি সে

কাজ পরিপূর্ণ ইখলাসের সাথে এবং মুহাম্মাদী তরীকা অনুযায়ী সম্পাদন করতে পেরেছে?’ অতঃপর ঐটি পরিলক্ষিত হলে অতিরিক্ত নফল আদায়ের মাধ্যমে তা পূরণ করা।

২। কোন পাপ কাজ ক’রে ফেললে মনকে প্রশ্ন করা, ‘কেন সে তা করল? কোন জিনিস তাকে তা করতে উদ্বুদ্ধ করল?’ অতঃপর সেই কারণ বা জিনিস থেকে দূরে থাকা, তার জন্য অনুতপ্ত হয়ে বিশুদ্ধ তওবা করা, অল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা, কোন সৎকর্ম করা, যা ঐ পাপকে মিটিয়ে দিতে পারে। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ

ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ} (সূরা হুদ ১১৪)

“নামায কয়েম কর দিবসের দু’প্রান্তে ও রাত্রির কিছু অংশে; নিঃসন্দেহে পুণ্যরাশি পাপরাশিকে মুছে ফেলে; এটা হচ্ছে উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য একটি উপদেশ।” (হুদঃ ১১৪)

আর মহানবী ﷺ বলেছেন,

(( اَتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا ، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ

حَسَنٍ )).

“তুমি যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং পাপের পরে পুণ্য কর, যা পাপকে মুছে ফেলবে। আর মানুষের সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর।” (তিরমিযী ১৯৮৭নং)

৩। কোন অনুচিত কাজ ক’রে ফেললে মনকে প্রশ্ন করা, ‘এটা কেন করলাম? এটা বর্জন করার মাঝে কি কল্যাণ ছিল না? এটা ক’রে লাভ কী হল?’ ইত্যাদি।

৪। কোন বৈধ কাজ করলেও হিসাব নিয়ে নিজেকে প্রশ্ন করা, ‘কেন আমি এটা করলাম? এতে কি ইহ-পরকালের মঙ্গল ছিল? নাকি অভ্যাসগতভাবে অথবা অপরের অন্ধানুকরণ ক’রে করলাম? আর তা হলে তো তাতে কেবল সময় বরবাদ গেল।’

তৃতীয় শ্রেণী : দিন, সপ্তাহ, মাস বা বৎসরান্তে একবার আত্মসমীক্ষা

একবার মনের সাথে কথা বলুন, সপ্তাহ ব্যাপী আপনি কী করলেন? মাস ব্যাপী আমল নামায কী লিখলেন? সারা বছর ধরে আপনি আপনার প্রতিপালকের জন্য, আপনার দ্বীনের জন্য, মানুষের উপকারের জন্য কী

করলেন? কী হল না, কেন হল না? আপনার হিসাবে আপনি কি লাভবান, না ক্ষতিগ্রস্ত? ইত্যাদি।

দিন পার হয়ে রাত্রি এলে শয্যায় আশ্রয় নিয়ে লোকে কত কী ভাবে, কত কথা বলে শয্যাসঙ্গিনীর সাথে অথবা নিজের মনের সাথে। কিন্তু কত কথার মাঝে আপনার কিছু কথা এমন কি থাকে, যার মাধ্যমে আজ সারা দিনে কী করলেন, তার কোন হিসাব থাকে?

চতুর্থ শ্রেণী : মর্যাদাপূর্ণ সময় ও জায়গায় আত্মসমীক্ষা

মর্যাদাপূর্ণ কল্যাণময় মৌসম যেমন রমযান, যুলহজ্জের দশ দিন, মর্যাদাপূর্ণ দিন যেমন জুমআর দিন এবং মর্যাদাপূর্ণ সময় যেমন রাত্রে শেষ তৃতীয়াংশ, এই সকল সময়ে নিজের হিসাব নিন এবং সময়গুলিকে আপনি আপনার লাভের জন্য ব্যবহার করুন। ভেবে দেখুন, উক্ত সময়গুলি কি আপনার নিকট কোন মর্যাদা ও গুরুত্ব পেয়েছে, নাকি অন্যান্য সময়ের মতোই তা অতিবাহিত হয়ে গেছে? উক্ত সময়গুলিতে আপনি কি এমন কিছু করতে পেরেছেন, যা দেখে কাল কিয়ামতে আপনার চক্ষু শীতল হবে?

অনুরূপ মক্কা-মদীনার মতো পবিত্র ও মহাত্ম্যপূর্ণ জায়গায় গিয়ে আপনি কি যথার্থই উপকৃত হতে পেরেছেন? নাকি ভ্রমণ করাই সার হয়েছে? অর্থ ও সময় ব্যয়ের মাধ্যমে লাভ কিছু হয়েছে, নাকি শুধু দেশ দেখার সাধই মিটেছে?

আত্মসমীক্ষায় অতিরঞ্জন

অনেক আবেগময় মানুষ আছে, যারা আত্মসমীক্ষা করে, অতঃপর তাতে নিজের কোন ত্রুটি পেলে তার প্রায়শ্চিত্তে নিজেকে এমন শাস্তি দেয়, যাতে সে অনেকটা বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলে। আসলে তা কিন্তু বাঞ্ছনীয় নয়।

এখানে তার কিছু নমুনা উল্লেখ করা অপ্ৰাসঙ্গিক নয়। যাতে ব্যাপারটা ধারণায় আনা সহজ হবে।

এক আবেদ কোন চক্রান্তে পড়ে অবৈধ মহিলার গায়ে হাত দিয়েছিল, তার প্রায়শ্চিত্তে সে তার হাতকে আগুনে দিয়ে শাস্তি নিয়েছিল।

এক ব্যক্তি নাপাক হওয়ার পর শীতের কারণে গোসল না ক'রে ফজরের নামায নষ্ট করেছিল। তার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সে অত্যন্ত ঠান্ডা পানিতে গোসল ক'রে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল।

এক আবেদ এক অবৈধ নারীর প্রতি কাম নজরে তাকিয়েছিল, তাই সে তার চোখই নষ্ট ক'রে ফেলেছিল!

এক ব্যক্তি এক পাপের জন্য ঠান্ডা পানিই পান করত না।

এক ব্যক্তি কোন এক অপরাধের জন্য এক বছর রোযা পালন করেছিল।

এক ধনী ব্যক্তির ছেলে বাপের কাছে গাড়ি আদ্যার করেছিল। কোন কারণে তাকে তা না দিলে সে আত্মহত্যা করল। অতঃপর বাপ নতুন গাড়ি কিনে তার ছেলের কবরের উপর স্থাপন করল।

মনের বিচার করুন, কিন্তু ন্যায্যপরায়ণ বিচারক হন এবং স্মরণে রাখুন, কোন বিচারেই ‘লঘু পাপে গুরু দণ্ড’ আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়।

(আত্মসমীক্ষা বিষয়ে বিস্তারিত জানতে ডঃ আব্দুর রহমান আয়েদ প্রণীত পুস্তিকা ‘মুহাসাবাতুন নাফস’ দ্রষ্টব্য)

## আত্মসমালোচনা

মন অনেক সময় নিজের ইচ্ছামতো চলতে চায়, নিজের দোষ অনেক সময় গোপন করা হয়, অনেক সময় অপরাধ করা হয় গোপনে, যা কোন মানুষ জানতে পারে না, এমন দোষ-ত্রুটি নিয়ে বিবেচনা করা দরকার। নিজের দোষ নিজে ধরা দরকার, নিজের মনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা দরকার।

হ্যাঁ, মন মানুষের শত্রু, মনের রিপুগুলি সদা সজাগ, তাই তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ প্রয়োজন হয়। কিন্তু তা সহজ নয়, কারণ এরা যে ঘরশত্রু। পরশত্রুকে পার আছে, কিন্তু ঘরশত্রুকে পার নেই। পরশত্রু বাইরে থেকে আঘাত হানে, আর ঘরশত্রু ভিতর থেকে আঘাত হানে, তাই বিজয়লাভও সুকঠিন। তার জন্যই তো অবাধ্য মনের বিরুদ্ধে জিহাদ সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((أَفْضَلُ الْجِهَادِ أَنْ يُجَاهِدَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ وَهَوَاهُ)).

“স্বীয় আত্মা ও কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ হল মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ।” (ইবনে নাজ্জার, সঃ জামে’ ১০১৯নং)

((أَفْضَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِسْلَامًا مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَأَفْضَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَأَفْضَلُ الْمُهَاجِرِينَ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَأَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي ذَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)).

“ইসলামের দিক হতে শ্রেষ্ঠ মু’মিন সেই ব্যক্তি, যার জিহ্বা ও হস্ত হতে মুসলিমরা নিরাপদে থাকে। ঈমানের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ মু’মিন সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র সবার চেয়ে সুন্দর। শ্রেষ্ঠ মুহাজির (হিজরতকারী বা আল্লাহর জন্য স্বদেশত্যাগী) সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তুসমূহকে ত্যাগ করে। আর শ্রেষ্ঠ জিহাদ সেই ব্যক্তির, যে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টিতে নিজের মনের

বিরুদ্ধে জিহাদ করে।” (তাবারানী, সঃ জামে’ ১১২৯নং)

((أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالْمُؤْمِنِ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبَ)).

“আমি কি তোমাদেরকে ‘মুমিন’ কে---তা বলে দেব না? (প্রকৃত মুমিন হল সেই), যার (অত্যাচার) থেকে লোকেরা নিজেদের জান-মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করতে পারে। (প্রকৃত) মুসলিম হল সেই ব্যক্তি, যার জিব ও হাত হতে লোকেরা শান্তি লাভ করতে পারে। (প্রকৃত) মুজাহিদ হল সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর আনুগত্য করতে নিজের মনের বিরুদ্ধে জিহাদ করে। আর (প্রকৃত) মুহাজির (হিজরতকারী) হল সেই ব্যক্তি, যে সমস্ত পাপাচরণকে হিজরত (বর্জন) করে।” (আহমাদ ৬/২১, হাকেম ২৪, তাবারানী ১৫১৯১, বাইহাক্কীর শুআবুল ঈমান, সিলসিলাহ সহীহাহ ৫৪৯নং)

আলী রাঃ বলেছেন, ‘তোমাদের (যুদ্ধের) প্রথম ময়দান হল তোমাদের মন। তার বিরুদ্ধে যদি জয়লাভ করতে সক্ষম হও, তাহলে অন্যের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে অধিক সক্ষম হবে। আর যদি তার বিরুদ্ধে অক্ষম থেকে যাও, তাহলে অন্যের বিরুদ্ধে বেশি অক্ষম হবে। সুতরাং তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জেতার অভিজ্ঞতা প্রথমে লাভ কর।’

বলা বাহুল্য, যে মানুষ নিজ মনের বিরুদ্ধে লড়াই করে, সেই হল উল্লেখযোগ্য মানুষ। যেহেতু সেই হয় পাপমুক্ত।

চোখ সব কিছু দেখতে সাহায্য করে, কিন্তু নিজেকে দেখতে পায় না। তার জন্য মনের প্রয়োজন হয়। আর মন নিয়ে আত্মসমালোচনায় প্রবৃত্ত হলে মানুষ মহৎ হতে পারে। আর সে মানুষ অন্য কারো উপদেশের মুখাপেক্ষী থাকে না।

কিন্তু সবথেকে কঠিন জিনিস হল নিজেকে চেনা। আর সবথেকে সহজ জিনিস হল অপরকে উপদেশ দেওয়া। তাই অপরকে উপদেশ দেওয়ার পূর্বে যে নিজেকে উপদেশ দেয়, অপরের দোষ ধরার পূর্বে নিজের দোষ নিয়ে বিবেচনা করে, সে সত্যিই সফল মানুষ।

মানুষ চেনা বড় কঠিন কাজ। তাই যে মানুষ চেনে, সে বড় বুদ্ধিমান। কিন্তু যে নিজেকে চেনে, সে সবার থেকে বড় বুদ্ধিমান। যে ব্যক্তি নিজের সমালোচনা করতে পারে, সেই সর্বাপেক্ষা বেশী বুদ্ধিমান।

বাস্তবে মানুষ সবচেয়ে বেশি ঝগড়া করে নিজের সাথে। অনেক অন্যায় কাজ ক’রে চুপ থাকলেও বিবেকে কামড় দেয়। পরবর্তীতে নিজেকে

ভৎসনা করে, কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয় এবং প্রায়শ্চিত্ত করতে উদ্বুদ্ধ হয়। নিশ্চয় সে বিবেকবান ও জ্ঞানী মানুষ। জ্ঞানী মানুষ নিজের মনকেই অধিক শাসিয়ে থাকে।

শত্রুদমন বড় কঠিন কাজ। দুশমন-হাসিও সহ্য করা সুকঠিন। কিন্তু অনেক সময় নিজেকে সংশোধন করে শত্রু দমন করা যায়। অন্যের ঘাড়ে দোষ না চাপিয়ে নিজেকে সংশোধন ক’রে শান্তি পাওয়া যায়। অনেক সময় অশান্তির জন্য বন্ধু তার বন্ধুকে দায়ী করে, দাম্পত্যের কলহের জন্য স্ত্রী তার স্বামীকে আসামী বানায়, স্বামী তার স্ত্রীকে দোষ দেয়, অথচ আত্মসমালোচনা করে নিজের ত্রুটি আবিষ্কার ক’রে শান্তি ও সুখ উপভোগ করা যায়। বন্ধু বা স্বামী/স্ত্রী বদল করার জায়গায় নিজেকে বদলে নিয়ে সুখ-শান্তি আনয়ন করা যায়।

অনেক সময় মানুষ আত্মপ্রবঞ্চনার শিকার হয়। মানুষের মাঝে তার সুনাম থাকায় নিজেকে সে ধোঁকা দেয়। খ্যাতির প্রবাহে নিজের ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু জ্ঞানিগণ বলেন, ‘সকল মানুষ যখন তোমার বাহ্যিক গুণগ্রাম দেখে প্রশংসা করবে, তখন তোমার উচিত, তোমার আভ্যন্তরীণ ত্রুটি অন্বেষণ ও বিচার করা। যাতে তুমি তোমার নিজের গোপন ত্রুটি সংশোধন করে নিজের আত্মার কাছে বিশুদ্ধ হতে পার। আর তা লোকের ঐ প্রশংসা থেকে বহুগুণ উত্তম।’

মানুষের উচিত আত্মসমালোচনা করা, তাহলেই সে অপরের সমালোচনা থেকে বিরত থাকতে সক্ষম হবে। যে ব্যক্তি পরের ছিদ্র অন্বেষণ করা থেকে বিরত থাকবে, সে ব্যক্তি নিজের ছিদ্র সংশোধনে প্রয়াসী হবে। আর যে নিজের ছিদ্র অন্বেষণ করবে, সে পরের ছিদ্র অন্বেষণ করতে পারবে না।

তাই পরের আগে ঘরের সংশোধন সাধন করা উচিত এবং পরকে ছেড়ে নিজের দোষ গণনা করায় ব্যাপৃত হওয়া কর্তব্য।

অনেক সময় নিজের প্রতি অন্যকে অন্যায় করতে দেখে শাসানো হয়, ভৎসনা করা হয়, শাস্তিও দেওয়া হয়। কিন্তু সেই সত্যিকারের মানুষ, যে অন্যের দোষ-ত্রুটি নিজেকে দিয়ে বিবেচনা করে। ভেবে দেখে, সে যদি তার জায়গায় হতো, তাহলে কেমন হতো?

কোন যৌথ কাজে বা সামাজিক কাজে দশে মিলে কাজ করতে গিয়ে দোষ হয়ে গেলে অনেকে নিজেকে দোষমুক্ত মনে ক’রে অপরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে ক্ষান্ত হয়। কিন্তু দৃঢ়চিত্ত সাহসী মানুষ হয় চাঁদের মতো।

‘চন্দ্র কহে, বিশ্বে আলো দিয়েছি ছড়িয়ে,  
কলঙ্ক যা আছে তাহা আছে মোর গায়ে।’

## আত্মশুদ্ধি-আত্মশুদ্ধি

মহান আল্লাহর মহান সৃষ্টির মধ্যে মানুষের আত্মা বা মন অন্যতম। তিনি সেই বড় বড় সৃষ্টির কসম খেয়েছেন কুরআন করীমে। তিনি বলেছেন,

{وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (ۧ) وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا (ۨ) وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَاهَا (۩) وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا (۪) وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (۫) وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا (۬) وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (ۭ) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (ۮ) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (ۯ) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (۰)}

(১০) سورة الشمس

“শপথ সূর্যের এবং তার (দিনের প্রথম ভাগের) কিরণের। শপথ চন্দ্রের, যখন তা সূর্যের পর আবির্ভূত হয়। শপথ দিবসের, যখন তা সূর্যকে প্রকাশ করে। শপথ রজনীর, যখন তা সূর্যকে আচ্ছাদিত করে। শপথ আকাশের এবং তার নির্মাণ কৌশলের। শপথ পৃথিবীর এবং তার বিস্তীর্ণতার। শপথ আত্মার এবং তার সুঠাম গঠনের। অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। সে সফলকাম হবে, যে তাকে পরিশুদ্ধ করবে এবং সে ব্যর্থ হবে, যে তাকে কলুষিত করবে।” (শা/মসঃ ১-১০)

এই মহা শপথের পর তিনি জানিয়েছেন যে, মানুষের মনের ভিতরে সৎকর্মের প্রেরণা ও অসৎকর্মের ঘৃণা প্রক্ষিপ্ত করা হয়েছে। মানুষ ইচ্ছা করলে সৃষ্টিকর্তার অনুমতিক্রমে নিজ মনকে পবিত্র করতে পারে। ইচ্ছা করলে নোংরাও করতে পারে। সেই সাথে তিনি উভয় এখতিয়ারের পরিণামও বিবৃত করেছেন।

মানুষের মন দুগ্ধপোষ্য শিশুর মতো। দুধ না ছাড়ালে পান করতেই থাকবে। ছাড়ানোর চেষ্টা করলে ছাড়ানো যাবে। সুতরাং হৃদয়কে পবিত্র ও সংশোধন করার নেক-নিয়ত হতে হবে এবং শুদ্ধ করতে হবে চিত্তশুদ্ধির প্রয়াস। তাহলেই মহান আল্লাহ তওফীক দেবেন এবং নাফসে আশ্মারাহ ও নাফসে লাওয়ামাহ অনায়াসে নাফসে মুতময়িন্নাহতে পরিণত হবে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ} (১১) سورة الرعد

“নিশ্চয় আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না; যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে।” (রা/দঃ ১১)

প্রত্যেকেরই উচিত, প্রথমতঃ নিজ নাফসের পরীক্ষা নেওয়া এবং দেখা যে, তার নাফস কোন্ শ্রেণীর? অতঃপর তার শ্রীবৃদ্ধির প্রচেষ্টায় সক্রিয় হওয়া। মানুষ যেমন দেহ ও স্বাস্থ্যকে ভালো রাখার জন্য সুগার-প্রেসার বারবার চেক ক’রে অনেক কিছু নিয়ন্ত্রণ করে, নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত পানাহার গ্রহণ করে, প্রয়োজনে ওষুধ ব্যবহার করে, তেমনই মনটাকে সুস্থ ও পবিত্র রাখার জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা অবশ্যই উচিত। কারণ সুস্থ দেহ ইহকালের কয়েক দিন সুখ-শান্তি দান করবে এবং সুস্থ মন পরকালে অন্তহীন সুখ-শান্তির সন্ধান দেবে। আজ পরিবার-পরিজন ও অর্থ-সম্পদ মানুষের দেহের সুস্বাস্থ্য ফেরাতে সহযোগিতা করবে। কিন্তু কাল এমন পরিস্থিতি আসবে,

{يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (৮৮) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (৮৯) الشعراء}

“যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না; সেদিন উপকৃত হবে কেবল সেই; যে আল্লাহর নিকট সুস্থ অন্তঃকরণ নিয়ে উপস্থিত হবে।’ (শুআ’রাঃ ৮৮-৮৯)

মানুষ যেমন তার নিজ দেহ পরিষ্কার ও পবিত্র রাখে, নিজ বাসস্থান ও বাথরুম পরিচ্ছন্ন রাখে, নিজ লেবাস-পোশাক ধুয়ে পরিষ্কার করে, আয়নায় ময়লা দেখলে মুছে পরিষ্কার করে, অলংকারে মরিচা লাগলে এ্যাসিড দিয়ে ধুয়ে ঝকঝকে করে, অস্ত্র বা যন্ত্রে জং পড়লে বিশেষ ব্যবস্থায় তা তুলে ফেলে, তেমনই উচিত, নিজ মনকে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন করা।

যাতে লোকে যেন মনে না করে, লোকটার মন বড় হীন।

কেউ যেন বলে না বসে, লোকটার মন বড় নীচ।

কেউ যেন ধারণা না করে, লোকটার মন বড় সংকীর্ণ।

কেউ যেন অনুভব না করে, লোকটার মন বড় ছোট।

কেউ যেন মন্তব্য না করে, লোকটার মন বড় নোংরা।

কেউ যেন না বলে, লোকটার মন বড় খবীস।

কেউ যেন না ভাবে, লোকটার মন বড় গোঁড়া।

কেউ যেন না বলে, লোকটার মন বড় একগুঁয়ে।

কেউ যেন না শোনায়ে, লোকটার মন বড় অবুঝ।

কেউ যেন বলতে না পারে, লোকটার মন বড় পাগল।

মানুষ হল দুনিয়ার বুকে মহান আল্লাহর সাক্ষী।

‘আপনারে ভালো বলে, ভালো সে নয়,

লোকে যারে ভালো বলে, ভালো সেই হয়।’

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলল, ‘আমি ভালো কাজ করেছি, না মন্দ



কাজ করেছে, তা কীভাবে জানতে পারব?’ নবী ﷺ বললেন,  
 ((إِذَا سَمِعْتَ جِيرَانَكَ يَقُولُونَ قَدْ أَحْسَنْتَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ قَدْ  
 أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأْتَ)).

“যখন তুমি তোমার প্রতিবেশীর মুখে বলতে শুনবে যে, তুমি ভাল কাজ  
 করেছে, তাহলে তুমি (সত্যি) ভাল কাজ করেছে। আর যখন তুমি তোমার  
 প্রতিবেশীর মুখে বলতে শুনবে যে, তুমি মন্দ কাজ করেছে, তাহলে তুমি  
 (সত্যি) মন্দ কাজ করেছে।” (আহমাদ ৩৮০৮, ইবনে মাজাহ ৪২২২-৪২২৩,  
 ত্বাবারানী ১০২৮০, সহীহুল জামে ৬১০নং)

তিনি আরো বলেছেন,

((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَشْهَدُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَهْلٍ أَبْيَاتٍ مِنْ جِيرَانِهِ الْأَدْنَى بِخَيْرٍ إِلَّا  
 قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ قَبِلْتُ شَهَادَةَ عِبَادِي عَلَى مَا عَلِمُوا وَغُفِرَتْ لَهُ مَا أَعْلَمُ)).

“যখন কোন মুসলিম বান্দা মারা যায় এবং তার জন্য নিকটবর্তী তিন  
 ঘর প্রতিবেশী ভালো হওয়ার সাক্ষ্য দেয়, তখন মহান আল্লাহ বলেন,  
 ‘আমি আমার বান্দাদের সাক্ষ্য সেই বিষয়ে গ্রহণ করলাম, যে বিষয় তারা  
 জানে এবং যে বিষয় আমি জানি (ওরা জানে না), সে বিষয়ে ওকে ক্ষমা  
 করে দিলাম।’ (আহমাদ ৮৯৮৯, ৯২৯৫, সঃ তারগীব ৩৫১৬নং)

আনাস র.ব. বলেন, কিছু লোক একটা জানাযা নিয়ে পার হয়ে গেল।  
 লোকেরা তার প্রশংসা করতে লাগল। নবী ﷺ বললেন, “অবধারিত হয়ে  
 গেল।” অতঃপর দ্বিতীয় আর একটি জানাযা নিয়ে পার হলে লোকেরা তার  
 দুর্নাম করতে লাগল। নবী ﷺ বললেন, “অবধারিত হয়ে গেল।” উমার বিন  
 খাদ্রাব র.ব. বললেন, ‘কী অবধারিত হয়ে গেল?’ তিনি বললেন,  
 (( هَذَا أُتْنِيَتْ عَلَيْهِ خَيْرًا ، فَوَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ، وَهَذَا أُتْنِيَتْ عَلَيْهِ شَرًّا ،

فَوَجِبَتْ لَهُ النَّارُ ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ )).

“তোমরা যে এর প্রশংসা করলে তার জন্য জান্নাত, আর ওর দুর্নাম  
 করলে তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে গেল। তোমরা হলে পৃথিবীতে  
 আল্লাহর সাক্ষী।” (বুখারী ১৩৬৭, ২৬৪২, মুসলিম ২২৪৩নং)

উদ্দেশ্য এ নয়, মানুষের কাছে ভালো হওয়ার জন্য মানুষকে দেখিয়ে-  
 শুনিয়ে কাজ করতে হবে। তাহলে তো তা মহান আল্লাহর কাছেই  
 গ্রহণযোগ্য হবে না। উদ্দেশ্য এই যে, কাজ হবে মহান আল্লাহর জন্য, মন  
 পবিত্র হবে তাঁরই সন্তুষ্টি বিধানের জন্য। কিন্তু তার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে  
 ব্যবহারে ও আচরণে।

### আত্মশোধনের পদ্ধতি

মন কলুষিত হলে তা শুদ্ধ করার প্রথম ধাপ হল এই অনুভূতি যে, আমার মন কলুষিত হয়েছে, অতঃপর তার ‘তায়কিয়াহ’ (সংশুদ্ধি)র প্রতি পদক্ষেপ করা। নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে সংশুদ্ধির উপায় বিবৃত হল।

#### (১) আকীদা সংশোধন করা

মনের জমিতে প্রচুর আগাছা ও কাঁটাগাছ জন্মেছে, সেগুলিকে তুলে ফেলতে হবে। একেবারে কৃষকের মতো লাঙ্গল-মই চালিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। অথবা কম্পিউটারের মতো ‘ফরম্যাট’ করতে হবে। আকীদার জঞ্জাল মন থেকে তুলে ফেলতে হবে। আর তার জন্য আকীদার দর্শন নিতে হবে, আকীদার বই-পুস্তক পড়তে হবে। মহান আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতা, কিতাবসমূহ, রসূল ও নবীগণ, পরকাল ও তকদীর সম্বন্ধে যত অমূলক বিশ্বাস আছে মন থেকে দূর করতে হবে। ইসলাম ও তার বিধান বিষয়ক নানা কুধারণা মন থেকে মুছে ফেলতে হবে। সকল প্রকার কুফরী, শিকী ও বিদআতী বিশ্বাস থেকে মনের মণিকোঠাকে পবিত্র করতে হবে। মুশরিক অপবিত্র, শির্ক বর্জন না করলে নামে মুসলিম হলেও সে অপবিত্রই থাকে। (তাওবাঃ ২৮)

জেনে রাখা দরকার যে, মন ঠিক না হলে দেহ ঠিক হবে না। মনে সহীহ আকীদা না থাকলে অথবা শিকী বা কুফরী বিশ্বাস থাকলে কোন আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না।

(২) মনোরোগ থেকে সাবধান থাকা, মনোরোগ দূর করার চিকিৎসা করা।

#### (৩) দুআ করা

হৃদয়ের মালিক আল্লাহ, তাই তাঁর নিকট তার পবিত্রতা চেয়ে দুআ করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দুআ পাঠ করতেন,

(( اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، اَللّٰهُمَّ اَتِ نَفْسِیْ تَقْوَاهَا ، وَزَكِّهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا ، اَنْتَ وَلِیُّهَا وَمَوْلَاهَا ، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا یَنْفَعُ ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا یَخْشَعُ ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا یُسْتَجَابُ لَهَا )) . رواه مسلم

“আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল আজযি অলকাসালি অলবুখলি

অলহরামি অ আযা-বিল ক্বাবর। আল্লা-হুস্মা আ-তি নাফসী তাক্বওয়া-হা অযাক্কিহা আন্তা খাইরু মান যাক্ক-হা, আন্তা অলিয়ুহা অমাউলা-হা। আল্লা-হুস্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন ইলমিল লা য়ানফা’, অমিন ক্বালবিল লা য়াখশা’, অমিন নাফসিল লা তাশবা’, অমিন দা’ওয়াতিল লা য়ুস্তাজা-বু লাহা।”

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে অক্ষমতা, অলসতা, কৃপণতা, স্থবিরতা এবং কবরের আযাব থেকে পানাহ চাচ্ছি। হে আল্লাহ আমার আত্মায় তোমার ভীতি প্রদান কর এবং তাকে পবিত্র কর, তুমিই শ্রেষ্ঠ পবিত্রকারী। তুমিই তার অভিভাবক ও প্রভু। হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট সেই ইলম থেকে পানাহ চাচ্ছি, যা কোন উপকারে আসে না। সেই হৃদয় থেকে পানাহ চাচ্ছি, যা বিনয়ী হয় না। সেই আত্মা থেকে পানাহ চাচ্ছি, যা তৃপ্ত হয় না এবং সেই দুআ থেকে পানাহ চাচ্ছি, যা কবুল হয় না। (মুসলিম ৭০৮১নং)

(৪) তাওবা ও ইস্তিগফার করা  
এর ফলে মনের কালি মোছা যায়।

(৫) যিক্র করা  
মনে-মুখে আল্লাহর যিক্র থাকলে হৃদয়ে জেল্লা আসে।

(৬) পাপ থেকে দূরে থাকা, কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা  
পাপ থেকে দূরে না থাকলে হৃদয় পবিত্র হবে কীভাবে? পাপই তো মনের ময়লা। কাদায় দাঁড়িয়ে থেকে পা ধোয়া সম্ভব নয়। কুয়া থেকে মরা বিড়াল তুলে না ফেলে তার পানি তুলে ফেললে কী কুয়া পবিত্র হয়?  
পাপপ্রবণ মনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। আর সে লড়াই সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ। এ জিহাদের মাঝেই আছে হৃদয়ের পবিত্রতা। অবশ্য তার জন্য প্রয়োজন ইলমের অস্ত্র। অস্ত্র ব্যতিরেকে যেমন জিহাদ হয় না, তেমনি ইলম ব্যতিরেকে মনের বিরুদ্ধে জিহাদ তথা মন পরিশুদ্ধ হয় না।

আলী রা বলেছেন, ‘জ্ঞান হল আবরক পর্দা, সেই পর্দা দিয়ে তোমার দৈহিক ক্রটি গোপন কর। আর ইলম হল ক্ষুরধার তরবারি, তা দিয়ে তুমি তোমার প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই কর।’

তিনটি জিনিসকে হিফাযত করা জরুরী; দীন, দেশ ও ভ্রাতৃত্ব। আর ৩টি জিনিসকে নিয়ন্ত্রণ করা জরুরী; জিভ, রাগ ও প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তির নাকে লাগাম না দিলে মনোভূমিকে তা অপবিত্র ক’রে ফেলে।

(৭) বিলাসিতা কম করা

স্বপ্নাহারী ও স্বপ্নভাষীর মন পবিত্র থাকে। বিষয়াসক্তি বর্জন করলে হৃদয় পরিচ্ছন্ন থাকে। অতিরিক্ত বিলাসিতা মনের পবিত্রতা নষ্ট ক’রে ফেলে। ভোজন-বিলাসী, সজ্জা-বিলাসী, শয্যা-বিলাসী, যৌন-বিলাসী ও অর্থলোভীর মন কর্দমাক্ত হয়ে যায়।

(৮) আল্লাহর আনুগত্য করা

আল্লাহ ও তদীয় রসূলের আনুগত্যে আছে হৃদয়ের পবিত্রতা। শরীয়তের আদেশ-নিষেধ মেনে চলায় আছে মনের পরিচ্ছন্নতা ও শান্তি।

ইবনে আব্বাস রা বলেছেন, ‘নেক আমলের জ্যোতি আছে, যা হৃদয়ে প্রকাশ পায়। তার ঔজ্জ্বল্য আছে, যা চেহারায়ে প্রকাশ পায়। তার শক্তি আছে, যা দেহে প্রকাশ পায়। তার প্রাচুর্য আছে, যা রুখীতে প্রকাশ পায়। তার ভালোবাসা আছে, যা সৃষ্টির হৃদয়ে প্রকাশ পায়।

অনুরূপ বদ আমলের অন্ধকার আছে, যা হৃদয়ে প্রকাশ পায়। তার কালিমা আছে, যা চেহারায়ে প্রকাশ পায়। তার দুর্বলতা আছে, যা দেহে প্রকাশ পায়। তার হ্রাস আছে, যা রুখীতে প্রকাশ পায়। তার ঘৃণা আছে, যা সৃষ্টির হৃদয়ে প্রকাশ পায়।’

(৯) সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজে বাধাদান করা

নোংরাকে প্রশ্রয় না দেওয়া, অন্যায়কে মেনে না নেওয়া পবিত্র হৃদয়ের পরিচয়। ইষ্টের লালন ও দুষ্টের দলন ঈমানী মনের নিদর্শন। আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু পছন্দ করা, আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু ঘৃণা করা, আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু দেওয়া ও আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু না দেওয়া ঈমানের মিষ্টতা-প্রাপ্ত হৃদয়-ওয়ালার পরিচয়। আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসা ও আল্লাহর জন্য কাউকে ঘৃণা করা ঈমানের মজবুত বন্ধন।

সে মন পরিক্ষার ও পবিত্র কীভাবে হয়, যে মন নোংরাকে নোংরা জানে না?

সে মন পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র কীভাবে হয়, যে মন ঘৃণ্যকে ঘৃণা করে না?

সে মন পবিত্র কীভাবে হয়, যে মন সৎকাজের আদেশ দেয় না এবং অসৎ কাজে বাধাদান করে না?

সে মন ঈমানদার কীভাবে হয়, যে মন অন্যায়ের প্রতিবাদ না করতে পারলেও মনে তার প্রতি ঘৃণা বোধও করে না?

সে মন নির্মল কীভাবে হতে পারে, যে মন কাজের অথবা কাছের বলে নোংরা লোককে দূর ভাবতে পারে না?

সে মন অনাবিল কীভাবে হতে পারে, যে মন অন্যায়ের সাথে আপোস ক’রে চলে?

সে মন পবিত্র কীভাবে থাকতে পারে, যে মন নোংরার সাথে সহাবস্থান করে?

সে মন কি ভালো মন, যে মন নোংরামিকে প্রশ্রয় দেয়?

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(( مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ )) . رواه مسلم

“তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন গর্হিত কাজ দেখবে, সে যেন তা নিজ হাত দ্বারা পরিবর্তন ক’রে দেয়। যদি (তাতে) ক্ষমতা না রাখে, তাহলে নিজ জিভ দ্বারা ( উপদেশ দিয়ে পরিবর্তন করে)। যদি (তাতেও) সামর্থ্য না রাখে, তাহলে অন্তর দ্বারা (ঘৃণা করে)। আর এ হল সবচেয়ে দুর্বল ঈমান।” (আহমাদ ১১০৭৪, মুসলিম ১৮৬নং, আসহাবে সুনান)

(( مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةٌ خَرْدَلٍ )) . رواه مسلم

“আমার পূর্বে আল্লাহ যে কোন নবীকে যে কোন উম্মতের মাঝে পাঠিয়েছেন তাদের মধ্যে তাঁর (কিছু) সহযোগী ও সঙ্গী হত। তারা তাঁর সুন্নতের উপর আমল করত এবং তাঁর আদেশের অনুসরণ করত। অতঃপর তাদের পরে এমন অপদার্থ লোক সৃষ্টি হয় যে, তারা যা বলে, তা করে না এবং তারা তা করে, যার আদেশ তাদেরকে দেওয়া হয় না। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ হাত দ্বারা সংগ্রাম করবে সে মু’মিন, যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ জিভ দ্বারা সংগ্রাম করবে সে মু’মিন এবং যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ অন্তর দ্বারা জিহাদ করবে সে মু’মিন। আর এর পর সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান নেই।” (মুসলিম ১৮৮নং)

সে মনকে কি পবিত্র বলবেন, যে মনের শ্লোগান হল,

‘এক হাতে মোর কোরান শরীফ মদের গ্লাস অন্য হাতে,  
পুণ্য-পাপের সৎ-অসতের দোস্তি সমান আমার সাথে।’

(১০) কুরআন তেলাঅত করা

অর্থ বুঝে কুরআন তেলাঅত মন পবিত্র করার অন্যতম মাধ্যম।

কুরআন হল হার্দিক ব্যাধির সেরা ঔষধ। মানসিক রোগের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা। যে কুরআন পড়ে ও মানে, তার হৃদয় অপবিত্র ও অসুখী থাকতে পারে না, তার মনে কোন আশঙ্কা, আতঙ্ক ও উদ্বেগ থাকতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هَٰذَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ}

“যখন আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সৎপথের কোন নির্দেশ আসবে, তখন যারা আমার সৎপথের নির্দেশ অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।” (বাক্বারাহঃ ৩৮)

{فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَنْ اتَّبَعَ هَٰذَا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ} (১২৩) طه

“আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সৎপথের নির্দেশ এলে, যে আমার পথনির্দেশ অনুসরণ করবে, সে বিপথগামী হবে না এবং দুঃখ-কষ্টও পাবে না।” (ত্বা-হাঃ ১২৩)

কুরআনের সেই নির্দেশনা পেয়েই তো বহু অপবিত্র মনের মানুষ নিজেদের মনকে পবিত্র ক’রে ধন্য হয়েছেন।

### (১১) নফল ইবাদত করা

নফল নামাযের মধ্যে তাহাজ্জুদ হল মন পবিত্র করার বড় অসীল। নফল সাদকা, রোযা, হজ্জ-উমরা ইত্যাদি দ্বারা মানুষের কেবল মনই পবিত্র হয় না, বরং মহান আল্লাহর ভালোবাসা, নৈকট্য ও বিলায়াত (অলী হওয়ার যোগ্যতা) লাভ হয়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(( إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا ، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا ، وَإِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ )) . رواه البخاري

‘নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বলেন, “যে ব্যক্তি আমার কোন বন্ধুর সাথে শত্রুতা করবে, তার বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধের ঘোষণা রইল। আমার বান্দা যে সমস্ত জিনিস দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করে, তার মধ্যে আমার নিকট প্রিয়তম জিনিস হল তা---যা আমি তার উপর ফরয করেছি। (অর্থাৎ ফরয ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করা আমার নিকটে বেশী পছন্দনীয়।) আর আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে

থাকে, পরিশেষে আমি তাকে ভালবাসতে লাগি। অতঃপর যখন আমি তাকে ভালবাসি, তখন আমি তার ঐ কান হয়ে যাই, যার দ্বারা সে শোনে, তার ঐ চোখ হয়ে যাই, যার দ্বারা সে দেখে, তার ঐ হাত হয়ে যাই, যার দ্বারা সে ধরে এবং তার ঐ পা হয়ে যাই, যার দ্বারা সে চলে! আর সে যদি আমার কাছে কিছু চায়, তাহলে আমি তাকে দিই এবং সে যদি আমার আশ্রয় চায়, তাহলে আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় দিই।” (বুখারী ৬৫০২নং)

এমন মানুষের মন তাই চায়, যা আল্লাহ চান। আর সে তাঁর কাছে যা চায়, তিনি তাকে তাই দান করেন।

(১২) নেক লোকদের সাহচর্য গ্রহণ করা

‘সঙ্গদোষে লোহা ভাসে’ কথাটি যেমন ঠিক, তেমনি ‘সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস’ কথাটিও বেঠিক নয়। যার মন পবিত্র, তার সাথের সাথী হতে পারলে তার পবিত্রতার পরশ এ মনে লাগতেই পারে। পরশমণির মতো কাজ করে পবিত্র মানুষের মন। তাই তার ইল্ম, চরিত্র ও ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে নিজের মনকে পবিত্র করতে উদ্বুদ্ধ হয় আগ্রহী মানুষ।

আর যে মহান প্রতিপালককে নিজের সাথী বানাতে পেরেছে, তার চিন্তা কী? ইবনুল কাইয়েম লিখেছেন,

“হৃদয়ের আছে এলোমেলো অবস্থা ও আলুখালু অবস্থা। আল্লাহর প্রতি আগ্রহ ছাড়া তা অন্য কিছু সুসজ্জিত ও সুবিন্যস্ত করতে পারে না।

হৃদয়ের মধ্যে আছে একাকিত্বের আতঙ্ক, নির্জনে তাঁর স্মরণ-সঙ্গ ব্যতীত অন্য কিছু তা দূর করতে পারে না।

হৃদয়ে আছে দুশ্চিন্তা, তাঁকে চেনার আনন্দ ও তাঁর জন্য আমলে সততা ছাড়া অন্য কিছু তা দূর করতে পারে না।

হৃদয়ে আছে উদ্বেগ ও উৎকর্ষা, তাঁর জন্য জমায়েত ও তাঁর ভয়ে তাঁরই দিকে পলায়ন ছাড়া অন্য কিছু তা সান্ত্বনিত করতে পারে না।

হৃদয়ে আছে নানা আফসোসের আগুন ও অনুতাপের উত্তাপ, তাঁর আদেশ-নিষেধ ও তকদীরে সন্তুষ্ট হওয়া এবং তাঁর সাক্ষাৎ-কাল অবধি ধৈর্যের সাথে মুআনাকা করা ছাড়া অন্য কিছু তা নিভাতে পারে না।

হৃদয়ে আছে তীব্র আকাঙ্ক্ষা, একমাত্র তিনিই আকাঙ্ক্ষিত না হলে সে আকাঙ্ক্ষা পূরণ হতে পারে না।

হৃদয়ে আছে অভাব-অনটন, তাঁর মহক্বত, তাঁর প্রতি অভিমুখ, সার্বক্ষণিক তাঁর যিকর, এবং সর্বকাজে তাঁর নির্ভেজাল ইখলাস ছাড়া অন্য কিছু সে অভাব দূর করতে পারে না। দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে, সব কিছু দিলেও কস্মিন্‌কালেও সে অভাব মোচন হতে পারে না।”

(মাদারিজুস সালেকীন ৩/ ১৬৪)

ইবনুল কাইয়েম আরো লিখেছেন,

“হৃদয়ের ৬টি স্থান আছে, যার কোন সপ্তম নেই। যে সকল স্থানে হৃদয় বিচরণ করে। তার মধ্যে ৩টি হীন পর্যায়ে এবং ৩টি উচ্চ পর্যায়ে।

নীচ পর্যায়ে ৩টি স্থান হল :-

(১) দুনিয়া, যে তার জন্য সুশোভিত হয়।

(২) কুপ্রবৃত্তি, যে তাকে প্রলোভন দিতে থাকে।

(৩) দুশমন, যে তাকে কুমন্ত্রণা দিতে থাকে।

এ হল নীচ আত্মার স্থানসমূহ, যাতে সে বিচরণ করে বেড়ায়।

আর উচ্চ পর্যায়ে ৩টি স্থান হল :-

(১) ইলম, যা তার জন্য স্পষ্ট হয়।

(২) বুদ্ধিমত্তা, যে তাকে পথ দেখায়।

(৩) উপাস্য, যার সে ইবাদত করে।

হৃদয়সমূহ এই স্থানগুলিতে পরিভ্রমণ করে। (আল-ফাওয়াইদ ৯৯পৃঃ)

হৃদয়ের জমি পরিচ্ছন্ন হলে তাতে সুখ ও স্বাস্থ্যের বৃক্ষ উদগত হয়। সে বৃক্ষের প্রয়োজনীয় পানি, খাদ্য, আলো ও বাতাস হয় আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান।

মন পরিস্কার করা জরুরী। তবে তা পরিস্কার কি না, তা নিজে বলা যায় না। নিজে নিজের প্রশংসা করা যায় না। আত্মপ্রশংসা বাঞ্ছনীয় নয়। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

{هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا

أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى} (سورة النجم ৩২)

“তিনি তোমাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত, যখন তিনি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছিলেন এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে অবস্থান কর। অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। তিনিই সম্যক জানেন আল্লাহভীরু কে।” (নাজ্‌মঃ ৩২)

যারা আত্মফালন ক’রে বলে, ‘আমাদের মন পরিস্কার’, পরীক্ষা ক’রে দেখা যায়, তাদেরই মন বেশি অপরিষ্কার। আপন নিজিতে ওজন করলে ওজনটা নিজের স্বার্থেই হয়। সে গর্বই প্রমাণ করে, তাদের মন আসলে অপরিষ্কার।

‘কত বড় আমি’ কহে নকল হীরাটি,

তাই তো সন্দেহ করি নহ ঠিক খাঁটি।

সমাপ্ত